মেঘ-মল্লার

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্র ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

তৃতীয় মুদ্রণ—বৈশাখ ১৩৬৩

—তিন টাকা—

মিত্র ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে ভানু রায় কর্তৃক প্রকাশি

মানসী প্রেস, ৭৩ মাণিকতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মু

শ পারমিতার মন্দিরে সেদিন যখন সাপুড়ের খেলা দেখবার জন্য অনেক ময়েপুরুষ মন্দির-প্রাঙ্গণে একত্র হয়েছিল, তারই মধ্যে প্রদ্যুম্ন প্রথমে লাকটিকে দেখে।

সেদিন ছিল জ্যৈষ্ঠ মাসের-সংক্রান্তি। চারি পাশের গ্রাম থেকে মেয়েরা এসেছিল দশ পারমিতার পূজা দিতে। সেই উপলক্ষে অনেক সাপুড়ে গায়ক বাজিকর মন্দিরে একত্র হয়েছিল; অনেক মালাকর নানা রকমের সুন্দর ফুলের ফুলের গহনা গ'ড়ে মেয়েদের কাছে বেচবার জন্য এনেছিল। একজন শ্রেষ্ঠী মগধ থেকে দামী রেশমী শাড়ি এনেছিল বেচবার জন্য। তারই দোকানে ছিল সেদিন মেয়েদের খুব ভিড়। প্রদ্যুম্ন শুনেছিল, জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তির উৎসব উপলক্ষে পারমিতার মন্দিরে একজন বিখ্যাত গায়ক ও বীণ-বাজিয়ে আসবেন। সে মন্দিরে গিয়েছিল তাঁরই সন্ধানে। সমস্ত দিন 'রে খুঁজেও কিন্তু প্রদ্যুম্ন তাঁকে ভিড়ের মধ্যে থেকে বার করতে পারেনি।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে মন্দিরের উঠোনে একজন সাপুড়ে অদ্ভুত-অদ্ভুত সাপের খেলা দেখাতে আরম্ভ করলে, আর তারই চারিধারে অনেকগুলি কৌতুক-প্রিয়া মেয়ে জমে গেল। ক্রমে সেখানে খুবই ভিড় হয়ে উঠল। প্রদ্যুম্নও সেখানে দাঁড়িয়ে গেল বটে, কিন্তু তার মন সাপখেলার দিকে আদৌ ছিল না। সে ভিড়ের মধ্যের প্রত্যেক পুরুষমানুষকে মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করছিল যদি চেহারায় ও হাবভাবে বীণ্-বাজিয়ে ধরা পড়েন। অনেকক্ষণ ধরে দেখবার পর তার চোখে পড়ল একজন প্রৌঢ় ভিড়ের মধ্যে তার দিকেই চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর পরনে অতি মলিন ও জীর্ণ পরিচ্ছদ। জানি কেন প্রদ্যুম্নের মনে হ'ল, এই সেই গায়ক। প্রদ্যুম্ন লোক ঠেলে র কাছে যাবার উদ্যোগ করতে তিনি হাত উঁচু ক'রে প্রদ্যুম্নকে ভিড়ের ইরে যেতে ইঙ্গিত করলেন।

বাইরে আসতে প্রৌঢ় তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আমি অবন্তীর গাইয়ে দাস, তুমি আমাকে খুঁজছিলে না?

জ্যোৎস্না পথ-ঘাট ধুইয়ে দিচ্ছিল। দূর মাঠের গাছপালা জ্যোৎস্নায় ঝাপ্‌সা দেখাচ্ছিল। পড়াশুনা তার হয় কি ক'রে? আচার্য্য পূর্ণবর্দ্ধন ত্রিপিটকের পাঠ অনায়ত্ত দেখে তাকে ভৎ́সনা করলেই বা কি করা যাবে? এ রকম রাত্রে যে যুগেযুগের বিরহীদের মনোবেদনা তার প্রাণের মধ্যে জমে ওঠে, তার অবাধ্য মন যে এই সব পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নারাত্রে মহাকোট্‌ঠি বিহারের পাষাণ অলিন্দে মানসসুন্দরীদের পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়ায়, এর জন্য সে-ই কি দায়ী!

দশ পারমিতার মন্দিরে সন্ধ্যারতির ঘণ্টার ধ্বনি তখনও মিলিয়ে যায়নি, দূরে নদীর বাঁকের ভাঙা মন্দিরে ক্ষীণ আলো জ্বলে উঠল, উৎসব-প্রত্যাগত নর-নারীর দল জ্যোৎস্না-ভরা মাঠের মধ্যে ক্রমে বহুদূরে অদৃশ্য হয়ে গেল! প্রদ্যুম্নের গতি আরো দ্রুত হ'ল।

পথের পাশে একটা গাছ। গাছের নিকট যেতে প্রদ্যুম্নের মনে হ'ল গাছের আড়ালে কেউ যেন দাঁড়িয়ে আছে—আর একটু এগিয়ে গাছের পাশে যেতেই তার অত্যন্ত পরিচিত কণ্ঠের হাল্কা মিষ্টি হাসির ঢেউয়ে সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল,—দেখলে গাছতলায় সুনন্দা দাঁড়িয়ে আছে, গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে চিকচিকে জ্যোৎস্নার আলো প'ড়ে তার সর্ব্বাঙ্গে আলো আঁধারের জাল বুনেছে। প্রদ্যুম্ন চাইতেই সুনন্দা ঘাড় দুলিয়ে ব'লে উঠল—আর একটু হলেই বেশ হ'ত! গাছের তলা দিয়ে চ'লে যেতে অথচ আমায় দেখতে পেতে না!

সুনন্দাকে দেখে প্রদ্যুম্ন মনে মনে ভারি খুশী হ'ল, মুখে বললে—নাঃ তা আর দেখব কেন? ভারি ব্যাপারটা হয়েছে গাছতলায় লুকিয়ে! আর না দেখতে পেলেই বা কি? আমি তোমার ওপর ভারি রাগ করেছি, সুনন্দা, সত্যি বলছি।

সুনন্দা বললে—দোষ করলেন নিজে আবার রাগও করলেন নিজে! সেদিন কি কথা বলেছিলে মনে আছে? তা না, যত রাজ্যের সাপুড়ে আর বাজিকর—মাগো! ওদের কাছে যাও কি ক'রে? এমন ময়লা কাপড় পরে! আমি ওদের ত্রিসীমানায় যাইনে।

প্রদ্যুম্ন বললে—তুমি বড়মানুষের মেয়ে—তোমার কথাই আলাদা—কিন্তু কথাটা কি ছিল বলছিলে?

সুনন্দা বললে—যাও! আর মিথ্যে ভানে দরকার নেই। কি কথা মনে ক'রে দেখ। সেই সেদিন বললে না?

প্রদ্যুম্ন একটুখানি ভেবে ব'লে উঠল—বুঝতে পেরেছি—সেই বাঁশী?

সুনন্দা অভিমানের সুরে বললে—ভেবে দেখ বলেছিলে কি না। আমি দুপুর বেলা থেকে মন্দিরে এসে ব'সে আছি! একে ত এলেন বেলা ক'রে, তার ওপর—যাও!

প্রদ্যুম্ন এবার হেসে উঠল। বললে—আচ্ছা সুনন্দা যদি তুমি আমায় দেখতেই পেয়েছিলে তো আমায় ডাকলে না কেন?

সুনন্দা বললে—আমি কি একা ছিলাম? দুপুর বেলায় আমি একা এসেছিলাম বটে, কিন্তু তখন ত আর তুমি আসনি? তার পর আমাদের গাঁয়ের মেয়েরা সব যে এল। কি ক'রে ডাকব?

প্রদ্যুম্ন বললে—আচ্ছা ধ'রে নিলাম আমার দোষ হয়েছে, তবে তুমি যে বার বার সাপুড়ে আর বাজিকরদের কথা বলচ সুনন্দা,—সাপুড়ে আর বাজিকরদের আমি খুঁজিনি। শুনেছিলাম অবন্তী থেকে একজন বড় বীণ-বাজিয়ে আসবেন; তুমি তো জানো, আমার অনেক দিন থেকে বীণ শেখবার বড় ইচ্ছা। তাই তাঁর সন্ধানে ঘুরছিলাম, তাঁর দেখাও পেয়েছি। তিনি এখানকার নদীর ধারের দেউলে থাকেন। ভালো কথা—তোমার বাবা কোথায়?

সুনন্দা বললে—বাবা তিন চার দিন হল কৌশাম্বী গিয়েছেন মহারাজের ডাকে।

প্রদ্যুম্ন হঠাৎ খুব উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল, বললে—ওহো তাই! নইলে আমি ভাবচি এত রাত পর্য্যন্ত সুনন্দা কি—

সুনন্দা তাড়াতাড়ি প্রদ্যুম্নের মুখে নিজের হাতদুটি চাপা দিয়ে লজ্জিত মুখে বললে—চুপ চুপ, তোমার কি এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান নেই। এখুনি যে সব আরতি দেখে লোক ফিরবে!

প্রদ্যুম্ন হাসি থামিয়ে বললে—এবার কিন্তু তোমার বাবা এলে ব'লে দেব নিশ্চয়—

সুনন্দা রাগের সুরে বললে—দিও ব'লে। এমনি আমি মন্দিরে আরতি পর্য্যন্ত থাকি, তিনি জানেন।

প্রদ্যুম্ন সুনন্দার সুগঠিত পুষ্পপেলব দক্ষিণ বাহুটি নিজের হাতের মধ্যে বেষ্টন করে নিলে, তারপর বললে—আচ্ছা থাক্, ব'লে দেব না। চল সুনন্দা, তোমায় বাঁশী শোনাই, আমার সঙ্গেই আছে—সত্যি বলচি, তোমায় শোনাবার জন্যেই এনেছিলাম। তবে ওঁকে খুঁজছিলাম, বীণটা ভালো ক'রে শিখব ব'লে।

নদীর ধারে এসে কিন্তু প্রদ্যুম্ন বড় নিরুৎসাহ হয়ে পড়ল। সে বাঁশী বাজালে বটে কিন্তু সে যেন ভাসা ভাসা। সুরের সঙ্গে তাতে তার প্রাণের কোন যোগ রইল না। তারা দুজনে নির্জ্জনে আরও কতবার বসেছে, প্রদ্যুম্নের বাঁশী শুনতে সুনন্দা ভালোবাসত ব'লে প্রদ্যুম্ন যখনই বিহার থেকে বাইরে আসত, বাঁশীটি সঙ্গে আনত। প্রদ্যুম্নের বাঁশীর অলস স্বপ্নময় সুরের মধ্য দিয়ে কতদিন উভয়ের অজ্ঞাতে রোদভরা মধ্যাহ্ন গিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে, কিন্তু দুজনে এক হ'লে প্রদ্যুম্নের এ রকম নিরুৎসাহ ভাব তো সুনন্দা আর কখনো লক্ষ্য করেনি!

কি জানি কেন প্রদ্যুম্নের বার বার মনে আসছিল সেই জীর্ণ পরিচ্ছদপরা অদ্ভুতদর্শন গায়ক সুরদাসের কথা! তাদের বিহারের কলাবিৎ ভিক্ষু বসুব্রতের আঁকা জরার চিত্রের মতই লোকটা কেমন কুশ্রী লোলচর্ম্ম শীর্ণ-দর্শন! পুরাতন পুঁথির ভূর্জ্জপত্রের মত ওর পরিচ্ছদের কেমন একটা অপ্রীতিকর মেটে লাল রং!

তার পরদিন সকালে প্রদ্যুম্ন নদীর ধারের ভাঙা মন্দিরে গেল। সেটার দেব-মূর্ত্তি বহুদিন অন্তর্হিত। সমস্ত গায়ে বড় বড় ফাটল, সাপখোপের বাস। নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসীরা সেদিকে বড় একটা কেউ আস্‌ত না। একজন আজীবক সন্ন্যাসী আজ প্রায় সাত আট মাস হ'ল সেখানে বাস করছেন।

তারই দু'চার জন অনুগত ভক্ত মাঝে মাঝে আসত যেত ব'লে মন্দিরের পথ আজকাল অপেক্ষাকৃত ভালো আছে।

অর্দ্ধ-অন্ধকার মন্দিরের মধ্যে প্রদ্যুম্নের সঙ্গে সুরদাসের সাক্ষাৎ হ'ল। সুরদাস প্রদ্যুম্নকে দেখে খুব আনন্দ প্রকাশ করলেন, তারপর বললেন—চল, বাইরে গিয়ে বসি, এখানে বড় অন্ধকার।

বাইরে গিয়ে সুরদাস আলোতে প্রদ্যুম্নের মুখ ভালো ক'রে দেখলেন, তার পর যেন আপন মনে বলতে লাগলেন—হবে, তোমার দ্বারাই হবে! আমি তা জান্‌তাম।

প্রদ্যুম্ন সুরদাসের মূর্ত্তি দূর থেকে দেখে যে অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেছিল, তাঁর নিকটে এসে কিন্তু প্রদ্যুম্নের সে ভাব কেটে গেল। সে লক্ষ্য করলে সুরদাসের মুখশ্রী একটু কুদর্শন হলেও প্রতিভাব্যঞ্জক।

সুরদাস বললে—আমি ভাবছিলাম তুমি আজ আসবে। হাঁ তোমার পিতা তো একজন প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন, তুমি নিজে কিছু শিখেছ?

প্রদ্যুম্ন লজ্জিত-মুখে উত্তর দিলে—একটু-আধটু বাঁশী বাজাতে পারি।

সুরদাস উৎসাহের সুরে বললেন—পারা তো উচিত। তোমার বাবাকে জান্‌ত না এমন লোক এদেশে খুব কম আছে। প্রতি উৎসবেই কৌশাম্বী থেকে তোমার বাবার নিমন্ত্রণপত্র আস্‌ত। হাঁ, আমি শুনেছি তুমি নাকি, বাঁশীতে বেশ মেঘ-মল্লার আলাপ করতে পার?

প্রদ্যুম্ন বিনীতভাবে উত্তর দিলে—বিশেষ যে কিছু জানি তা নয়, যা মনে আসে তাই বাজাই, তবে মেঘ-মল্লার মাঝে মাঝে বাজিয়েছি।

সুরদাস বললেন—কই দেখি তুমি কেমন শিখেছ?

বাঁশী সব সময়েই প্রদ্যুম্নের কাছে থাকত। কখন কোন্‌ সময় সুনন্দার সঙ্গে দেখা হয়ে পড়ে বলা যায় না।

প্রদ্যুম্ন বাঁশী বাজাতে লাগল। তার পিতা তাকে বাল্যকালে যত্ন ক'রে রাগ-রাগিণী শেখাতেন, তা ছাড়া সঙ্গীতে প্রদ্যুম্নের একটা স্বাভাবিক ক্ষমতাও ছিল। তার আলাপ অতি মধুর হ'ল। লতাপাতা ফুলফলের মাঝখান বেয়ে উদার নীল আকাশ আর জ্যোৎস্নারাতের মর্ম্ম কেটে যে

রসধারা বিশ্বে সব সময় ঝরে পড়ছে, তার বাঁশীর গানে সে রস যেন মূর্ত্ত হয়ে উঠল ; সুরদাস বোধ হয় এতটা আশা করেন নি, তিনি প্রদ্যুম্নকে আলিঙ্গন ক'রে বললেন—ইন্দ্রদ্যুম্নের ছেলে যে এমন হবে, সেটা বেশি কথা নয়। বুঝতে পেরেছি, তুমিই পারবে, এ আমি আগেও জানতাম ।

নিজের প্রশংসাবাদে প্রদ্যুম্নের তরুণ সুন্দর মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল।

অন্যান্য দু'এক কথার পর, প্রদ্যুম্ন বিদায় নিতে উদ্যত হ'লে, সুরদাস তাকে বললেন—শোন প্রদ্যুম্ন, একটা গোপনীয় কথা তোমার সঙ্গে আছে। তোমাকে একথা বলব ব'লে পূর্ব্বেও আমি তোমাকে খোঁজ করেছিলাম ; তোমাকে পেয়ে খুব ভালোই হয়েছে। কথাটা তোমাকে বলি, কিন্তু তার আগে তোমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে, একথা তুমি কারুর কাছে প্রকাশ করবে না।

প্রদ্যুম্ন অত্যন্ত বিস্মিত হ'ল। এই প্রৌঢ়ের সঙ্গে তার মোটে এক দিনের আলাপ, এমন কি গোপনীয় কথা ইনি তাকে বলবেন ?

সে বললে—কি কথা না শুনে কি ক'রে—

সুরদাস বললে—তুমি ভেবো না, কোনো অনিষ্টজনক ব্যাপার হ'লে আমি তোমাকে বলতাম না।

কি কথা জানবার জন্যে প্রদ্যুম্নের অত্যন্ত কৌতূহলও হ'ল, সে প্রতিজ্ঞা করলে সুরদাসের কথা কারো কাছে প্রকাশ করবে না।

সুরদাস গলার স্বর নামিয়ে বলতে লাগলেন—নদীর ঐ বড় বাঁকে যে ঢিবিটা আছে জানো ? তার সামনেই বড় মাঠ ? ওই ঢিবিটায় বহু প্রাচীন কালে সরস্বতী দেবীর মন্দির ছিল ; শুনেছি এদেশের যত বড় বড় গায়ক ছিলেন, শিক্ষা শেষ ক'রে সকলেই আগে ওই মন্দিরে এসে দেবীর পূজা দিয়ে তুষ্ট না ক'রে ব্যবসা আরম্ভ করতেন না। সে অনেক দিনের কথা ; তার পর মন্দির ভেঙে-চুরে ওই দাঁড়িয়েছে। ঐ ঢিবিতে ব'সে আষাঢ়ী পূর্ণিমার রাতে মেঘ-মল্লার নিখুঁতভাবে আলাপ করলে সরস্বতী দেবী স্বয়ং গায়কের কাছে আবির্ভূতা হন। এ সংবাদ এদেশে কেউ জানে না। আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র এই তিন মাসের তিন পূর্ণিমায় প্রতিবার যদি

তাঁকে আনতে পারা যায়, তবে তাঁর বরে গায়ক সঙ্গীতে সিদ্ধ হয়। তাঁর বরে সঙ্গীত সংক্রান্ত কোনো বিষয় তখন গায়কের কাছে অজ্ঞাত থাকে না। তবে একটা কথা আছে, যে গায়ক বর প্রার্থনা করবে সে অবিবাহিত হওয়া চাই। তা আমি বলছিলাম, সামনের পূর্ণিমায় তুমি আর আমি এই বিষয়টা চেষ্টা ক'রে দেখব, তুমি কি বল?

সুরদাসের কথা শুনে প্রদ্যুম্ন অবাক হয়ে গেল। তা কি ক'রে হয়? আচার্য্য বসুব্রত কলাবিদ্যা সম্বন্ধে উপদেশ দিতে দিতে অনেক বার যে বলেছেন কলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর যে মূর্ত্তি হিন্দুরা কল্পনা করেন, সেটা নিছক কল্পনাই, তার সঙ্গে বাস্তবের কোনো সম্পর্ক নেই। সত্য সত্য তাঁকে দেখতে পাওয়া—একি সম্ভব?

প্রদ্যুম্ন চুপ ক'রে রইল।

সুরদাস একটু ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—এতে কি তোমার অমত আছে?

প্রদ্যুম্ন বললে—সে জন্যে না। কিন্তু আমি ভাবছিলাম এটা কি ক'রে সম্ভব যে—

সুরদাস বললেন—সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। এর সত্যতা তুমি নিজের চোখে দেখো। তোমার অমত না থাকলে আমি সাম্নের পূর্ণিমায় সব ব্যবস্থা ক'রে রাখি।

সুরদাসের কথার পর থেকেই প্রদ্যুম্ন অত্যন্ত বিস্ময়ে ও কৌতূহলে কেমন এক রকম হয়ে গিয়েছিল। সে ঘাড় নেড়ে বললে—আচ্ছা রাখবেন, আমি আসব।

সুরদাস বললেন—বেশ, বড় আনন্দিত হলাম। তুমি মাঝে মাঝে একবার ক'রে এখানে এস, তোমাকেও তৈরী হ'তে হ'লে দু-একটা কাজ করতে হবে, সে ব'লে দেব।

প্রদ্যুম্ন আর একবার সম্মতিসূচক ঘাড়-নাড়বার পর সুরদাসের কাছে বিদায় চাইলে।

তারপর সে চিন্তিতভাবে বিহারের পথ ধরল।

তার মনে হচ্ছিল—দেবী সরস্বতী স্বয়ং? শ্বেতপদ্মের মত নাকি রংটি তাঁর, না জানি কত সুন্দর তাঁর মুখশ্রী! আচার্য্য বসুব্রত বলেন বটে……

ভদ্রাবতী নদীর ধারে শাল-পিয়াল-তমাল বনে সে-বার ঘনঘোর বর্ষা নামল। সারা আকাশ জুড়ে কোন্ বিরহিণী পুরসুন্দরীর অযত্নবিন্যস্ত মেঘবরণ চুলের রাশ এলিয়ে দেওয়া, প্রাবৃট-রজনীর ঘনান্ধকার তার প্রিয়হীন প্রাণের নিবিড় নির্জ্জনতা, দূর বনের ঝোড়ো হাওয়ায় তার আকুল দীর্ঘশ্বাস, তারই প্রতীক্ষাশ্রান্ত আঁখি-দুটির অশ্রুভারে ঝরঝর অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণ, মেঘমেদুর আকাশের বুকে বিদ্যুৎচমক তার হতাশ প্রাণে ক্ষণিক আশার মেঘদূত!

আষাঢ়ী পূর্ণিমার রাতে প্রদ্যুম্ন সুরদাসের সঙ্গে নদীর মাঠে গেল। তারা যখন সেখানে পৌছল, তখন মেঘ নেমে সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলেছে, চারিদিক তরল অন্ধকারে অস্পষ্ট দেখাচ্ছে।

প্রদ্যুম্ন সুরদাসের কথামত নদী থেকে স্নান ক'রে এসে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করলে। সঙ্গীর ক্রিয়াকলাপে প্রদ্যুম্ন বুঝতে পারলে তিনি একজন তান্ত্রিক। তাদের বিহারে একজন ভিক্ষু ছিলেন, তিনি যোগাচার্য্য পদ্মসম্ভবের শিষ্য। সেই ভিক্ষুর কাছে তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের কথা কিছু কিছু সে শুনেছিল। সুরদাস অনেকগুলো রক্তজবার মালা সঙ্গে ক'রে এনেছিলেন, তার মধ্যে কতকগুলো তিনি নিজে পরলেন, কতকগুলো প্রদ্যুম্নকে পরতে বললেন। ছোট মড়ার মাথার খুলিতে তেল সল্‌তে দিয়ে প্রদীপ জ্বাললেন। তাঁর পূজার আয়োজনে সাহায্য করতে করতে প্রদ্যুম্ন হাঁপিয়ে পড়ল। ব্যাপারটার শেষ পর্য্যন্ত কি দাঁড়ায় দেখবার জন্যে তার মনে এত কৌতূহল হচ্ছিল যে, অন্ধকার রাতে একজন প্রায়-অপরিচিত তান্ত্রিকের সঙ্গে একা থাকবার ভয়ের দিকটা তার একেবারেই চোখে পড়ল না। অনেক রাত্রে হোম শেষ হ'ল।

সুরদাস বললেন—প্রদ্যুম্ন, তুমি এবার তোমার কাজ আরম্ভ করো, আমার কাজ শেষ হয়েছে। খুব সাবধান, তোমার কৃতিত্বের ওপর এর সাফল্য নির্ভর করছে।

তাঁর চোখের কেমন একটা ক্ষুধিত দৃষ্টি যেন প্রত্যুম্নের ভালো লাগল না। কিন্তু তবু সে ব'সে একমনে বাঁশীতে মেঘ-মল্লার আলাপ আরম্ভ করলে।

তখন আকাশ বাতাস নীরব। অন্ধকারে সাম্‌নের মাঠটায় কিছু দেখবার উপায় নেই। শাল-বনের ডালপালায় বাতাস লেগে একরকম অস্পষ্ট শব্দ হচ্ছে। বড় মাঠের পারে শাল বনের কাছে দিক্‌চক্রবালের ধারে নৈশ প্রকৃতি পৃথিবীর বুকের অন্ধকার শষ্পশয্যায় তার অঞ্চল বিছিয়েছে। শুধু বিশ্রাম ছিল না ভদ্রাবতীর, সে কোন্ অনন্তের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দেবার আকুল আগ্রহে একটানা বয়ে চলেছে, মৃদু গুঞ্জনে আনন্দসঙ্গীত গাইতে গাইতে, কূলে তাল দিতে দিতে। হঠাৎ সাম্‌নের মাঠটা থেকে সমস্ত অন্ধকার কেটে গিয়ে সাদা মাঠটা তরল আলোকে প্লাবিত হয়ে গেল! প্রত্যুম্ন সবিস্ময়ে দেখলে—মাঠের মাঝখানে শত পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার মত অপরূপ আলোর মণ্ডলে কে এক জ্যোৎস্নাবরণী অনিন্দ্যসুন্দরী মহিমাময়ী তরুণী! তাঁর নিবিড় কৃষ্ণ কেশরাজি অযত্নবিন্যস্ত ভাবে তাঁর অপূর্ব্ব গ্রীবাদেশের পাশ দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে, তাঁর আয়ত নয়নের দীর্ঘ কৃষ্ণপক্ষ্ম কোন স্বর্গীয় শিল্পীর তূলি দিয়ে আঁকা, তাঁর তুষারধবল বাহুবল্লী দিব্য পুষ্পাভরণে মণ্ডিত, তাঁর ক্ষীণ কটি নীল বসনের মধ্যে অর্দ্ধলুক্কায়িত মণিমেখলায় দীপ্তিমান, তাঁর রক্তকমলের মত পা দুটিকে বুক পেতে নেবার জন্যে মাটিতে বাসন্তী পুষ্পের দল ফুটে উঠেছে··· হাঁ, এই তো দেবী বাণী! এঁর বীণার মঙ্গল-ঝঙ্কারে দেশে দেশে শিল্পীদের সৌন্দর্য্যতৃষ্ণা সৃষ্টিমুখী হয়ে উঠেছে, এঁর আশীর্ব্বাদে দিকে দিকে সত্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, এঁরই প্রাণের ভাণ্ডারে বিশ্বের সৌন্দর্য্যসম্ভার নিত্য অফুরন্ত রয়েছে, শাশ্বত এঁর মহিমা, অক্ষয় এঁর দান, চিরনূতন এঁর বাণী!

প্রত্যুম্ন চেয়ে থাক্‌তে থাক্‌তে দেবীর মূর্ত্তি অল্পে অল্পে মিলিয়ে গেল। জ্যোৎস্না আবার ম্লান হয়ে পড়ল, বাতাস আবার নিস্তেজ হয়ে বইতে লাগল।

অনেকক্ষণ প্রত্যুম্নের কেমন একটা মোহের ভাব দূর হ'ল না। সে যা দেখলে এ স্বপ্ন না সত্য? অবশেষে সুরদাসের কথায় তার চমক ভাঙল। সুরদাস বললে—আমার এখনও কাজ আছে, তুমি ইচ্ছা করলে যেতে পার—কেমন, আমার কথা মিথ্যা নয় দেখলে ত?

সুরদাসের কথা কেমন অসংলগ্ন বোধ হতে লাগল, তাঁর মুখের দিকে চেয়ে প্রদ্যুম্ন দেখলে তাঁর চোখ দুটো যেন অর্দ্ধ অন্ধকারের মধ্যে জ্বল্ জ্বল্ করছে।

তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে যখন বিহারের দিকে রওনা হ'ল, পূর্ণিমার চাঁদকে তখন মেঘে প্রায় ঢেকে ফেলেছে। একটু একটু জ্যোৎস্না যা আছে, তা কেমন হলদে রং-এর; গ্রহণের সময় জ্যোৎস্নার এ রকম রং সে কয়েকবার দেখেছে।

মাঠ খুব বড়, পার হতে অনেকটা সময় লাগল। তারপর মাঠ ছাড়িয়ে বড় বনটা আরম্ভ হ'ল। খুব ঘন বন, শাল দেবদারু গাছের ডালপালা নিবিড় হয়ে জড়াজড়ি ক'রে আছে, মধ্যে অন্ধকারও খুব। পাছে রাত ভোর হয়ে যায়, এই ভয়ে সে খুব দ্রুতপদে যাচ্ছিল। যেতে যেতে তার চোখ পড়ল বনের মধ্যে এক স্থান দিয়ে যেন খানিকটা আলো বেরুচ্ছে। প্রথমে সে ভাবলে,গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়ে থাকবে, কিন্তু ভালো ক'রে লক্ষ্য ক'রে দেখে সে বুঝলে যে, সে আলো জ্যোৎস্নার আলোর মতন নয়, বরং···কৌতূহল অত্যন্ত হওয়াতে পথ ছেড়ে সে বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। যে পিপ্পল গাছের সারির ফাঁক দিয়ে আলো আসছিল, তার কাছে গিয়ে গাছের গুঁড়ির ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে প্রদ্যুম্ন অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

একি! এঁকেই তো সে এইমাত্র মাঠের মধ্যে দেখেছে, এই সেই অপরূপ সুন্দরী নারী তো!

অদ্ভুত! সে দেখলে যাঁকে এইমাত্র মাঠের মধ্যে দেখেছে সেই অপরূপ দ্যুতিশালিনী নারী বনের মধ্যে চারিধারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, জোনাকী পোকার হুল থেকে যেমন আলো বার হয়—তাঁর সমস্ত অঙ্গ দিয়ে তেম্নি একরকম স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলো বেরুচ্ছে, অনেকদূর পর্য্যন্ত বন সে আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, আর একটু নিকটে গিয়ে সে লক্ষ্য করলে, তাঁর আয়ত চক্ষু দুটি অর্দ্ধনিমীলিত, যেন কেমন নেশার ঘোরে তিনি চারিপাশে হাতড়ে পার হবার পথ খুঁজে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু তা না পেয়ে পিপ্পল গাছ-গুলোর চারিধারে চক্রাকারে ঘুরছেন, তাঁর মুখশ্রী অত্যন্ত বিপন্নের মত।

প্রদ্যুম্নের হঠাৎ বড় ভয় হ'ল। সে ভাবলে মাঠে সরস্বতী দেবীর দর্শন থেকে আর এ পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনাটা আগাগোড়া ভৌতিক, এই নিশীথ রাত্রে শালের বনে নইলে একি কাণ্ড!

সে আর সেখানে মোটেই দাঁড়াল না। বন থেকে বার হয়ে দ্রুত হাঁটতে হাঁটতে যখন সে বিহারের উদ্যানে এসে পৌছল, ম্লান চাঁদ তখন কুমাপ-শ্রেণীর পাহাড়ের পিছনে অস্ত যাচ্ছে।

ভোর রাত্রে শয্যায় শুয়ে ঘুমিয়ে প'ড়ে সে স্বপ্ন দেখলে—ভদ্রাবতীর গভীর কালো জলের তলায় রাতের অন্ধকারে কে এক দেবী পথ হারিয়ে ফেলেছেন; তিনি যতই উপরে ওঠবার চেষ্টা পাচ্ছেন, জলের ঢেউ তাঁকে ততই বাধা দিচ্ছে, নদীর জলে তাঁর অঙ্গের জ্যোতি ততই নিবে আসছে, অন্ধকার ততই তাঁর চারিপাশে গাঢ় হয়ে আসছে, নদীর মাছগুলো তাঁর কোমল পা দুখানি ঠুক্‌রে রক্তাক্ত ক'রে দিচ্ছে···ব্যথিতদেহা, বিপন্না, বেপথু-মতী দেবীর দুঃখ দেখে একটা বড় মাছ দাঁত বার ক'রে হিংস্র হাসি হাসছে, মাছটার মুখ গায়ক সুরদাসের মত!

প্রদ্যুম্ন ভোরে উঠেই আচার্য্য পূর্ণবর্দ্ধনের কাছে গিয়ে সুরদাসের সঙ্গে প্রথম দেখার দিন থেকে গত রাত্রি পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যাপার খুলে বললে। আচার্য্য পূর্ণবর্দ্ধন বৌদ্ধ দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন, মঠের ভিক্ষুদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও বিজ্ঞ, এজন্য সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করত। তিনি সব শুনে বিস্মিত হলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখের দৃষ্টি শঙ্কাকুল হয়ে উঠল। জিজ্ঞাসা করলেন—একথা আগে জানাওনি কেন?

—তিনি নিষেধ করেছিলেন। আমি তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞা—

—বুঝেছি। তবে এখন বলতে এসেছ কেন?

—এখন আমার মনে হচ্ছে, আমি কার যেন কি অনিষ্ট করেছি।

পূর্ণবর্দ্ধন একটুখানি কি ভাবলেন, তারপর বললেন—এই রকম একটা কিছু ঘটবে তা আমি জানতাম। পদ্মসম্ভব আর তার কতকগুলো কাণ্ডজ্ঞান-হীন তান্ত্রিক শিষ্য দেশের ধর্ম্ম-কর্ম্ম লোপ করতে বসেছে। স্বার্থসিদ্ধির জন্য

এরা না করতে পারে এমন কোন কাজই নেই—আর আমি বেশ দেখছি প্রদ্যুম্ন যে, তোমার এই অবাধ্যতা ও অযথা কৌতুকপ্রিয়তাই তোমার সর্ব্বনাশের মূল হবে। তুমি কাল রাত্রে অত্যন্ত অন্যায় কাজ করেছ, তুমি দেবী সরস্বতীকে বন্দিনী করবার সহায়তা করেছ।

এবার প্রদ্যুম্নের বিস্মিত হবার পালা। তার মুখ দিয়ে কোনো কথা বার হ'ল না। পূর্ণবর্দ্ধন বললেন—এই সব কুসংসর্গ থেকে দূরে রাখবার জন্যেই আমি বিহারের কোনও ছাত্রকে বিহারের বাইরে যাবার অনুমতি দিইনে, কিন্তু যাক্, তুমি ছেলেমানুষ, তোমারই বা দোষ কি। আচ্ছা, এই সুরদাসকে দেখতে কি রকম বল দেখি?

প্রদ্যুম্ন সুরদাসের আকৃতি বর্ণনা করলে।

পূর্ণবর্দ্ধন বললেন—আমি জানি। তুমি যাকে সুরদাস বলছ, তার নাম সুরদাস নয় বা তার বাড়ী অবন্তীতেও নয়। সে হচ্ছে প্রসিদ্ধ কাপালিক গুণাঢ্য। কার্য্যসিদ্ধির জন্যে তোমার কাছে মিথ্যা নাম বলেছে—

প্রদ্যুম্ন অধীর ভাবে বলে উঠল, কিন্তু আপনি যে বলেছেন—

পূর্ণবর্দ্ধন বললেন, সে ইতিহাস বলছি শোন। নদীর ধারে যে সরস্বতী মন্দিরের ভগ্নস্তূপ আছে, ওটা হিন্দুদের একটা অত্যন্ত বিখ্যাত তীর্থস্থান। প্রায় দু'শত বৎসর পূর্ব্বে একজন তরুণ গায়ক ওখানে থাকৃত। তখন মন্দিরের খুব সমৃদ্ধির অবস্থা ছিল না। কিন্তু প্রবাদ এই যে, সে গায়কটি মেঘ-মল্লারে এমন সিদ্ধ ছিল যে, আষাঢ়ী পূর্ণিমার রাতে তার আলাপে মুগ্ধা হয়ে দেবী সরস্বতী স্বয়ং তার কাছে আবির্ভূতা হতেন। সেই থেকে ওই মন্দির এক প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান হয়ে ওঠে। সে গায়ক মারা যাওয়ার পরেও কিন্তু পূর্ণিমার রাতে সিদ্ধ গায়কে মল্লার আলাপ করলেই দেবী যেন কোন্ টানে তার কাছে এসে পড়েন। এই গুণাঢ্য একবার অবন্তীর প্রসিদ্ধ গায়ক সুরদাসের সঙ্গে ওই টিবিতে উপস্থিত ছিল। সুরদাস মেঘ-মল্লারে সিদ্ধ ছিলেন। তাঁর গানে নাকি সরস্বতী দেবী তাঁর সম্মুখে আবির্ভূতা হয়ে তাকে বর প্রার্থনা করতে বলেন। সুরদাস প্রার্থনা করেন, তিনি যেন দেশের সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন প্রাপ্ত হন। সরস্বতী দেবী তাঁকে সেই বরই দেন। তার পর

দেবী যখন গুণাঢ্যকে বর প্রার্থনার কথা বলেন, তখন সে দেবীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকেই প্রার্থনা ক'রে বসে। সরস্বতী দেবী বলেছিলেন, তাঁকে পাওয়া নির্গুণের কাজ নয়, সে নামে গুণাঢ্য হ'লেও কার্য্যত তার এমন কোনো কলাতেই নিপুণতা নেই যে তাঁকে পেতে পারে, সেজন্য অনেক জীবন ধ'রে সাধনার প্রয়োজন। সরস্বতী দেবী অন্তর্হিত হওয়ার পর মূর্খ গুণাঢ্যের মোহ আরও বেড়ে যায়, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে দেবীর উপর তার অত্যন্ত রাগ হয়। সে তন্ত্রোক্ত মন্ত্রবলে দেবীকে বন্দিনী করবার জন্যে উপযুক্ত তান্ত্রিক গুরু খুঁজতে থাকে। আমি জানি সে এক সন্ন্যাসীর কাছে তন্ত্রশাস্ত্রের উপদেশ নিত। সন্ন্যাসী কিছুদিন পরে তার তন্ত্রসাধনার হীন উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে তাকে দূর করে দেন। এসব কথা এদেশের সকল প্রাচীন লোকই জানেন। আমি অনেকদিন তারপর গুণাঢ্যের আর কোনও সংবাদ জানতাম না। ভেবেছিলাম সে এদেশ থেকে চলে গিয়েছে। কিন্তু এখন তোমার কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে কাল রাত্রে সে কৃতকার্য্য হয়েছে বোধ হয়। এতদিন ঐ উদ্দেশ্যেই সে কোথাও তন্ত্রসাধনা করছিল। যাক্ তুমি এখনি গিয়ে সন্ধান করো মন্দিরে সে আছে কি না, থাকে যদি আমায় সংবাদ দিও।

প্রদ্যুম্ন সেখানে আর এক মুহূর্ত্তও দাঁড়াল না। সে ছুটে গিয়ে বিহারের উদ্যানে পড়ল। তখন রোদ বেশ ফুটে উঠেছে, বিহারের পাঠার্থীদের সমবেত কণ্ঠের স্তোত্রগান তার কানে আসছিল :—

যে ধম্মা হেতুপ্পভবা
তেসং হেতুং তথাগতো আহ
তেসঞ্চ যে নিরোধো
এবং বাদী মহাসমনো।

যেতে যেতে সে দেখলে উদ্যানের এক প্রান্তে একটা বড় জামগাছের ছায়ায় চিত্রকর ভিক্ষু বসুব্রত হরিণচর্ম্মের আসনে ব'সে বোধ হয় কি আঁকছেন, কিন্তু তাঁর মুখে অতৃপ্তি ও অসাফল্যের একটা চিহ্ন আঁকা।

প্রদ্যুম্ন যা ভেবেছিল তাই ঘটল। মন্দিরে গিয়ে সে দেখলে—সেখানে কেউ নেই, গুণাঢ্য, তো নেইই, সেই আজীবক সন্ন্যাসী পর্য্যন্ত নেই।

দু'একটা যবাগূ-পানের ঘট, আগুন জ্বালবার জন্যে সংগৃহীত কিছু শুক্‌নো কাঠ মন্দিরের মধ্যে এদিক ওদিক ছড়ানো প'ড়ে আছে।

সেইদিন গভীর রাত্রে প্রদ্যুম্ন কাউকে কিছু না ব'লে চুপি চুপি বিহার পরিত্যাগ করলে।

তার পর এক বৎসর কেটে গিয়েছে।

বিহার পরিত্যাগ করবার পর প্রদ্যুম্ন একবার কেবল সুনন্দার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলেছিল, সে বিশেষ কোন কাজে বিদেশে যাচ্ছে, শীঘ্রই ফিরে আসবে। এই এক বৎসর সে কাঞ্চী, উত্তর কোশল ও মগধের সমস্ত স্থান খুঁজেছে, কোথাও গুণাঢ্যের সন্ধান পায়নি।

তবে বেড়াতে বেড়াতে কতকগুলি কৌতূহলজনক কথা তার কানে গিয়েছে।

মগধের প্রসিদ্ধ ভাস্কর মিহিরগুপ্ত রাজার আদেশমত ভগবান্ তথাগতের মূর্ত্তি তৈরী করতে আদিষ্ট হয়েছিলেন। এক বৎসর পরিশ্রম ক'রে তিনি যে মূর্ত্তি গড়ে তুলেছেন, তার মুখশ্রী এমন রূঢ় ও ভাববিহীন হয়েছে যে তা বুদ্ধের মূর্ত্তি কি মগধের দুর্দ্দান্ত দস্যু দমনকের মূর্ত্তি, তা সেদেশের লোক ঠিক বুঝতে পারছে না।

তক্ষশীলার বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত যমুনাচার্য্য মীমাংসাদর্শনের ভাষ্য প্রণয়ন করতে নিযুক্ত ছিলেন, হঠাৎ তাঁর নাকি এমন দুর্দ্দশা ঘটেছে যে তিনি আর সূত্রের অর্থ ক'রে উঠতে না পেরে আবার বৈদিক ব্যাকরণের সুবন্ত প্রকরণ থেকে পড়তে আরম্ভ করেছেন।

মহাকোট্‌ঠী বিহারের চিত্রবিদ্যা-শিক্ষক ভিক্ষু বসুব্রত "বুদ্ধ ও সুজাতা" নামক তাঁর চিত্রখানা বৎসরাবধি চেষ্টা করেও মনের মত ক'রে এঁকে উঠতে না পেরে বিরক্ত হয়ে ওদিক একেবারে ছেড়ে দিয়ে সম্প্রতি নাকি শাকুনশাস্ত্রের চর্চ্চায় অত্যন্ত উৎসাহ দেখাচ্ছেন।

একদিন প্রদ্যুম্ন সন্ধান পেলে উরুবিল্ব গ্রামের কাছে একটা নির্জ্জন স্থানে একজন গো-চিকিৎসক এসে বাস করছেন। তাঁর চেহারার বর্ণনার সঙ্গে

সুরদাসের আকৃতির অনেকটা মিল হ'ল। তখনি সে গ্রামে গিয়ে অনেককে জিজ্ঞাসা করলে, কিন্তু গো-চিকিৎসকের সন্ধান কেউ দিতে পারলে না।

সেদিন ঘুরতে ঘুরতে অবসন্ন অবস্থায় উরুবিল্ব গ্রামের প্রান্তরে একটা বড় বট গাছের ছায়ায় সে বসেছে। সন্ধ্যা তখনও নামেনি, ঝিরঝিরে বাতাসে গাছের পাতাগুলো নাচছে, পাশে মাঠে পাকা শস্যের শীষগুলো সোনার মত চিক্‌মিক্ করছে, একটু দূরে একটা ডোবার মতো জলাশয়ে বিস্তর কুমুদ ফুল ফুটে আছে, অনেক বন্যহংস তার জলে খেলা করছে।

সাম্‌নে একটু দূরে একটা ছোট পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে একটা ঝরণা। পাহাড়ের নীচে এক জায়গায় ঝরণার জল খানিকটা আট্‌কে গিয়ে ওই ডোবার মতো জলাশয়টা তৈরী করেছে। প্রদ্যুম্নের হঠাৎ চোখ পড়ল, পাহাড়ের গা বেয়ে ধাপে ধাপে ঘট কক্ষে এক স্ত্রীলোক নেমে আসছেন।

দেখে তার মনে কেমন সন্দেহ হওয়াতে সে এগিয়ে গেল। ডোবার একদিকের উঁচু পাড়ে গিয়ে দেখেই তার মাথাটা যেন ঘুরে উঠল—এই তো! এই তো তিনি! ভদ্রাবতীর তীরের শালবনে ইনিই তো পথ হারিয়ে ঘুরছিলেন, মাঠের মধ্যে জ্যোৎস্নারাতে এঁকেই তো সে দেখেছিল—তবে তাঁর অঙ্গের সে জ্যোতির এক কণাও আর নেই, পরণে অতি মলিন এক বস্ত্র। কিন্তু সেই চোখ, সেই সুন্দর গঠন!

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে তার আর কোন সন্দেহ রইল না যে, এই তিনি। তার মনের মধ্যে গোলমাল বেধে গেল। সে উত্তেজনার মাথায় বিহার ছেড়ে সুরদাসের খোঁজ ক'রে বেড়াচ্ছিল বটে, কিন্তু দেখা পেলে কি করবে তা সে ভাবেনি। কাজেই সে একরকম লুকিয়েই সেখান থেকে চ'লে এল।

রোজ রোজ সন্ধ্যায় প্রদ্যুম্ন এসে বটগাছটার তলায় বসে। রোজ সন্ধ্যার আগে দেবী পাহাড়ের গায়ের পথ বেয়ে নেমে আসেন, আবার সন্ধ্যার সময় ঘটকক্ষে ধাপে ধাপে উঠে চ'লে যান—সে রোজ ব'সে দেখে।

এই রকম কিছু দিন কেটে গেল। একদিন প্রদ্যুম্ন মাঠের গাছতলায় চুপ ক'রে ব'সে আছে, সেই সময় দেবী জলাশয়ে নাম্‌লেন। সেও কি ভেবে

ডোবার এদিকের পাড়ের দিকে দাঁড়াল—দেখলে দেবী ঘট নামিয়ে রেখে কুমুদ ফুল সংগ্রহে বড় ব্যস্ত। একটা বড় ফুল জলাশয়ের এপারের দিকে এগিয়ে বেশি জলে ফুটেছিল, তিনি সেটা সংগ্রহের জন্য খানিকটা বৃথা চেষ্টা করবার পর চোখ তুলে অপর পারে প্রদ্যুম্নকে দেখতে পেয়ে হঠাৎ একটু অপ্রতিভের হাসি হাসলেন—তার পর হাসিমুখে তার দিকে চেয়ে বললেন—ফুলটা আমায় তুলে দেবে?

—দিই যদি আপনি এক কাজ করেন।

—কি বলো?

—আমায় কিছু খেতে দেবেন? আমি সমস্ত দিন কিছু খাইনি।

দেবীর মুখে ব্যথার চিহ্ন দেখা দিল। বললেন—আহা! তা এতক্ষণ বলনি কেন?—এপারে এস, থাক্‌গে ফুল।

প্রদ্যুম্ন জলে নেমে ফুলটা সংগ্রহ ক'রে ওপারে গেল।

দেবী বললেন, তুমি মাঠের মাঝের ওই বড় গাছটার তলায় রোজ ব'সে থাক, না?

প্রদ্যুম্ন তাঁর হাতে ফুলটা দিয়ে বললে—হাঁ, আমিও দেখি আপনি সন্ধ্যার সময় রোজই জল নিতে আসেন।

দেবী হাসিমুখে বললেন, ওই পাহাড়ের ওপরই আমাদের ঘর—এস তুমি আমার সঙ্গে—তোমায় খেতে দিইগে।

হঠাৎ দেবী যেন কেমন একপ্রকার বিহ্বল-চোখে চারিদিকে চাইলেন। তারপর পাহাড়ের গায়ে কাটা ধাপ বেয়ে উঠতে লাগলেন, প্রদ্যুম্ন পিছনে পিছনে চল্‌ল। পাহাড়ের উপর উঠে গিয়ে—একটু দূরে বুনো বাঁশঝাড়ের আড়ালে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটা ছোট কুটীর। দেবী বন্ধ দুয়ার খুলে ঘরের মধ্যে গিয়ে প্রদ্যুম্নকে বল্‌লেন—এস।

প্রদ্যুম্ন দেখলে কুটীরে কেউ নেই, জিজ্ঞাসা করলে—আপনি কি এখানে একা থাকেন?

দেবী বললেন—না। এক সন্ন্যাসী আমায় এখানে সঙ্গে ক'রে এনেছেন,

তিনি কি করেন জানিনে, কিন্তু মাঝে মাঝে এখান থেকে চ'লে যান, পাঁচ ছ'দিন পরে আসেন। তুমি এখানে ব'সো।

দেবী মাটির ঘট পূর্ণ ক'রে তাকে যবাগূ পান করতে দিলেন, স্বাদ অমৃতের মতো, এমন সুস্বাদু যবাগূ সে পূর্ব্বে কখনো পান করেনি।

প্রদ্যুম্নের মনে হল, যদি আচার্য্য পূর্ণবর্দ্ধনের কথা সত্য হয়, আর যদি সে স্বচক্ষে যা দেখেছে তা ইন্দ্রজাল না হয় তবে এই তো দেবী সরস্বতী তার সামনে। তার জান্‌বার কৌতূহল হল, ইনি নিজের সম্বন্ধে কি বলেন।

সে জিজ্ঞাসা করলে—আপনারা এর আগে কোথায় ছিলেন? আপনার দেশ কোথা?

দেবী কাঠের বড় পাত্রে সযত্নে সূপ ও অন্ন পরিবেষণে ব্যস্ত ছিলেন, প্রশ্ন শুনে বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে তিনি প্রদ্যুম্নের দিকে চেয়ে বললেন—আমার কথা বলছ? আমার দেশ কোথায় জানিনে। আমি নাকি বিদিশার পথের ধারে এক ভাঙা মন্দিরে অচেতন অবস্থায় প'ড়ে ছিলাম, সন্ন্যাসী আমায় এখানে উঠিয়ে এনেছেন। সেই থেকে এখানেই আছি—তার-আগে কোথায় ছিলাম তা' আমার মনে পড়ে না।

তিনি অন্যমনস্কভাবে বাইরে সাঁঝের রক্তিম আকাশে যেখানে উরুবিল্ব গ্রামের প্রান্তরে বনরেখার মাথায় সূর্য্য হেলে পড়েছেন, সেই দিক চেয়ে রইলেন—চেয়ে চেয়ে কি মনে আন্‌বার চেষ্টা করলেন, বোধ হয় মনে এল না। হঠাৎ কি ভেবে তাঁর পদ্মের পাপড়ির মতো চোখ দু'টি বেয়ে ঝর্‌ঝর্‌ ক'রে জল ঝরে পড়ল।

তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ মুছে তিনি প্রদ্যুম্নের সামনে অন্নে পূর্ণ কাঠের থালা রাখলেন। বললেন—খাবার জিনিস কিছুই নেই। তুমি রাত্রে এখানে থাকো, আমি পদ্মের বীজ শুকিয়ে রেখেছি, তাই দিয়ে রাত্রে পায়স তৈরী ক'রে খেতে দেব। সকালে যেও।

প্রদ্যুম্নের চোখে জল আস্‌ছিল।...ওগো বিশ্বের আত্মবিস্মৃতা সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী, বিদিশার মহারাজের আর মহাশ্রেষ্ঠীর সমবেত রত্নভাণ্ডার তোমার পায়ের এক কণা ধূলোরও যোগ্য নয়, সে দেশের পথের ধূলো এমন কি পুণ্য করেছে মা, যে তুমি সেখানে প'ড়ে থাকতে যাবে?

খাওয়া শেষ হ'লে প্রদ্যুম্ন বিদায় চাইলে।

দেবীর চোখে হতাশার দৃষ্টি ফুটে উঠল, বললেন—থাকো না কেন রাত্রে? আমি রাত্রে পায়স রেঁধে দেব।

প্রদ্যুম্ন জিজ্ঞাসা করলে—আপনার এখানে একা রাত্রে থাকতে ভয় করে না?

—খুব ভয় করে। ওই বেতের বনে অন্ধকারে কি যেন নড়ে, ভয়ে আমি দোর খুলতে পারিনে! ঘুম হয় না, সমস্ত রাত ব'সেই থাকি।

প্রদ্যুম্নের হাসি পেল, ভাবলে রাত্রে একা থাকতে ভয় করে ব'লে পায়সের লোভ দেখিয়ে দেবী তাকে সঙ্গে রাখতে চান। সে বললে,—আচ্ছা রাত্রে থাকব।

দেবীর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হ'ল।

সমস্ত রাত সে কুটীরের বাইরে খোলা হাওয়ায় ব'সে কাটালে। দেবীও কাছে ব'সে রইলেন। বল্লেন—এমন জ্যোৎস্না, আমি কিন্তু ভয়ে বাইরে আসতে পারিনে, ঘরের মধ্যে ব'সে রাত কাটাই।

দেবীর ব্যাপার দেখে প্রদ্যুম্ন অবাক হয়ে গিয়েছিল। হ'লেই বা মন্ত্রশক্তি, কিন্তু এতটা আত্মবিস্মৃত হওয়া, এ যে তার কল্পনার বাইরের জিনিস।

নানা গল্পে সমস্ত রাত কাটল, ভোর হ'লে সে বিদায় চাইলে।

দেবী ব'লে দিলেন—সন্ন্যাসী এলে একদিন আবার এস।

সেইদিন থেকে প্রতিরাত্রে সে দেবীর অলক্ষিতে পাহাড়ের নীচে ব'সে কুটীরের দিকে চেয়ে পাহারা রাখত। তার তরুণ বীর হৃদয় এক ভীরু নারীকে একা বনের মধ্যে ফেলে রাখার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তুলেছিল।

দশ পনের দিন কেটে গেল।

এক-একদিন প্রদ্যুম্ন শুনত, দেবী অনেক রাতে একা গান গাইছেন—সে গান পৃথিবীর মানুষের গান নয়, সে গান প্রাণ-ধারায় আদিম ঝরণার গান, সৃষ্টিমুখা নীহারিকাদের গান, অনন্ত আকাশে দিক্‌হারা কোন্ পথিক তারার গান।

একদিন দুপুর বেলা কে তাকে বললে—তুমি যে গো-বৈদ্যের কথা বলছিলে, তাকে এইমাত্র দেখে এলাম, পথের ধারে পুকুরে সে স্নান করছে।

শুনে ছুট্‌তে ছুট্‌তে গিয়ে সে পুকুরের ধারে উপস্থিত হ'ল। দেখলে সত্যই গুণাঢ্য, পুকুরের ধারে বস্ত্রাদির পুঁটুলি নামিয়ে রেখে পুকুরে স্নান করতে নেমেছেন। সে অপেক্ষা করতে লাগল।

একটু পরে গুণাঢ্য বস্ত্র পরিবর্ত্তন ক'রে উপরে উঠে প্রদ্যুম্নকে দেখে কেমন যেন হয়ে গেলেন। বললেন—তুমি এখানে?

প্রদ্যুম্ন বললে—আমি কেন তা বুঝতে পারেন নি?

গুণাঢ্য বললেন—তুমি এখন বলছ ব'লে নয় প্রদ্যুম্ন, আমি একাজ করবার পর যথেষ্ট অনুতপ্ত আছি। প্রতি রাত্রে ভয়ানক স্বপ্ন দেখি—কারা যেন বলছে, তুই যে কাজ করেছিস এর শাস্তি অনন্ত নরক। আমি এইজন্যেই আজ এক পক্ষের ওপর আমার গুরু সেই আজীবক সন্ন্যাসীর কাছে গিয়েছিলাম। তাঁরই কাছে এ বশীকরণ মন্ত্র আমি শিক্ষা করি। এর এমনি শক্তি যে মনে করলে আমি যাকে ইচ্ছা বাঁধতে পারি, কিন্তু আনতে পারিনে। মন্ত্রের বন্ধন-শক্তি থাকলেও আকর্ষণী শক্তি নেই। এইজন্যে আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়েছিলুম, আমি নিজে সঙ্গীতের কিছুই জানিনে যে তা নয়, কিন্তু আমি জানতাম যে তুমি মেঘ-মল্লারে সিদ্ধ, তোমার গানে দেবী ওখানে আসবেনই, এলে তারপর মন্ত্রে বাঁধব। এর আগে আমার বিশ্বাসই ছিল না যে, এমন একটা ব্যাপার হওয়া সম্ভব। অনেকটা মন্ত্রের গুণ পরীক্ষা করবার কৌতূহলেই আমি এ কাজ করি।

প্রদ্যুম্ন বললে—এখন?

গুণাঢ্য বললেন—এখন আমায় গুরুর কাছ থেকেই আসছি। তিনি সব শুনে একটা মন্ত্র শিক্ষা দিয়েছেন, এটা পূর্ব্ব মন্ত্রের বিরোধী শক্তি সম্পন্ন। সেই মন্ত্রপূত জল দেবীর গায়ে ছড়িয়ে দিলে তিনি আবার মুক্ত হবেন বটে, কিন্তু তার কোন উপায় নেই।

প্রদ্যুম্ন জিজ্ঞাসা করলে—উপায় নেই কেন?

—যে ছিটিয়ে দেবে, সে চিরকালের জন্য পাষাণ হয়ে যাবে। আমার

পক্ষে দু'দিকই যখন সমান, তখন তাঁকে বন্দিনী রাখাই আমার ভালো। রাগ কোরো না প্রদ্যুম্ন, ভেবে দেখ, মৃত্যুর পর হয় তো পরজগৎ আছে কিন্তু পাষাণ হওয়ার পর? তা আমি পারব না।

আত্মবিস্মৃতা বন্দিনী দেবীর চোখ দু'টির করুণ অসহায় দৃষ্টি প্রদ্যুম্নের মনে এল। যদি তা না হয় তা হ'লে তাঁকে যে চিরদিন বন্দিনী থাকতে হবে!

যুগে যুগে যে উদার উচ্চ প্রেরণা আগে এসে তরুণদের নির্মল প্রাণে পৌছয়, আজও প্রদ্যুম্নের প্রাণের বেলায় তার ঢেউ এসে লাগল। সে ভাবলে, একটা জীবন তুচ্ছ। তাঁর রাঙা পা-দু'খানিতে একটা কাঁটা ফুটলে তা তুলে দেবার জন্যে আমি শতবার জীবন দিতে প্রস্তুত।

হঠাৎ গুণাঢ্যের দিকে চেয়ে সে বললে—চলুন আপনার সঙ্গে যাব, আমায় সে মন্ত্রপূত জল দেবেন।

গুণাঢ্য বিস্ময়ে প্রদ্যুম্নের দিকে চেয়ে বললেন—বেশ ক'রে ভেবে দেখ। এ ছেলেখেলা নয়। এ কাজ—

প্রদ্যুম্ন বললে—চলুন আপনি।

তারা যখন কুটীরের নিকটবর্ত্তী হ'ল তখন গুণাঢ্য বললেন—প্রদ্যুম্ন, আর একবার ভালো ক'রে ভেবে দেখ, কোন মিথ্যা আশায় ভুলো না, এ থেকে তোমায় উদ্ধার করবার ক্ষমতা কারুর হবে না—দেবীরও না। মন্ত্রবলে তোমার প্রাণশক্তি চিরকালের জন্য জড় হয়ে যাবে; বেশ বুঝে দেখ। মন্ত্রশক্তি নির্ম্মম অমোঘ, কাউকে রেহাই দেবে না।

প্রদ্যুম্ন বললে—আপনি কি ভাবেন আমি কিছু গ্রাহ্য করি?—কিছু না, চলুন।

কুটীরে তারা যখন গিয়ে উপস্থিত হ'ল, তখন রোদ বেশ প'ড়ে এসেছে। দেবী কুটীরের বাইরে ঘাসের উপর অন্যমনস্কভাবে চুপ ক'রে ব'সে ছিলেন—প্রদ্যুম্নকে আসতে দেখে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন, হাসিমুখে বললেন—এস, এস। আমি তোমার কথা প্রায়ই ভাবি। তোমায় সেদিন কিছু খেতে

দিতে না পেরে আমার মন খুবই খারাপ হয়েছিল। এখন তুমি এখানে কিছুদিন থাকো।

তিনি দু'জনকে খেতে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে কুটীরের মধ্যে চ'লে গেলেন।

প্রদ্যুম্ন বললে—কই আমায় মন্ত্রপূত জল দিন তবে?

গুণাঢ্য বললেন—সত্যই তা হ'লে তুমি এতে প্রস্তুত?

প্রদ্যুম্ন বললে—আমায় আর কিছু বলবেন না, জল দিন।

দেবী কুটীরের মধ্যে আহারের স্থান ক'রে দু'জনকে খেতে দিলেন—আহারাদি যখন শেষ হ'ল, তখন সন্ধ্যার আর বেশি দেরী নেই। বেতসবনে ছায়া নেমে আসছে, রাঙা সূর্য্য আবার উরুবিল্ব গ্রামের উপর ঝুলে পড়েছে।

গোধূলির আলোয় দেবীর মুখপদ্মে অপরূপ শ্রী ফুটে উঠল।

তারপর তিনি ঘট-কক্ষে প্রতিদিনের মত নীচের ঝরণায় জল আনতে নেমে গেলেন।

গুণাঢ্য বললেন—আমি এখান থেকে আগে চ'লে যাই, তার পর এই ঘটপূর্ণ জল দেবীর গায়ে ছিটিয়ে দিও।

তাঁর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হ'ল। আবেগভরে তিনি প্রদ্যুম্নকে আলিঙ্গন ক'রে বললেন—আমি কাপুরুষ, আমার সে সাহস নেই, নইলে—

তিনি কুটীরের মধ্যে তাঁর দ্রব্যাদি সংগ্রহ ক'রে নিলেন। তারপর সরু পথ বেয়ে বেত বনের ধার দিয়ে পাহাড়ের অপর পারে চ'লে গেলেন, তারই নীচে একটু দূরে মগধ থেকে বিদিশা যাওয়ার রাজবর্ত্ম।

প্রদ্যুম্ন চারিদিক চেয়ে ব'সে ব'সে ভাবলে, ঐ নীল আকাশের তলে বিশ বৎসর আগে সে মায়ের কোলে জন্মেছিল, তার সে মা বারাণসীতে তাদের গৃহটিতে ব'সে বাতায়ন-পথে সন্ধ্যার আকাশের দিকে চেয়ে হয়তো প্রবাসী পুত্রের কথাই ভাবছেন—মায়ের মুখখানি একবারটি শেষবারের জন্যে দেখতে তার প্রাণ আকুল হ'য়ে উঠল। ঐ পূব আকাশে নবমীর চাঁদ কেমন উজ্জ্বল হয়েছে। মগধ যাবার রাজপথে গাছের সারির মাথায় একটা তারা ফুটে উঠল। বেতবনের বেতডাঁটাগুলো তরল অন্ধকারে আর ভালো দেখা যায় না।

প্রদ্যুম্নের চোখ হঠাৎ অশ্রুপূর্ণ হ'ল।

সেই সময়ে সে দেখলে—দেবী জল নিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে আসছেন। মন্ত্রপূত জলপূর্ণ ঘট সে মাটিতে নামিয়ে রেখেছিল; দেবীকে আসতে দেখে সে তা হাতে তুলে নিলে।

দেবী কুটীরের সামনে এলেন, তাঁর হাতে অনেকগুলো আধ ফোটা কুমুদ ফুল।

প্রদ্যুম্নকে জিজ্ঞাসা করলেন—সন্ন্যাসী কোথায়?

প্রদ্যুম্ন বললে—তিনি আবার কোথায় চ'লে গেলেন। আজ আর আসবেন না।

তারপর সে গিয়ে দেবীর পায়ের ধূলো নিয়ে তাঁকে প্রণাম ক'রে বললে—মা, না জেনে তোমার ওপর অত্যন্ত অন্যায় আমি করেছিলাম, আজ তারই শাস্তি আমাকে নিতে হবে। কিন্তু আমি তার জন্যে এতটুকু দুঃখিত নই। যতক্ষণ জ্ঞান লুপ্ত না হয়ে যায়, ততক্ষণ এই ভেবে আমার সুখ যে, বিশ্বের সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীকে অন্যায় বাঁধন থেকে মুক্ত করাব অধিকার আমি পেয়েছি।

দেবী বিস্মিত দৃষ্টিতে প্রদ্যুম্নের দিকে চেয়ে রইলেন।

প্রদ্যুম্ন বললে—শুনুন, আপনি বেশ ক'রে মনে ক'রে দেখুন দেখি আপনি কোথা থেকে এসেছিলেন?

দেবী বললেন—কেন, আমি ত বিদিশার পথের ধারে—

প্রদ্যুম্ন এক অঞ্জলি জল তাঁর সর্ব্বাঙ্গে ছিটিয়ে দিলে।

সদ্যোনিদ্রোত্থিতার মত দেবী যেন চমকে উঠলেন .....

প্রদ্যুম্ন দৃঢ় হস্তে আর-এক অঞ্জলি জল দেবীর সর্ব্বাঙ্গে ছড়িয়ে দিলে। নিমেষের জন্যে তার চোখের সামনে বাতাসে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের স্নিগ্ধ প্রসন্ন হিল্লোল ব'য়ে গেল। তার সারা দেহমন আনন্দে শিউরে উঠল; সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে এল—বারাণসীতে তাদের গৃহে সন্ধ্যার আকাশে বদ্ধ-আঁখি বাতায়নপথবর্ত্তিনী তার মা!

কুমারশ্রেণীর বিহারে আচার্য্য শীলব্রতের কাছে একটি মেয়ে অল্প বয়সে

দীক্ষা গ্রহণ করে। তার নাম সুনন্দা, সে হিরণ্যনগরের ধনবান্ শ্রেষ্ঠী সুমন্তদাসের মেয়ে। পিতামাতার অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও মেয়েটি নাকি বিবাহ করতে সম্মত হয়নি। অত্যন্ত তরুণ বয়সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করায় সে বিহারের সকলের শ্রদ্ধার পাত্রী হয়ে উঠেছিল। সেখানে কিন্তু কারো সঙ্গে সে তেমন মিশত না, সর্ব্বদাই নিজের কাজে সময় কাটাত আর সর্ব্বদাই কেমন অন্যমনস্ক থাকত।

জ্যোৎস্নারাত্রে বিহারের নির্জ্জন পাষাণ অলিন্দে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে আপন মনে প্রায়ই কি ভাবত; মাঠের জ্যোৎস্নাজাল কাটিয়ে অনেক রাতে কাউকে বিহারের দিকে আসতে দেখলে সে একদৃষ্টে সেদিকে চেয়ে থাকত, যেন কতদিন আগে তার যে প্রিয় আবার আসবে বলে চ'লে গিয়েছিল, তারই আসবার দিন গুণে গুণে এ শ্রান্ত শান্ত ধীর পথ-চাওয়া···প্রতি সকালে সে কার প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে রইত, সকাল কেটে গেলে ভাবত বিকালে আসবে, বিকাল কেটে গেলে ভাবত সন্ধ্যায় আসবে—দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এরকম কত সকাল-সন্ধ্যা কেটে গেল—কেউ এল না···তবু মেয়েটি ভাবত, আসবে···আসবে, কাল আসবে···পাতার শব্দে চমকে উঠে চেয়ে দেখত—এতদিনে বুঝি এল!

এক এক রাত্রে সে বড় অদ্ভুত স্বপ্ন দেখত। কোথাকার যেন কোন্ এক পাহাড়ের ঘন বেতের জঙ্গল আর বাঁশের বনের মধ্যে লুকোনো এক অর্দ্ধভগ্ন পাষাণমূর্ত্তি। নিঝুম রাতে সে-পাহাড়ের বেতগাছ হাওয়ায় দুলছে, বাঁশবনে শির্‌শির্ শব্দ হচ্ছে, দীর্ঘ দীর্ঘ বেতডাঁটার ছায়ায় পাষাণমূর্ত্তিটার মুখ ঢাকা পড়ে গেছে। সে অন্ধকার অর্দ্ধরাত্রে জনহীন পাহাড়টার বাঁশগুলোর মধ্যে ঝোড়ো হাওয়া ঢুকে কেবলই বাজছে মেঘ-মল্লার!···

ভোরে উঠে রাতের স্বপ্ন ভেবে আশ্চর্য্য হয়ে যেত—কোথায় পাহাড়, কোথায় বেতবন, কার ভাঙা মূর্ত্তি, কিসের এসব অর্থহীন দুঃস্বপ্ন!···

নাস্তিক

অধ্যয়ন শেষ ক'রে লোকনাথ যখন তাঁর আচার্য্যের কাছে বিদায় চাইলেন, আচার্য্য তাঁকে বলেছিলেন—একটা কথা সব সময় মনে রেখো তুমি, অনেক লোকের ওপরে "লোকনাথ" নামটি সার্থক ক'রে জীবনের পথে অগ্রসর হবে।

অলোকসামান্য প্রতিভাবান এবং প্রিয়তম ছাত্রকে বিদায় দিয়ে, আচার্য্য দু'তিন দিন পর্য্যন্ত মৌনী ছিলেন।

মঠ থেকে বার হয়ে লোকনাথ কোন বড় রাজসভায় গেলেন না। অধ্যাপনা করবার কোন আগ্রহ দেখালেন না, বিবাহ ক'রে সংসারী হবার বিষয়েও সম্পূর্ণ উদাসীন রয়ে গেলেন। কিছুদিন লক্ষ্যহীন অবস্থায় এদিক ওদিক ঘুরবার পর শেষে পুণ্যভদ্রার নির্জ্জন তীরভূমিতে কুটীর বেঁধে সেখানেই বাস ক'রতে সুরু করলেন। এতে বেশির ভাগ লোকই তাঁকে বললে পাগল।

বাল্যকাল থেকেই লোকনাথ একটু অন্য প্রকৃতির। যে দিন প্রভাতের আলো খুব ফুটত, বালক লোকনাথ তার গ্রামের ধারের মাঠে একা একা বেড়িয়ে বেড়াত, সমবয়সী অন্য কোন ছেলের সঙ্গে সে মিশত না। সন্ধ্যার ধূসর আকাশের তলে গ্রামের অদূরে ছোট পাহাড়টা যখন বড় আকাশের গা থেকে খসে-পড়া বড় একখণ্ড মেঘস্তূপের মত দেখাত, লোকনাথ দণ্ডের পর দণ্ড ধ'রে মাঠের ধারের বনের কাছে বসে বসে এক মনে কি ভাবত, তার অপলক শিশু-নয়ন দু'টি দণ্ডের পর দণ্ড ধ'রে ও পাহাড়ের দিকে আবদ্ধ থাকত। তার বিশ্বাস ছিল, ওই পাহাড়টাই পৃথিবীর প্রান্তসীমার পাহাড়। 'আচ্ছা, যদি ও ছাড়িয়ে চ'লে যাই, দূরে দূরে,—ক্রমেই দূরে,—আরও দূরে,—খুব খুব দূরে,—খুব খুব খুব খুব দূরে—তা হলে কোথায় গিয়ে পৌছব ?' দৃশ্যমান সীমাচিহ্ন ছাড়িয়ে অজ্ঞাত রাজ্যে এতদূর যাবার কল্পনায় বালকের মন বিস্মিত অভিভূত হয়ে পড়ত, নিজের ঘর, নিজের ভাই-বোনের কথা সে ভুলে যেত, শুধু অস্পষ্ট সন্ধ্যার আলোকে পরিবর্ত্তনশীল মেঘ-রাজ্যের পেছনে, অনেক অনেক পেছনে সে কোন্ দেশ, যেখানে এই এমনি ধূসর, মৌন চারিদিক্, সে দেশের কথা মনে

হ'তেই তার মন অবশ হয়ে আসত। তার দিদিমা যে রামায়ণ মহাভারতের গল্প করেন, সে সব ঘটনা সেই দেশেই ঘটে, রাম-রাবণের যুদ্ধ সেখানে এখনও চলছে, সে দেশের সীমাহীন গহন বনের মধ্যে গলাকাটা কবন্ধ রাক্ষস এখনও অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছে, যত অসম্ভব আর আজগুবি জিনিসের দেশ যেন সেটা।

কিন্তু সে সব অনেক দিনকার কথা। বড় হয়ে উঠে লোকনাথ অত্যন্ত রুক্ষদর্শন ও কঠোর প্রকৃতির লোক হয়ে উঠলেন। তাঁর নীরস শুষ্ক পাণ্ডিত্যের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলবার জন্যেই যেন তাঁর আকৃতি দিন দিন লালিত্যহীন হয়ে উঠতে লাগল। যখন তাঁর প্রকাণ্ড মাথাটার অসংযত দীর্ঘ চুলের গোছা আর দীর্ঘ রুক্ষ দাড়ি বাতাসে উড়ত তখন সত্যই তাঁকে অত্যন্ত ভয়ানক ব'লে মনে হত। তীক্ষ্ণ ইস্পাতের মতন এক অস্বাচ্ছন্দ্যকর দীপ্ত নীল আভা তাঁর চোখে খেলতে দেখা যেত, কিন্তু এক এক সময় আবার সে দীপ্তি শান্ত হয়ে আসত, তাঁকে খুব সৌম্য, খুব সুদর্শন, খুব উদার ব'লে মনে হত।

বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে লোকনাথের বাল্যের সে সুদূর-পিয়াসী মন ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করতে লাগল। ত্রিশ বৎসর বয়স পূর্ণ হবার পূর্ব্বেই দৃশ্যমান জগৎটা একটা প্রশ্নের রূপ নিয়ে তাঁর চোখের সামনে উপস্থিত হ'ল। জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা কেউ আছে কি না এই আজগুবি প্রশ্ন নিয়ে লোকনাথ মহা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও ব্যতিব্যস্ত অবস্থায় কালাতিপাত করতে লাগলেন। তাঁর জীবনের লক্ষ্যও ছিল আজগুবি ধরণের। সাংসারিক সুখ সুবিধা লাভের প্রচেষ্টাকে তিনি পূর্ব্ব হ'তেই অবজ্ঞার চোখে দেখতেন, যশোলাভ বিষয়েও তিনি হয়ে উঠলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। একবার মঠের আচার্য্যের কাছে মগধ থেকে পত্র এল—মঠের অতীশদের মধ্যে আচার্য্য যাঁকে উপযুক্ত মনে করবেন, তাঁকে হস্তীর পৃষ্ঠে ক'রে সসম্মানে রাজধানীতে নিয়ে আসা হবে। রাজসভার সুরিপদতিলক মহাচার্য্য জীবনসুরির সম্প্রতি দেহান্তর ঘটেছে। আচার্য্য একমাত্র লোকনাথকেই এ পদের উপযুক্ত ব'লে ভেবেছিলেন, কিন্তু লোকনাথ কিছুতেই মগধে যেতে রাজি না হওয়ায় তাঁর এক সতীর্থ মগধে প্রেরিত

হলেন। এর কিছুকাল পরেই লোকনাথ মঠ পরিত্যাগ করলেন এবং এক বৎসরের মধ্যেই পুণ্যভদ্রার নির্জ্জন তীরভূমি আশ্রয় করলেন।

সেই থেকে আজ ত্রিশ বৎসর তিনি এই নির্জ্জন মাঠের মধ্যে এ কুটীরখানিতে একা বাস করছেন। জৈন ধর্ম্মমণ্ডলীর পক্ষ থেকে প্রতি বৎসর নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ তণ্ডুল ও দু'খানা বহির্ব্বাস তাঁকে দেওয়া হ'ত। মাঠের ধারের বুনো কাপাসের তুলা থেকে তিনি অন্য পরিধেয় নিজের হাতে প্রস্তুত ক'রে নিতেন। প্রথম প্রথম দু'একজন ছাত্রকে নিয়ে তিনি অধ্যাপনা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ও উন্নতচরিত্রের আকর্ষণে যখন শিক্ষার্থীর ভীড় বাড়বার উপক্রম হল, অধ্যাপনা তিনি তখন একেবারেই বন্ধ ক'রে দিলেন।

পুণ্যভদ্রার দুই তীরের নির্জ্জন মাঠ তখন স্থানে স্থানে বনে ভরা ছিল। অনেক স্থানে এই সব বনে উপর-পাহাড়ের শাল ও দেবদারু গাছের বীজের চারা, কোন কোন স্থানে নানা রকমের কাঁটাগাছ ও বনজ লতার ঝোপ। দক্ষিণের পাহাড় একটা অপরিসর উপত্যকায় দ্বিধা-বিভক্ত, পুণ্যভদ্রার একটা ক্ষীণ স্রোতঃশাখা এর মাঝখান দিয়ে পাহাড়ের ওপারে বেরিয়ে গিয়েছে, তার গৈরিক জল-ধারার উপর সব সময়ই দুই তীরের পত্রশ্যাম শিশুদেবদারু-শ্রেণীর কালো ছায়া।

এখানেই ছিল লোকনাথের কুটীর।

লোকনাথের ছোট কুটীরখানি হস্তলিখিত পুঁথির একটা ভাণ্ডার বিশেষ ছিল। কাঠের ত্রিপট্ট শক্ত ক'রে বেত দিয়ে বেঁধে লোকনাথ এক রকম পুস্তকাধার প্রস্তুত করেছিলেন এবং বৃহৎ বৃহৎ তালপত্র ও ভূর্জ্জপত্রের পুঁথিকে স্থান দেবার জন্যে তিনি ত্রিপট্টের মাঝখানে অনেকখানি ক'রে ফাঁক রেখেছিলেন। এই ত্রিপট্টটি পুঁথিতে ভরা থাকত; ষড়্‌দর্শন, উপনিষদ, বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, অশ্বলায়ন ও আপস্তম্বাদি সূত্র, পাণিনি ও অন্যান্য বৈয়াকরণদের গ্রন্থ, সংহিতা ও নানা কোষকারদের পুঁথি, প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্‌দিগের কিছু কিছু পুঁথি, ইত্যাদি। তা ছাড়া আরও নানাপ্রকার পুঁথি ঘরের মেঝেতে

এমন যদৃচ্ছাক্রমে ছড়ানো প'ড়ে থাকত যে, কুটীরের মধ্যে পা রাখবার স্থান পাওয়া দুষ্কর।

প্রতিদিন প্রাতঃকালে স্নান ক'রেই লোকনাথ কুটীরের সামনের প্রাচীন নিম গাছটার ছায়ায় গিয়ে বসতেন এবং একমনে পড়তেন।

এক একদিন অবসন্ন গ্রীষ্ম-অপরাহ্ণ ঈষত্তপ্ত বাতাসের সঙ্গে সদ্য-ফোটা-নিমফুলের পরাগ মাখিয়ে এক অপূর্ব্ব লোকের সৃষ্টি করত, সেখানে শুভ্রকেশ আর্য্যভট্ট শিষ্য শকটায়নকে নীলশূন্যে খড়ি এঁকে গ্রহ নক্ষত্রের সংস্থান-উপদেশ করতেন, বুনো পাখীর অশ্রান্ত কাকলীর মধ্যে যাস্ক ভাষাতত্ত্ব আলোচনায় ব্যস্ত থাকতেন, দুর্ব্বোধ্য জ্যামিতিক সমস্যার সামনে প'ড়ে সেখানে কুঞ্চিত-ললাট পরাশর তাঁর অন্যমনস্ক দৃষ্টি অত্যন্ত একমনে সম্মুখস্থ বল্মীকস্তূপের দিকে আবদ্ধ ক'রে রাখতেন—চমক ভেঙে উঠে লোকনাথের কাছে এটাও একটা কম সমস্যার বিষয় হয়ে উঠত না যে, কেন তিনি এতক্ষণ মনে মনে ভাষাতত্ত্ব আলোচনাকারী যাস্কের মুখকে সম্মুখস্থ নদীজলে সন্তরণকারী বন্য হংসের মুখের মত কল্পনা করছিলেন!

রাত্রে আকাশের নক্ষত্রগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে লোকনাথ ভাবতেন, এগুলো কি? প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদগণের পুঁথি এখানে তাঁকে বড় সাহায্য করত না। অবশেষে তিনি নিজে ভেবে ভেবে স্থির করলেন নক্ষত্রসমূহ এক প্রকার বৃহৎ স্ফাটিক পিণ্ড। পৃথিবীতে আলো দেওয়ার জন্যে এগুলো আকাশে আছে, চন্দ্রকে তিনি নক্ষত্রদের অপেক্ষা বৃহত্তর স্ফাটিক পিণ্ড ব'লে ভেবেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর হস্তলিখিত একখানি পুঁথিতে দেখা যায় তিনি গ্রহনক্ষত্র সংক্রান্ত তাঁর এ মতবাদ লিপিবদ্ধ ক'রে রেখে গিয়েছেন। তাদের আলোর উৎপত্তি সম্বন্ধে লোকনাথ লিখেছিলেন যে, পৃথিবীতে স্ফাটিক প্রস্তরের যে শ্রেণী দেখতে পাওয়া যায়, মহাব্যোমস্থ এই সমস্ত স্ফাটিক তার অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর শ্রেণীর হওয়ায় তাদের অভ্যন্তর থেকে এক প্রকার স্বভাবজ জ্যোতি বার হয়ে থাকে। এ সংক্রান্ত বহু প্রমাণ ও বহু জ্যামিতির রেখা ও অঙ্কন তাঁর ঐ পুঁথিখানিতে ছিল দেখা যায়, কিন্তু লোকনাথের প্রতিভা অত্যন্ত উচ্চশ্রেণীর হওয়ায় তিনি তাঁর মত সম্বন্ধে আদৌ গোঁড়া ছিলেন না,

ছলেন। এর কিছুকাল পরেই লোকনাথ মঠ পরিত্যাগ করলেন এবং এক বৎসরের মধ্যেই পুণ্যভদ্রার নির্জ্জন তীরভূমি আশ্রয় করলেন।

সেই থেকে আজ ত্রিশ বৎসর তিনি এই নির্জ্জন মাঠের মধ্যে এ কুটীর-খানিতে একা বাস করছেন। জৈন ধর্ম্মমণ্ডলীর পক্ষ থেকে প্রতি বৎসর নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ তণ্ডুল ও দু'খানা বহির্ব্বাস তাঁকে দেওয়া হ'ত। মাঠের ধারের বুনো কাপাসের তুলা থেকে তিনি অন্য পরিধেয় নিজের হাতে প্রস্তুত ক'রে নিতেন। প্রথম প্রথম দু'একজন ছাত্রকে নিয়ে তিনি অধ্যাপনা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ও উন্নতচরিত্রের আকর্ষণে যখন শিক্ষার্থীর ভীড় বাড়বার উপক্রম হল, অধ্যাপনা তিনি তখন একেবারেই বন্ধ ক'রে দিলেন।

পুণ্যভদ্রার দুই তীরের নির্জ্জন মাঠ তখন স্থানে স্থানে বনে ভরা ছিল। অনেক স্থানে এই সব বনে উপর-পাহাড়ের শাল ও দেবদারু গাছের বীজের চারা, কোন কোন স্থানে নানা রকমের কাঁটাগাছ ও বনজ লতার ঝোপ। দক্ষিণের পাহাড় একটা অপরিসর উপত্যকায় দ্বিধা-বিভক্ত, পুণ্যভদ্রার একটা ক্ষীণ স্রোতঃশাখা এর মাঝখান দিয়ে পাহাড়ের ওপারে বেরিয়ে গিয়েছে, তার গৈরিক জল-ধারার উপর সব সময়ই দুই তীরের পত্রশ্যাম শিশুদেবদারু-শ্রেণীর কালো ছায়া।

এখানেই ছিল লোকনাথের কুটীর।

লোকনাথের ছোট কুটীরখানি হস্তলিখিত পুঁথির একটা ভাণ্ডার বিশেষ ছিল। কাঠের ত্রিপট্ট শক্ত ক'রে বেত দিয়ে বেঁধে লোকনাথ এক রকম পুস্তকাধার প্রস্তুত করেছিলেন এবং বৃহৎ বৃহৎ তালপত্র ও ভূর্জ্জপত্রের পুঁথিকে স্থান দেবার জন্যে তিনি ত্রিপট্টের মাঝখানে অনেকখানি ক'রে ফাঁক রেখেছিলেন। এই ত্রিপট্টটি পুঁথিতে ভরা থাকত; ষড়্দর্শন, উপনিষদ, বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, অশ্বলায়ন ও আপস্তম্বাদি সূত্র, পাণিনি ও অন্যান্য বৈয়াকরণদের গ্রন্থ, সংহিতা ও নানা কোষকারদের পুঁথি, প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্‌দিগের কিছু কিছু পুঁথি, ইত্যাদি। তা ছাড়া আরও নানাপ্রকার পুঁথি ঘরের মেঝেতে

এমন যদৃচ্ছাক্রমে ছড়ানো প'ড়ে থাকত যে, কুটীরের মধ্যে পা রাখবার স্থান পাওয়া দুষ্কর।

প্রতিদিন প্রাতঃকালে স্নান ক'রেই লোকনাথ কুটীরের সামনের প্রাচীন নিম গাছটার ছায়ায় গিয়ে বসতেন এবং একমনে পড়তেন।

এক একদিন অবসন্ন গ্রীষ্ম-অপরাহ্ণ ঈষত্তপ্ত বাতাসের সঙ্গে সদ্য-ফোটা নিমফুলের পরাগ মাখিয়ে এক অপূর্ব্ব লোকের সৃষ্টি করত, সেখানে শুক্লকেশ আর্য্যভট্ট শিষ্য শকটায়নকে নীলশূন্যে খড়ি এঁকে গ্রহ নক্ষত্রের সংস্থান-উপদেশ করতেন, বুনো পাখীর অশ্রান্ত কাকলীর মধ্যে যাস্ক ভাষাতত্ত্ব আলোচনায় ব্যস্ত থাকতেন, দুর্ব্বোধ্য জ্যামিতিক সমস্যার সামনে প'ড়ে সেখানে কুঞ্চিত-ললাট পরাশর তাঁর অন্যমনস্ক দৃষ্টি অত্যন্ত একমনে সম্মুখস্থ বল্মীকস্তূপের দিকে আবদ্ধ ক'রে রাখতেন—চমক ভেঙে উঠে লোকনাথের কাছে এটাও একটা কম সমস্যার বিষয় হয়ে উঠত না যে, কেন তিনি এতক্ষণ মনে মনে ভাষাতত্ত্ব আলোচনাকারী যাস্কের মুখকে সম্মুখস্থ নদীজলে সন্তরণকারী বন্য হংসের মুখের মত কল্পনা করছিলেন!

রাত্রে আকাশের নক্ষত্রগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে লোকনাথ ভাবতেন, এগুলো কি? প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদগণের পুঁথি এখানে তাঁকে বড় সাহায্য করত না। অবশেষে তিনি নিজে ভেবে ভেবে স্থির করলেন নক্ষত্রসমূহ এক প্রকার বৃহৎ স্ফাটিক পিণ্ড। পৃথিবীতে আলো দেওয়ার জন্যে এগুলো আকাশে আছে, চন্দ্রকে তিনি নক্ষত্রদের অপেক্ষা বৃহত্তর স্ফাটিক পিণ্ড ব'লে ভেবেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর হস্তলিখিত একখানি পুঁথিতে দেখা যায় তিনি গ্রহনক্ষত্র সংক্রান্ত তাঁর এ মতবাদ লিপিবদ্ধ ক'রে রেখে গিয়েছেন। তাদের আলোর উৎপত্তি সম্বন্ধে লোকনাথ লিখেছিলেন যে, পৃথিবীতে স্ফাটিক প্রস্তরের যে শ্রেণী দেখতে পাওয়া যায়, মহাব্যোমস্থ এই সমস্ত স্ফাটিক তার অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর শ্রেণীর হওয়ায় তাদের অভ্যন্তর থেকে এক প্রকার স্বভাবজ জ্যোতি বার হয়ে থাকে। এ সংক্রান্ত বহু প্রমাণ ও বহু জ্যামিতির রেখা ও অঙ্কন তাঁর ঐ পুঁথিখানিতে ছিল দেখা যায়, কিন্তু লোকনাথের প্রতিভা অত্যন্ত উচ্চশ্রেণীর হওয়ায় তিনি তাঁর মত সম্বন্ধে আদৌ গোঁড়া ছিলেন না।

সকলকে তাঁর মত প'ড়ে দেখে বিচার করতে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি মাঝামাঝি কিছু হওয়াটাকে অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। তিনি চাইতেন উচ্চজ্ঞান, নয় তো একেবারে মূর্খতা। ত্রিশঙ্কুর স্বর্গবাসের উপর তাঁর একটা আন্তরিক অশ্রদ্ধা ছিল। একবার তিনি কয়েক বৎসর ধ'রে বহু পরিশ্রম ক'রে সাংখ্যের এক ভাষ্য প্রণয়ন করেছিলেন। লেখা শেষ ক'রে তাঁর মনে হল তিনি যেমনটি আশা করেছিলেন ভাষ্য তেমনটি হয়নি, অনেক খুঁত রয়ে গিয়েছে, অনেক চেষ্টা করেও লোকনাথ সে খুঁৎ কিছুতেই দূর করতে পারলেন না। একদিন সকালবেলা হস্তলিখিত পুঁথিখানা নিয়ে তিনি পুণ্যভদ্রার তীরে গিয়ে দাঁড়ালেন। জলের স্রোতে তীরলগ্ন শরবনগুলো তখন থর্ থর্ ক'রে কাঁপছে। লোকনাথ অনেক বৎসরের পরিশ্রমের ফলস্বরূপ পুঁথিখানিকে টান্ মেরে নদীর মাঝখানে ছুড়ে ফেলে দিলেন, একখণ্ড ইটের মতনই সেখানা সেই মুহূর্ত্তে ডুবে গেল, শুধু সাংখ্যের উগ্র পাণ্ডিত্যের সংঘাতে বন্যনদীর নিরক্ষর বুকটি অল্পক্ষণের জন্য ভাববিহ্বল হয়ে উঠল মাত্র।

দিন যেতে লাগল। লোকনাথ পূর্ব্বের মতন আর একস্থানে অনেকক্ষণ বসতে পারেন না। মনের শান্তি তিনি দিন দিন হারাতে লাগলেন। এক একদিন সমস্ত দিন তিনি কিছুই খেতেন না, কি জানি কেন, শুধু কেবল নদীর ধারে ধারে সারা দিনমান ধ'রে উদ্‌ভ্রান্তের মতন ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন। রাত্রে আকাশের দিকে চাইতেন না, যদি হঠাৎ উপরের দিকে চেয়ে ফেলতেন, কালো আকাশে ভাঙা ভাঙা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে যে সব নক্ষত্র জ্বল্ জ্বল্ করত, তাদের সন্ত্রস্ত দৃষ্টির সামনে তিনি অনভ্যস্তপাঠ অপরাধী বালক-ছাত্রের মতন সঙ্কুচিতভাবে দৃষ্টি নামিয়ে দু'হাতে চোখ ঢেকে ফেলতেন। রাত্রে নির্জ্জন মাঠে চারিধার থেকে অন্ধকারে রাশি রাশি প্রশ্ন জেগে উঠত। ভগবান্ উপবর্ষের বেদান্ত-সূত্রের মধ্যে এদের উত্তর মেলে না কেন?

লোকনাথ আবার অত্যন্ত একমনে দর্শনের পুঁথি পড়তে সুরু করলেন। কিন্তু তাঁর মুখ যদি সে সময় কেউ দেখত সে বেশ বুঝত যে, তৃপ্তির চেয়ে অসন্তোষই হয়েছে তাঁর বেশি। দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ করবার যে সহজ

উপায় দার্শনিকেরা নিরূপণ ক'রে গিয়েছেন, প'ড়ে শুনে দেখে লোকনাথের দুঃখ যেন তাতে বেড়েই চলেছে। রাত্রে বাঁশের আড়ার পুস্তকাধার থেকে ভূর্জ্জপত্রের পত্রগুলি বক্রচক্ষে গৌতমের দিকে চাইতেন, কপিল গর্ব্বমিশ্রিত ব্যঙ্গহাস্যে জৈমিনির দিকে কৃপাদৃষ্টিতে চেয়ে রইতেন, মুর্খগুলোর সঙ্গে এক আসনে বসতে হয়েছে ভেবে গভীর অপমানে ব্যাসদেব পুঁথির মধ্যে দিন দিন শুকিয়ে উঠতে থাকতেন। রাত-দুপুরের সময় অধ্যয়ন-ক্লান্ত অবসন্ন মস্তিষ্কে শয্যাগ্রহণ ক'রে লোকনাথের মনে হ'ত অর্দ্ধ-অন্ধকারে ঘরের মধ্যে একটা খণ্ডপ্রলয় চলেছে। দর্শনাচার্য্যগণ যেন কেউ কারুর কথা না শুনে পরস্পর মহা তর্ক তুলেছেন, তাঁদের ভাষ্যকার ও উপভাষ্যকারগণের বাক্‌যুদ্ধ হাতাহাতিতে পরিণত হবার উপক্রম হয়ে উঠেছে, কথার উপর কথা চড়িয়ে দু'দিক থেকেই কথার পাহাড় গ'ড়ে তোলবার চেষ্টা হচ্ছে। লোকনাথের আর ঘুম হ'ত না, পুরাতন ভূর্জ্জপত্রের গন্ধে ভারাক্রান্ত বদ্ধ বাতাসে তাঁর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসত, শয্যা ছেড়ে উঠে তিনি বাইরের নিমগাছটার তলায় এসে দাঁড়াতেন, হয়তো কোন দিন ভাঙা চাঁদের নীচে বিশাল মাঠ আলো-আঁধারে অস্পষ্ট দেখাত, কোনো দিন কষ্টিপাথরের মতন কালো অন্ধকারে পথের তলায় ঘাসের মধ্যে থেকে কত কি কীটপতঙ্গ বিচিত্র সুরে ডাকতে থাকত, বনঝোপের মাথায় জোনাকি পোকার ঝাঁক জ্বলত···নদীর ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাসে একটু শান্তিলাভ করবার সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই সব নীরব নৈশ প্রশ্ন প্রেতের মতন তাঁকে পেয়ে বসত। এবার সেটা আসত অন্ধকারের রূপ ধ'রে। আলোর যদি সৃষ্টিকর্ত্তা থাকে, তবে অন্ধকারের আর একটা সৃষ্টিকর্ত্তার কি প্রয়োজন আছে? আলোর অভাবই যদি অন্ধকার হয়, অন্ধকার কি তবে স্বপ্রকাশ? স্বয়ম্ভূ?···সৃষ্টির পূর্ব্বের জিনিস?

লোকনাথ আবার ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে ঢুকতেন, আবার তত্ত্বসমাসের পুঁথিখানা উঠিয়ে নিয়ে প্রদীপের শিখা আঙুল দিয়ে উজ্জ্বল করে তুলতেন।

সে দিন তিনি পড়ছিলেন না, সারাদিন কেবল চুপ ক'রে আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে কি ভাবছিলেন। যে রহস্য ভেদ করবার জন্য তাঁর মন সর্ব্বদাই

আকুল, সে রহস্য ভেদ করবার আশা ক্রমেই যেন দূরে চ'লে যাচ্ছে, সবদিকেই অন্ধকার, কোন দিক থেকে কোন আলোক আসবার চিহ্ন দেখা যায় না।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁর মনে হ'ত কোন কোন আত্মস্থ ঋষি কোন্ প্রাচীন যুগে তাঁদের জীবনের কোন এক শুভ মুহূর্ত্তে এ জীবনরহস্যের সন্ধান বোধ হয় পেয়েছিলেন। ভবিষ্যৎ বংশধরগণের জন্য তাই তাঁরা আশ্বাসবাণী লিপিবদ্ধ ক'রে রেখে গিয়েছিলেন…'পেয়েছি…পেয়েছি…'। তাঁর মনে হ'ল প্রথম যেদিন তিনি উপনিষদের এক জীর্ণ পুঁথির পাতায় এ কথার সন্ধান পেয়েছিলেন, তখন তাঁর বয়স এখনকার চেয়ে কুড়ি বৎসর কম। সে এক বর্ষার রাত্রিকাল, স্তব্ধ নিশীথ রাত্রে, নির্জ্জন মাঠ বেয়ে সেদিন অশান্ত বাধা-বন্ধনহীন বাতাস হু হু ক'রে ঝড়ের বেগে বয়ে যাচ্ছিল, স্তিমিতপ্রদীপ কুটীরে একা বসে পুঁথির মধ্যে তার সন্ধান পেয়ে ক্ষণিকের জন্য লোকনাথের সমস্ত শরীর সর্পপৃষ্ঠের মতন শিউরে উঠেছিল…পুঁথি বন্ধ ক'রে ঘরের বাইরে চেয়ে তাঁর মনে হয়েছিল গাছপালা, দূর্ব্বা, নদীজল, সব যেন তাঁরই মতন শিউরে শিউরে উঠেছে। এখন তাঁর সে কথা মনে প'ড়ে হাসি পেল। অল্প বয়সের সেই কাঁচা, ভাবপ্রবণ মনের দিকে নীচু চোখে চেয়ে দেখে তাঁর বর্ত্তমান সময়ের প্রবীণ মন সকৌতুকস্নেহে রঞ্জিত হয়ে উঠল। মানুষের মন নির্দ্দিষ্ট গণ্ডী অতিক্রম ক'রে অগ্রসর হ'তে পারে না—যে বলে,—জেনেছি, সে ভণ্ড, নয় সে আত্মপ্রতারক, মূর্খ! কি বুঝতে হবে, সে সম্বন্ধে তাঁর কিছু ধারণাই নেই।

হঠাৎ তাঁর অন্যমনস্ক দৃষ্টি দূরের নীল-শৈলসানুলগ্ন প্রথম বসন্তের নবপুষ্পিত রক্ত পলাশের বনে আবদ্ধ হয়ে পড়ল।

অনেকদিন আগের কথা। তখন লোকনাথের বয়স একুশ বৎসর।

—কিছু না, মায়া লক্ষীটি, আমি, এই ধরো সাত বছরের মধ্যেই আসব… পড়া শেষ হ'তে কি আর এর বেশি নেবে? বড়জোর সাতবচ্ছরই হোক। তোমায় ফেলে এর বেশি কি আর থাকতে পারব? বুঝলে?

সতের বৎসরের মায়া সলজ্জ হেসে বলে—সাতবচ্ছর…এত কম সময়? এ আর এমন বেশি কি!

লোকনাথ গাঢ়স্বরে উত্তর দেয়, সেই কথাই তো বলছি মায়া, সাতবছর কি আর বেশি আমাদের পক্ষে? তারপর মায়ার মুখে নির্ভরতার দৃষ্টিতে চেয়ে জিজ্ঞাসা ক'রে—নয় কি, মায়া?

মায়া মুখে হাসি টিপে উত্তর দেয়—নাঃ, তা আর বেশি কৈ! মোটে সাত বছর—এবেলা ওবেলা—ব'লেই প্রগল্‌ভ উচ্চহাস্যে হেসে ওঠে।

লোকনাথ অপ্রতিভ মুখে বলেছিল—না, শোনো মায়া—আমি বলছি—না—আমার বল্‌বার কথা···

যে মায়ার অভয়-ভরা স্নিগ্ধ-দৃষ্টি সেদিন তাঁকে প্রবাসের পথে সখীর মতন আগু বাড়িয়ে দিয়ে চোখের জলে নিজেকে নিজে হারিয়ে ফেলেছিল, আজ লোকনাথের প্রবীণ হৃদয়ে কোথায় সে মায়ার স্থান তা আমরা জানিনে, তবে এটুকু বোধ হয় ঠিক যে সে সময়ের মনোভাব এখন আর লোকনাথের ছিল না। জীবনের তুচ্ছ জিনিসে তাঁর কোন আসক্তি ছিল না।

মঠে থাকতেই লোকনাথের মন অন্যরকম হয়ে উঠেছিল, তিনি মায়ার কথা ভুললেন, জীবনের সুখকে মনে মনে ঘৃণা করতে শিখলেন। তাঁর জীবনে শুধু অনুসন্ধিৎসু ঋষিদার্শনিকদের যাতায়াত সুরু হল;—সে এক অন্য জগৎ, মনের সমস্ত আকাশটা জুড়ে সেখানে শুধু এক বিরাট রহস্যময় দার্শনিক প্রশ্ন ···কে তুচ্ছ মায়া? মূর্খেই শুধু এত সামান্য জিনিসে এত বেশি আনন্দ পায় হৃদয়ের চিরন্তন প্রশ্নপুঞ্জ তাদের মনে কস্মিন্ কালে জাগে না ব'লেই।

তবু কখনো কখনো, কোনো অসাবধান মুহূর্ত্তে যজ্ঞভঙ্গকারী নিশাচরের মতন অতর্কিত ভাবে হঠাৎ এসে পড়ে। তাঁর বিশ বৎসরের যৌবন মায়ার মুখের লজ্জানম্র হাসিতে, তার প্রসন্ন ললাটের মহিমায় স্নিগ্ধ হয়েছিল, যৌবনলক্ষ্মীর বরণ-ডালির সেই প্রথম মাঙ্গলিক।

অনেক বৎসর পরে মঠে থাকতে লোকনাথ শুনেছিলেন, মায়া বিবাহ করেনি কোন্ মঠে প্রব্রজ্যা গ্রহণ ক'রে ভিক্ষুণী হয়েছে। সেও অনেক দিনের কথা, তার পর তার আর কোনো সংবাদ তিনি রাখেন না, যেখানে যায় যাক, তিনি গ্রাহ্য করেন না।

সন্ধ্যার ছায়া মাঠের চারিধারে ঘন হয়ে এল। কুটীরে যেতে যেতে

লোকনাথ আকাশের দিকে চাইলেন, মনে মনে বললেন—হে অদৃশ্য শক্তি, আমি দার্শনিকাচার্য্য লোকনাথ—অজ্ঞান, মূর্খ সাধারণ মানুষের মতন আমার যুক্তিপ্রণালী বা মানসিক ধারা নয়। আমি জানতে চাই, এই কার্য্যস্বরূপ দৃশ্যমান জগৎ কোন্ কারণ-প্রসূত। সাধারণ লোকে যাকে ঈশ্বর বলে, তার মূলে কিছু আছে কি না। গ্রন্থের কথা আমি জানিনে, কারণ তার প্রমাণের ওপর আমার কোন আস্থা নেই। আমি তোমার কাছে প্রমাণ চাই, জানিনে তোমার শোনবার ক্ষমতা আছে কি না, থাকে তো জানিও।··· ভোলাবার চেষ্টা কোরো না,—তাতে আমি ভুলব না।

মহামণ্ডলীর মঠে প্রধান দার্শনিক বৈভাষিক পন্থী মাধবাচার্য্য বাস করতেন। লোকনাথ তাঁর কাছে গিয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। মাধবাচার্য্য বোঝাতে গিয়ে প্রথমত মুক্তি কি, মুক্তি কয়প্রকার, মুক্তির ও নির্ব্বাণের মধ্যে প্রভেদ কিছু আছে কি না, প্রভৃতি এত বিস্তৃতভাবে বলতে লাগলেন ও এত শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত ক'রে তাঁর মতের পরিপোষণের চেষ্টা পেতে লাগলেন যে, লোকনাথ অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপ্রিয় হ'লেও তাঁর মনে হ'তে লাগল, মুক্তির একটি স্বরূপ তিনি বুঝেছেন, সেটি সম্প্রতি মাধবাচার্য্যের বাক্যজালের হাত এড়ানো।

স্নান করতে করতে একদিন তাঁর মনে হল, তাঁর পিঠে যেন কিসের লেজ ঠেকছে। তিনি তাড়াতাড়ি পিছনে ফিরে জলের মধ্যে হাত দিয়ে দেখলেন, লেজ নয়, একটা জলজ গাছের পাতা গায়ে ঠেকছে। গাছটাকে তিনি টান দিয়ে উপরে তুলে ফেললেন, দেখলেন একটা শেওলা-গাছ,—এ শেওলা নদীতে তিনি পূর্ব্বে দেখেছেন, তেমন লক্ষ্য করেননি ভাল ক'রে, চোখ পড়তে দেখলেন যে, শেওলার ডাঁটার যে অংশটা তাঁর গায়ে সুড়সুড় ক'রে ঠেকছিল, সেটা জলের নীচেকার অংশ, সে অংশের পাতাগুলি ঝাউপাতার মতন—কিন্তু জলের উপরের অংশের পাতাগুলি পানের মতন। জলের উপরের অংশের পাতা জলের উপরে ভাসে, নীচের অংশের পাতা ও রকম হ'লে স্রোতের তোড়ে ভেঙে যেত, কিন্তু চুলের গোছার মতন হওয়ায় তারা জলকে বাধা দেয় না, জল তাদের মধ্য দিয়ে বেশ কেটে চ'লে যায়, যখন

যে দিকে স্রোতের গতি পাতাগুলি তখন সে দিকে হেলে পড়ে। লোকনাথ অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে স্নান ক'রে ফিরলেন। একটা কি জিনিস যেন তিনি ধরেছেন।

তাঁর মনে হ'ল একই ডাঁটার উপরে নীচে দু'রকম পাতা হওয়ার মূলে প্রকৃতির মধ্যে একটা চৈতন্যসত্তা বেশ যেন ধরা পড়ছে—নইলে এই নগণ্য জলজ শেওলার পত্রবিন্যাসের মধ্যে এ নিপুণতা কোথা থেকে এল? পাছে ভেঙে যায়, এজন্যে কে এর জলের নীচের অংশের পাতা ঝাউপাতার মতন ক'রে গড়লে?

লোকনাথের আর একটা কথা মনে হ'ল। কয়েকদিন পূর্ব্বে তিনি অত্যন্ত অধীরভাবে জাগতিক শক্তির কাছে তার চৈতন্যসত্তার অস্তিত্ব-সম্বন্ধে একটা প্রমাণ চেয়েছিলেন, তাঁর সেই প্রার্থনা কি এইভাবে কেউ পূর্ণ করলে?

ন্যায়যুক্তির দিক্ থেকে এ সিদ্ধান্ত এত বিপজ্জনক তাঁর মনে হ'ল যে, তিনি এ কথা জোর ক'রে মন থেকে দূর ক রে দিলেন। সাধারণ মানুষের মতন এত শীঘ্র তিনি কোনো সিদ্ধান্তেই পৌঁছতে পারেন না। তবু তিনি ভেতরে ভেতরে দিন দিন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে উঠতে লাগলেন। সেই জলজ শেওলার শুক্‌নো ডাঁটা-পাতা কুটীরের সামনে প্রায়ই প'ড়ে থাকতে দেখা যেত। পুঁথিপত্র তিনি আজকাল কমই খোলেন। নদীর ধারে ধারে যেখানে বন্যগাছের শ্যামপত্র-সম্ভার স্রোতের জলে ঝুপ্‌সি হয়ে প'ড়ে থাকত, দীর্ঘ দীর্ঘ ঘাসের ফুল স্তূপে স্তূপে ফুটে জলের ধার আলো ক'রে থাকত, পত্রনিবিড় ঝোপগুলির তলায় জলচর পক্ষীরা ডিমগুলি গোপনে শুকনো পাতা চাপা দিয়ে রাখত, লোকনাথ বেশির ভাগ সময় সেই সব স্থানে কি দেখে দেখে ফিরতে আরম্ভ করলেন। তাঁর কুটীরের সামনে মাঠে এক রকম ছোট ঘাসের কুচো কুচো সাদা ফুল রাশি রাশি ফুটত, লোকনাথকে দেখা যেত সেই ফুল তুলে তিনি অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে তাদের গঠন লক্ষ্য করছেন—ঘাসের ফুল সম্বন্ধে লোকনাথের মনে হ'ত যে সব ফুলগুলি একই গঠনের—পাঁচটি ক'রে পাপ্‌ড়ি মধ্যে একটা বিন্দু। প্রকাণ্ড মাঠে এ রকম ফুল দু'হাজার, দশহাজার, দু'লক্ষ, দশলক্ষ ফুটে থাকত, লোকনাথ যদৃচ্ছাক্রমে এখান থেকে ওখান থেকে ফুল

ফুলে দেখতেন, সবগুলির সেই একই গড়ন, সেই পাঁচটা ক'রে পাপড়ি মধ্যে একটা বিন্দু।

লোকনাথের পিপাসা বিকারের রোগীর মত বেড়ে উঠল। কত কি প্রশ্ন তাঁর মনে আসে,—অসাধারণ ভয়ানক বিভীষণ সব প্রশ্নদৈত্য! লোকনাথ বলতেন—জানাও হে চৈতন্যময় কারণ শক্তি, আমায় আরও জানাও। দিন কতক পরে সত্যই তাঁর অসহ্য যাতনা হ'তে লাগল। একটা বিশাল ঘনান্ধকার গুপ্ত রহস্য জগৎ দ্বারপার্শ্বের সঙ্কীর্ণ ছিদ্রপথ দিয়ে ক্ষীণ একটুখানি আলোকরেখা যেন তাঁর চোখে ফেলেছিল, তাঁর বুভুক্ষু মন সমস্তটা একসঙ্গে দেখবার জন্যে ছট্‌ফট্ করতে লাগল;—রাত্রে তাঁর নিদ্রা হ'ত না—কালো আকাশে চোখ তুলে বলতেন—চোখ খুলে দাও, হে মহাশক্তি চোখ খুলে দাও!

ইতিমধ্যে আবার একদিন তিনি দেখলেন—একটা কি পতঙ্গ আর একটা ছোট পতঙ্গকে শরীর-নিঃসৃত রসে অল্পে অল্পে অচেতন ক'রে ফেলছে, বড় পতঙ্গটা হাতে তুলে নিয়ে লক্ষ্য ক'রে দেখে তাঁর মনে হ'ল সেটার শুঁড়ের মতো ছুঁচলো একটা প্রত্যঙ্গের খানিকটা অংশ ফাঁপা,—একপ্রকার বিষাক্ত রস শরীরের মধ্যে থেকে বার হ'য়ে ঐ ফাঁপা অংশ দিয়ে বেরিয়ে আসবার বেশ সুন্দর, সুনির্দ্দিষ্ট বন্দোবস্ত আছে।...

লোকনাথের মন একমুহূর্ত্তে আবার অন্ধকার হয়ে গেল। নিষ্ঠুর ধ্বংসের এ কি কৌশলময় আয়োজন! মূর্খ ভক্তিশাস্ত্রকার, এই বুঝি তোমার দয়ালু ঈশ্বর?

বসন্তের বাকী দিনগুলো এবং সারা গ্রীষ্মকালটা এই ভাবেই কেটে গেল। অবশেষে একদিন কৌতূহলপ্রদ এক ঘটনায় লোকনাথের দুঃখ, ব্যাকুলতা ও সন্দেহের এক অপ্রত্যাশিত রকমের উপসংহার ঘটল। সে সময়টা আষাঢ় মাসের প্রথম সপ্তাহ। বহুদিন বৃষ্টি হয়নি, অসহ্য রৌদ্রতাপে মাঠের ঘাসগুলো জ'রে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে, বাতাস আগুনের ঝলকের মতো তপ্ত। বৈকালের দিকে কিন্তু খুব জোরে বাতাস বইতে লাগল, এবং একটু পরে ঈশান কোণে খুব মেঘ জমল। নদীর বড় বাঁকটায় বড়

বড় ঘাসের মধ্যে শুয়ে লোকনাথ পূর্ব্ব দিক্‌চক্রবালে নবীন বর্ষার মেঘস্তূপের সজ্জা একমনে লক্ষ্য করছিলেন, হঠাৎ তাঁর ডান হাতে মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলির মাঝখানে কিসে যেন কামড়ালে। সে দিকে চোখ ফিরিয়ে হাত টেনে নিতেই দেখতে পেলেন একটা শঙ্খচূড় সাপ ফণা তুলে হাতের সেখানে মুহূর্ত্তে আর একটা ছোবল মারবার উপক্রম করতে গিয়ে হঠাৎ মাথা নিচু ক'রে লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে বিদ্যুদ্‌বেগে অদৃশ্য হল। কি করছি, না ভেবেই লোকনাথ সাপটার অদৃশ্যমান পুচ্ছটা তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে চেপে ধরতে গিয়ে একগোছা ঘাস মুঠার মধ্যে চেপে ধরলেন, সাপটা ততক্ষণে অদৃশ্য হয়েছে।

লোকনাথ তাড়াতাড়ি পরিধেয় বসন ছিঁড়ে হাতের কব্জিতে ও বাহুতে বাম হাতে পাকিয়ে পাকিয়ে দু'টো বাঁধন দিলেন, বাঁধন তেমন শক্ত হ'ল না, অনেকটা আল্‌গা রয়ে গেল। তাঁর মনে হল শ্বেত আকন্দের মূল সর্পাঘাতের মহৌষধ···মাঠের ইতস্তত শ্বেত আকন্দের সন্ধানে গেলেন, সে গাছ চোখে প'ড়ল না···হাতটা যেন অবশ হয়ে আসছে ব'লে তাঁর মনে হ'ল। বিষ তবে নিশ্চয়ই উপরে উঠছে···লোকনাথ সম্ভব অসম্ভব সমস্ত স্থান খুঁজতে লাগলেন, আরও দু'একটা সর্পাঘাতের ঔষধ মনে আনবার চেষ্টা করলেন,—কুসুম ফুলের বীজ, রক্তচন্দনের ছাল, ইত্যাদি কোনটাই হাতের কাছে নেই। এদিক্ ওদিক্ খানিকক্ষণ খুঁজতে খুঁজতে লোকনাথের মনে হ'ল তিনি আর দাঁড়াতে পারছেন না, চোখে অন্ধকার দেখে একটা ঝোপের কোণে তিনি ব'সে পড়লেন—অসহ্য-দংশনবিষে তাঁর সর্ব্বাঙ্গ তখন ঝিম্ ঝিম্ করছে।···

ধীরে ধীরে তাঁর মনের নিভৃততম অংশ কিসের আলোকে যেন আলোকিত হ'য়ে উঠতে লাগল···আসন্ন মরণের বজ্রকঠোর নির্ম্মম করাল রৌদ্র স্বর, দূরশ্রুত মুক্তস্রোত গিরি-নির্ঝরের তালে যেন তাঁর কানে মুক্তির গান বাজাচ্ছে···তোমার পাষাণকারা এবার ভাঙ্‌ব—তোমার চোখের বাঁধন খুলব···

হে অনন্ত দেব, মহাব্যোমের অনন্ত শূন্যতার পারে কোন্ সুদূরতম,

অপ্রকাশ্য রাজ্যের জ্যোতিঃসিংহাসন থেকে তুমি তোমার এই ব্যাকুল দীনতম প্রজার উপর লক্ষ্য রেখেছ? তাই বুঝি সেদিন জলের মধ্যে আমায় পথ দেখিয়েছিলে?···সেদিন তোমায়ও চিনিনি, তোমার পথও চিনিনি—আজ বোধ হয় বুঝেছি—হৃদয়ের অন্তরে সেই তুমি আমার আত্মা, পৃথিবীর অপেক্ষা মহান্, অন্তরীক্ষের অপেক্ষা মহান্, স্বর্গের অপেক্ষা মহান্, সর্ব্বভূতের অপেক্ষা মহান্···মেঘ যেমন ওষধিগণের উপজীব্য, তুমি তেমনি আমার প্রাণধারার উপজীব্য···তুমি আমার প্রাণের কথা শুনতে পাও? বেশ, তা হ'লে আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে চ'লো, দেব, এই অন্ধ রাজ্যের পারে, ওই দিগন্তসীমার পারে, জীবন-মহাসমুদ্রের পারে।·· কোথায় তোমার চিরবিকশিত জ্যোতিঃ-প্রভাত, কোথায় দৈন্য-মুক্ত জ্ঞান-সম্পদের অপরাজিত আয়তন দেখব···

হঠাৎ লোকনাথের মরণাভিভূত দার্শনিক বুদ্ধি মাথা তুলে ব'লে উঠল, তোমার বিচার-শক্তি চ'লে যাচ্ছে,—বিষের যাতনায় যখন তোমার সমস্ত ইন্দ্রিয় অবশ হয়ে আসছে, তখন তোমার যে বিচার, সে কি বিচার? মনের এই তরল ভাব দুর্ব্বলতার পরিচায়ক, মন থেকে দূর ক'রে দাও···

লোকনাথ কিছুই ঠিক করলেন না, তাঁর মন আর যুদ্ধ করতে পেরে উঠছিল না···আফিমের নেশার মতো মরণের তন্দ্রা তাঁর ক্রমেই গাঢ় হ'য়ে এল···

কোথায় কোন্ দুটি বালক-বালিকা এক ক্ষুদ্র গ্রামের গ্রামসীমায় বুনো খেজুরের ঝোপে ঝোপে তলায়-পড়া খেজুর কুড়িয়ে খেয়ে বেড়াচ্ছে···সময়ের দীর্ঘ পাষাণ-অলিন্দের দূরতম সীমায় তাদের ছোট্ট ছোট্ট পাগুলির অস্পষ্ট শব্দ ক্রমেই অস্পষ্টতর হয়ে আসছে···ওধারে তারা দুটিতে ক্রমেই মিলিয়ে যাচ্ছে···

এক গ্রাম্য বনের মৌ-গাছের ডাল থেকে দু'জনে মৌ ফুল পেড়ে খাচ্ছে, বালিকাটি ভালো রসাল ফুল পেলেই বালকের হাতে তুলে দিচ্ছে—এই যে এটি, কি মিষ্টি দেখ, বরং দেখ তুমি খেয়ে···

নীলব্যোম-পথে দীর্ঘদেহ, শ্বেতশ্মশ্রু, সমিধ্‌বাহী, জ্যোতির্ম্ময় ঋষিরা চলেছেন—তাঁদের মধ্যে কে যেন পিছন ফিরে সঙ্গীদের নিকট প্রস্তাব করছেন—ওহে সঙ্গীগণ, আমাদের কমণ্ডলু যা দিয়ে পূর্ণ করেছি, এস তা ফেলে দিয়ে পুনর্ব্বার নূতন জল সংগ্রহ করি…এতদিন ভ্রমণের পর মিষ্ট জলের উৎসের সন্ধান পেয়েছি…তাঁদের কমণ্ডলু থেকে কালী-গোলার মতো কি ঝ'রে পড়ছে

পথের বাঁকে একদিনের মেঘভরা বৈকালে মেয়েটিকে কে খুব মেরেছে, তার এলোমেলো চুলগুলি মুখের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে—কাপড় কে টেনে ছিঁড়ে দিয়েছে—সে কেঁদে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলছে—কেন তুমি মারবে?…কেন আমায় মারবে তুমি?…এ পাড়ায় আসি ব'লে?…আর কক্‌খনো আসব না…দেখে নিও, আর কক্‌খনো যদি আসি…

লোকনাথের মরণাহত দৃষ্টি বিরাট বিশ্বের উপর সেই ভাবেই মুগ্ধ, আবদ্ধ রইল, বহু বৎসর পূর্ব্বের শৈশব কালে গ্রামসীমার মাঠে তাঁর অজ্ঞান শিশু-নয়ন দু'টি যে ভাবে আবদ্ধ রইত…প্রায়ান্ধকার জগৎটা আবার একটা বিরাট প্রশ্নের রূপ পরিগ্রহ ক'রে তাঁর মুখের দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে চেয়ে রইল…প্রশ্নের কোন উত্তর তাঁর কাছে পাওয়া গেল না…

উমারাণী

বসন্ত প'ড়ে গিয়েছে না? দখিন্ হাওয়া এসে শীতকে তাড়িয়ে দিচ্ছে। আকাশ এমন নীল যে, মনে হচ্ছে উড়ন্ত চিলগুলোর ডানায় নীল রং লেগে যাবে। এই সময় তার কথা আমার বড় মনে পড়ে। তার কথাই বলব।

মেডিকেল কলেজ থেকে বার হয়ে প্রথম দিনকতক গবর্ণমেণ্টের চাকরি নেবার বৃথা চেষ্টা করবার পর যে মাসে আমি একটা চা বাগানের ডাক্তারী নিয়ে গৌহাটিতে চ'লে গেলুম, সেই মাসেই আমার ছোট বোন্ শৈল শ্বশুর বাড়ীতে কলেরা হয়ে মারা গেল। এই শৈলকে আমি বড় ভালবাসতুম, আমার অন্যান্য বোনেদের সঙ্গে ছেলেবেলায় অনেক মারামারি করেছি, কিন্তু শৈলর গায়ে আমি কোনদিন হাত তুলিনি। শৈলর বিয়ে হয়েছিল যশোর জেলার একটা পাড়াগাঁয়ে। শৈল কখনো সে গ্রামে যায়নি, তার স্বামী তাকে নিয়ে কলকাতায় বাসা ক'রে থাকত। তার স্বামী প্রথমে পাটের দালালী করত, তার পর একটা অফিসে ইদানীং কি চাকরি করত। যেখানে শৈলর স্বামী বাসা করেছিল তার পাশেই আমার মামার বাড়ী,—একটা গলির এপার ওপার। এই বাসায় ওরা শৈলর বিয়ের অনেক আগে থেকেই ছিল এবং শৈলর বিয়েও মামার বাড়ী থেকেই হয়।

সেদিন সন্ধ্যার কিছু আগে বাগানের ম্যানেজারের বাংলো থেকে একটা ঘা ড্রেস ক'রে ফিরছি, পিওন খানকতক চিঠি আমার হাতে দিয়ে গেল। আমার বাসায় ফিরে এসে তারি একখানাতে শৈলর মৃত্যুসংবাদ পেলুম। বাংলোর চারি পাশের ঝাউ কৃষ্ণচূড়া ও সরল গাছগুলো সন্ধ্যার বাতাসে সন্ সন্ করছিল। আমার চোখের সামনে সমস্ত চা-বাগানটা, দূরের ঢালু পাহাড়ের গাটা, মারঘেরিটা, ২নং বাগানের ম্যানেজারের বাংলোর সাদা রংটা, দেখতে দেখতে সবগুলো মিশে একটা জমাট অন্ধকার পাকিয়ে তুলল।

আলো জ্বালিয়ে চুপ ক'রে ঘরের মধ্যে ব'সে রইলুম। বাইরের হাওয়া

খোলা দুয়ার জানলা দিয়ে ঢুকতে লাগল। অনেকদিনের শৈল যে! কলকাতা থেকে ছুটি পেয়ে যখন বাড়ী যেতুম, শৈল বেচারী আমায় তৃপ্তি দেবার পন্থা খুঁজে ব্যাকুল হ'য়ে পড়ত। কোথায় কুল, কোথায় কাঁচা তেঁতুল, কার গাছে কৎবেল পেকেছে, আমি বাড়ী আসবার আগেই শৈল এসব ঠিক ক'রে রাখত; নানারকম মসলা তৈরী ক'রে কাগজে কাগজে মুড়ে রেখে দিত, আমি বাড়ী গেলেই তার আনন্দ জড়ানো ব্যস্ততা ও ছুটো-ছুটির আর অন্ত থাকত না। গ্রীষ্মের ছুটিতে আমি বাড়ী গেলে আমায় বেলের সরবৎ খাওয়াবার জন্যে পরের গাছে বেল চুরি করতে গিয়ে ঘরের পরের কত অপমান সে সহ্য করেছে; আমারই জুতো বুনে দেবে ব'লে তার উল বুনতে শেখা। সেই শৈল তো আজকের নয়, যতদূর দৃষ্টি যায় পিছনে ফিরে চেয়ে দেখলুম কত ঘটনার সঙ্গে, কত তুচ্ছ সুখ-দুঃখের স্মৃতির সঙ্গে শৈল জড়ানো রয়েছে। কত খেলাধুলোয় সে আজ ঐ আকাশের মাঝখানকার জ্বলজ্বলে সপ্তর্ষি মণ্ডলের মত দূরের হ'য়ে গেল, ঝাউ-গাছের ডাল পালার মধ্যেকার ঐ বাতাসের শব্দের মতই ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চ'লে গেল!

তার পরদিন ছুটি নিয়ে দেশে চ'লে গেলুম। বাড়ীর সকলকে সান্ত্বনা দিলুম। আহা, দেখলুম আমার ভগ্নীপতি বেচারা বড় আঘাত পেয়েছে। শৈলর বিয়ে হয়েছিল এই মোটে তিন বৎসর, এই সময়ের মধ্যেই সে বেচারা শৈলকে বড় ভালবেসে ফেলেছিল। তাকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলুম। শৈল প্রথম বুনতে শিখেই আমার ভগ্নীপতির জন্যে একটা গলাবন্ধ বুনছিল, সেটা আধ-তৈরী অবস্থায় প'ড়ে আছে, ভগ্নীপতি সেইটে আমার কাছে দেখাতে নিয়ে এল। সেইটে দেখে আমার মনের মধ্যে কেমন একটু হিংসে হল, আমার জুতো বুনে দেবার জন্যে উল্ বুনতে শিখে শেষে কিনা নিজের স্বামীর গলাবন্ধ আগে বুনতে যাওয়া! তবুও তো সে আজ নেই!

পরে আবার গৌহাটী ফিরে গিয়ে যথারীতি চাকরি করতে লাগলুম। দেশ থেকে এসে আমার ভগ্নীপতির সঙ্গে প্রথম প্রথম খুব পত্র লেখালেখি ছিল, তারপর তা আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গেল। তার আর বিশেষ কোন

সংবাদ রাখতুম না, তবে মাঝে মাঝে মামার বাড়ীর পত্রে জানতে পারতুম, সে অনেকের অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও পুনরায় বিবাহ করতে রাজী নয়। বিবাহ সে আর নাকি করবে না।

এই রকম ক'রে বিদেশে অনেক দিন কেটে গেল, দেশে যাবার বিশেষ কোন টান্ না থাকাতে দেশে বড় যেতুম না। আমার মা বাবা অনেকদিন মারা গিয়েছিলেন, বোনগুলির সব বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, আমি নিজেও তখন অবিবাহিত, কাজেই আমার পক্ষে দেশ বিদেশ দুই সমান ছিল। চা-বাগানের কাজের কোন বৈচিত্র্য ছিল না, সকালবেলা ডাক্তারখানায় ব'সে নীরস এক ঘেয়ে ভাবে কুলীদের হাত দেখা, কলের পুতুলের মত ঔষধ লিখে দেওয়া। রোগ তাদের যেন বড় একঘেয়ে রকমের, সাদা জ্বর, হিল্ ডায়েরিয়া, বড় জোর কালাজ্বর, কালে ভদ্রে এক-আধটা টাইফয়েড বা শক্ত রকমের নিউমোনিয়া। যখন হাতে কাজকর্ম্ম বিশেষ থাকত না তখন পড়তুম না হয় আমার একটা খেয়াল আছে—অপটিক্সের বা আলোক-তত্ত্বের চর্চ্চা করা—তাই করতুম। বাংলোর একটা ঘর এই উদ্দেশ্যে আঁধার-ঘর বা ডার্করুমে পরিণত ক'রে নিয়েছিলুম। কলকাতা থেকে প্রতি মাসে অনেক ভাল ভাল লেন্স ও অপটিক্সের বই সব আনাতুম।

বছর তিনেক এই ভাবে কেটে গেল। এই সময় মামার বাড়ীর পত্রে জানলুম, আমার ভগ্নীপতি আবার বিবাহ করেছে। সকলের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ ও পীড়াপীড়ির হাত সে নাকি আর এড়াতে পারলে না। এতে মনে মনে আমি তাকে কোন দোষ দিতে পারলুম না, শৈলর প্রতি তার ভালবাসা অকৃত্রিমই, তারই বলে সে এতদিন যুঝল তো ?

সেবার বৈশাখ মাসের প্রথমে দেশে গিয়ে মামার বাড়ী উঠলুম। আমার এমন কতকগুলো কথা অপটিক্স সম্বন্ধে মনে এসেছিল, যা একজন বিশেষজ্ঞের নিকট বলা নিতান্ত আবশ্যক ছিল। আমার এক বন্ধু সেবার বিলাত থেকে এসে প্রেসিডেন্সি কলেজে বস্তু বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিল, তার সঙ্গে সে সব বিষয়ের কথাবার্ত্তা কইবার জন্যেই আমার

এক রকম কলকাতায় আসা। তার ওখানে যাতায়াত আরম্ভ করলুম, সেও খুব উৎসাহ দিল, আমি অপটিক্স নিয়ে একেবারে মেতে উঠলুম।

এই অবস্থায় একদিন সকালবেলা বারান্দায় ব'সে পড়ছি, হঠাৎ আমার চোখ প'ড়ে গেল সামনের বাড়ীর জানলাটায়। সেইটেই আমার ভগ্নিপতির বাসা। দেখলুম কে একটি অপরিচিতা মেয়ে ঘরের মধ্যে কি কাজ করছে। আমার দিক থেকে শুধু তার সুপুষ্ট হাত দুটি দেখা যাচ্ছিল, আর মনে হচ্ছিল তার পিঠের দিকটা খুব চওড়া।

একটু পরেই সেই ঘরের ভিতর ঢুকল আমার ভগ্নীপতির বোন টুনি। টুনির বিয়ে হয়ে গিয়েছে, বোধ হয় সম্প্রতি শ্বশুরবাড়ী থেকে এসেছে। আমি গৌহাটী থেকে এসে পর্য্যন্ত ওদের বাড়ী যাই নি। টুনিকে দেখে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম—টুনি ঐ মেয়েটি কি নতুন বউ?

—হ্যাঁ, দাদা।

—দেখি একবার।

টুনি মেয়েটিকে ডেকে কি বললে, তাকে জানালার কাছে নিয়ে এসে তার ঘোমটা খুলে দিলে। ভাল দেখা গেল না। গলির এপারে আমাদের মামাদের বাড়ীটা উঠে গলির ওপারের বাড়ীর ঘরগুলোকে প্রায় অপটিক্স-চর্চ্চার ডার্ক রুম ক'রে তুলেছিল, দিনমানেও তার মধ্যে আলো যায় না। ভাল দেখতে না পেয়ে বললুম—হ্যাঁরে, কিছুই তো দেখতে পেলুম না।

টুনি হেসে উঠল, বললে—আপনি ওখান থেকে যে দেখতে পাবেন না, তা আমি জানি। তার ওপর তো আবার চশমা নিয়েছেন—তার পর কি ভেবে টুনি একটু গম্ভীর হ'ল, বললে—আপনি এসে পর্য্যন্ত তো এ বাড়ী একবারও আসেন নি, দাদা। আজ দুপুরবেলা একবার আসবেন?

দুপুরবেলায় ওদের বাড়ী গেলুম। বাড়ী ঢুকতেই মনে হ'ল, চার পাঁচ বছর আগে ভাই-ফোঁটা নিতে শৈলর নিমন্ত্রণে এ বাড়ী এসেছিলুম, তারপর আর এ বাড়ী আসিনি। দালান পার হয়ে ঘরে যেতে বাড়ীর মেয়েরা সব

আমায় ঘিরে দাঁড়ালেন। তাঁদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা শেষ হয়ে গেলে টুনি বললে—দাদা, বৌ দেখবেন আসুন। ঘরের মধ্যে গেলুম। টুনি নতুন বৌয়ের ঘোমটা খুলে দিয়ে বললে—ওঁর সামনে ঘোমটা দিতে হবে না, বৌদি। উনি তোমার দাদা।

মেয়েটি আধ-ঘোমটা অবস্থায় গলায় আঁচল দিয়ে আমার পায়ের কাছে প্রণাম করলে! দিব্যি মেয়েটি তো! রং খুব গৌরবর্ণ, ভারি সুন্দর মুখ-খানির গড়ন। একরাশ কোঁকড়া কোঁকড়া ঠাস-বুনানি কালো চুল মাথা ভর্ত্তি। বেশ মোটাসোটা গড়ন। বয়স বোধ হয় চৌদ্দ পনেরো হবে। টুনির মা বললেন—মেয়েটির বাপ পশ্চিমে চাকরি করেন, সেখানেই বরাবর থাকেন। ওই এক মেয়ে, অন্য ছেলেপিলে কিছু নেই। তাঁদের সঙ্গে কি জানাশুনো ছিল, তাই এখানেই সম্বন্ধ ঠিক ক'রে বিয়ে দিয়েছেন।

মেয়েটি প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়ালে আমি তার হাত ধ'রে তাকে কাছে নিয়ে এলুম। বাঁ হাতে তার ঘোমটা আর একটু খুলে দিয়ে বললুম—আমার কাছে লজ্জা কোরো না খুকী, আমি যে তোমার দাদা। তোমার নামটি কি?

তার চোখের অসঙ্কোচ দৃষ্টি দেখে বুঝলুম, মেয়েটি সেই মুহূর্ত্তেই আমার বোন হ'য়ে পড়েছে সে খুব মৃদুস্বরে উত্তর দিল—উমারাণী।

আমি বললুম—আচ্ছা, আমরা আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব? এসো উমারাণী, এই চৌকিটায় ব'সে তোমার সঙ্গে একটু কথা কই।

আমি চৌকিতে তাকে কাছে নিয়ে বসালুম, খানিকক্ষণ তার সঙ্গে একথা সেকথা নানা কথা কইলুম।

জিজ্ঞাসা করলুম—বাড়ী ছেড়ে এসে বড় মন কেমন করছে, না?

উমারাণী একটু হেসে চুপ ক'রে রইল।

আমি বললুম—তোমার বাবা থাকেন কোথায়?

—মাউ।

আমি মাউয়ের নাম কখনো শুনিনি। জিজ্ঞাসা করলুম—মাউ, সে কোনখানে বল দেখি।

—সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়ায়।

—তোমার বাবা সেখানে কি কাজ করেন?

—কমিসারিয়েটে চাকরী করেন।

—তোমার আর কোন ভাই বোন নেই, না?

—না। আমার পর আমার আর এক বোন হয়, সে আঁতুড়েই মারা যায়। তারপর আর হয় নি।

বাড়ী ছেড়ে অনেক দূরে এসেছে, ভাবলুম হয়ত বাপ-মায়ের কথা বলতে মেয়েটির মনে কষ্ট হচ্ছে। কথার গতি ফিরিয়ে দেবার জন্যে জিজ্ঞাসা করলুম—তুমি লেখাপড়া জান, উমারাণী?

—আমি সেখানে মেয়েদের স্কুলে পড়তাম, বাংলা পড়া হ'ত না ব'লে বাবা ছাড়িয়ে নেন। তারপর বাড়ীতে বাবার কাছে পড়তাম।

—বাংলা বই বেশ পড়তে পার?

—পারি।

আমি উমারাণীর কথাবার্ত্তা কইবার ভাবে ভারী আনন্দিত হলুম। এমন সুন্দর শান্তভাবে সে কথাগুলি বলছিল, মাটির দিকে চোখদুটি রেখে যে আমার বড় ভাল লাগল। আমি তার মাথায় একটা আদরেব ঝাঁকুনি দিয়ে বললুম—বেশ, বেশ। ভারী লক্ষ্মী মেয়ে। আচ্ছা, অন্য আর এক সময়ে আসব, এখন আসি।

দাঁড়িয়ে উঠেছি, উমারাণী আবার সেই রকম গলায় আঁচল দিয়ে আমার পায়ের কাছে প্রণাম করলে। আমি তাকে বললুম—খুব শান্ত হয়ে থেকো কিন্তু উমারাণী। কোনো দুষ্টুমি যেন কোরো না। তাহলে দাদার কাছে,—বুঝলে তো?

উমারাণী হেসে ঘাড় নীচু ক'রে রইল।

এর পাঁচ ছয় মাস পরে পুজোর সময় আবার মামার বাড়ী এলুম। অষ্টমী পুজোর দিন দিনব্যাপী পরিশ্রমের পর একটা বড় ক্লান্তি বোধ হওয়াতে সন্ধ্যার আগে একটা ঘরের ভিতর খাটে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। আমার

আমার বাড়ী পূজো হ'ত। সমস্ত দিন নিমন্ত্রিতদের অভ্যর্থনা করা, পরিবেষণ করা প্রভৃতি নানা কাজে বড় খাটতে হয়েছিল। অনেক রাত্রে উঠে খেতে গেলুম। আমার ছোট ভাই খাবার সময় বললে—অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছিলেন তো দাদা? দিদি এসেছিলেন, আরতির সময়, আপনাকে দেখবার জন্যে আপনার ঘরে গেলেন। আপনি ঘুমিয়ে আছেন দেখে আপনার পায়ে হাত দিলেন আপনাকে ওঠাবার জন্যে। আপনি উঠলেন না। তারপর তাঁরা সব চ'লে গেলেন। তিনি নাকি পরশু বাপের বাড়ী চ'লে যাবেন। আপনি অবিশ্যি একবার ওবাড়ী যাবেন কাল। আপনার সঙ্গে দেখা না হওয়ায় দিদি বড় দুঃখ ক'রে গিয়েছেন।

আমি ঘুমের ঘোরে কথাটা তলিয়ে না বুঝে বললুম—দিদি মানে?

—ও বাড়ীর।

—উমারাণী?

—হ্যাঁ। দিদি, টুনিদি, এঁরা সব আরতির সময় এসেছিলেন কি না।

উমারাণীর কথা আমার খুব মনে ছিল। তার সেই ভক্তিনম্র মধুর ব্যবহারটুকু আমার বড় ভাল লেগেছিল। তাই তাকে ভুলিনি, এবার চা-বাগানে গিয়ে মেয়েটির কথা অনেকবার ভেবেছি। তার পরদিন সকালে উঠে কাজকর্ম্মের পাশ কটিয়ে এক ফাঁকে ওদের বাড়ী গেলুম। বাইরে কাউকেও না দেখতে পেয়ে একেবারে ওদের রান্নাঘরের মধ্যে চ'লে গেলুম। টুনির মা বললেন—এস বাবা। তা এতদিন এসেছে। এ বাড়ী কি একবারও আসতে নেই?

আমি সময়োচিত কি একটা কৈফিয়ৎ দিলুম। উমারাণী মাছ কুটছিল; আমি যেতেই তাড়াতাড়ি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে চ'লে গেল। একটু পরেই হাত ধুয়ে এসে আমার পায়ের কাছে প্রণাম করলে। টুনির মা বললেন—বৌমা, সতীশকে দালানে নিয়ে গিয়ে বসাও গে। এখানে এই ধোঁয়ার মধ্যে···

দালানে যেতেই, টুনি কোথায় ছিল, এসে ব'লে উঠল—একি! দাদা যে? কি ভাগ্যি! বৌদি দাদা দাদা ব'লে মরে—কি দিন আমায় জিজ্ঞেস

ক'রে—দাদা পূজোর ছুটিতে বাড়ী আসবেন তো? দাদার দায় প'ড়ে গিয়েছে খোঁজ করতে! চার পাঁচদিন এসেছেন, এ বাড়ীর চৌকাঠ মাড়ালে চণ্ডী কি অশুদ্ধ হয়ে যায় শুনি?

আমাকে একটু অপ্রতিভই হতে হ'ল। উমারাণীর কোঁকড়া চুলে ভরা মাথাটিতে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললুম—হ্যাঁ রে রাণী, দাদার কথা তা হ'লে ভুলিস নি?

টুনির কথায় মেয়েটির খুব লজ্জা হয়েছিল, সে মুখ নীচু ক'রে আমার কাপড়ের কোণ হাতে নিয়ে চুপ ক'রে নাড়তে লাগল—আমি দালানে একটা খাটের ওপর ব'সেছিলুম, উমারণী নীচে আমার পায়ের কাছটিতে ব'সে ছিল।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—শচীশ বলছিল, দিদি চ'লে যাবে সোমবারের দিন। সে কথা কি ঠিক?

উমারাণী নতমুখেই উত্তর দিল—বাবা চিঠি দিয়েছিলেন; একাদশীর দিন নিয়ে যাবেন। কিন্তু আজও তো এলেন না।

ওর গলার স্বরটা যেন একটু কেঁপে গেল।

ওর বিরহী বালিকা-হৃদয়টি মা-বাপের জন্যে তৃষিত হ'য়ে উঠেছে বুঝে সান্ত্বনার সুরে বললুম—আসবেন; আজ তো মোটে নবমী। আচ্ছা কলকাতা কেমন লাগল রাণী?

উমারাণী উত্তর দিল—বেশ ভাল।

আমি তার নত মুখখানির দিকে চেয়ে বললুম—তা নয় রে রাণী। ভাল কখনই লাগেনি, দাদার খাতিরে ভাল বললে চলবে না। কোথায় পশ্চিমের অমন জল-হাওয়া, আর এই ধুলো ধোঁয়া—ভাল লাগতেই পারে না।

উমারাণী একটুখানি হেসে চুপ ক'রে রইল।

জিজ্ঞাসা করলুল—পশ্চিমে পূজো হয় রে রাণী?

সে বললে—ঠিক এদেশের মত হয় না। হিন্দুস্থানীরা কি একটা করে, সেও অনেকটা এই রকমের। আর সেখানে এ সময় রামলীলার খুব ধুম হয়।

আমি উঠে আসবার সময় উমারাণী আবার একবার আমার পায়ের কাছে নত হ'য়ে প্রণাম করলে।

আমি বললুম—রাণী, আমি যতবার আসব যাবো, ততবারই কি আমায় একটা ক'রে প্রণাম করতে হবে?

উমারাণী বোধ হয় এই প্রথম বার আমার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে বললে—কাল বিকেলে আসবেন, দাদা।

এর আগে উমারাণী কখনো আমায় দাদা ব'লে ডাকেনি। আমি ওর মুখে দাদা ডাক শুনে বড় আনন্দ পেলুম। বললুম—কাল তো বিজয়া দশমী, আসব বই কি।

তার পরদিন বিজয়া দশমী। সন্ধ্যার পর ওদের বাড়ী গেলুম। সকলকে প্রণাম করলুম। টুনি এসে বললে—আপনি দালানের পাশের ঘরে যান। ওখানে বৌদি আছেন।

আমি সে ঘরের দোর পর্য্যন্ত গিয়ে ঘরের মধ্যে একটা বড় সুন্দর দৃশ্য দেখলুম। তাতে ঘরের মধ্যে যাওয়া বন্ধ ক'রে আমায় দোরের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে হ'ল।

দেখি, ঘরের মধ্যে খাটের ওপরে ব'সে আমার ছোট ভাই শচীশ, তার বয়স বার তের। তার পাশে উমারাণী দাঁড়িয়ে খাটের পাশের একটা টেবিলের ওপরকার একখানা রেকাবী থেকে খাবার নিয়ে শচীশের মুখে তুলে দিয়ে তাকে খাওয়াচ্ছে। ওদের দু'জনকারই পেছন আমার দিকে।

এমন কোমল স্নেহের সঙ্গে উমারাণী শচীশের কাঁধের ওপর তার বাঁ-হাতটি দিয়ে স্নেহময়ী বড়দিদির মত আপন হাতে তার মুখে খাবার তুলে দিচ্ছে যে, আমার মনে হ'ল আজ শৈল বেঁচে থাকলে সে এর বেশী করতে পারত না। উমারাণীর প্রতি এতদিনে অননুভূত একটা স্নেহরসে আমার মন সিক্ত হয়ে উঠল। আমি খানিকক্ষণ দোরের কাছে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে ঘরের ভিতর ঢুকে প'ড়ে উমারাণীকে বললুম—লুকিয়ে লুকিয়ে ছোট ভাইকে খাওয়ালে শুধু হবে না। দাদাকে কি খেতে দিবি রে, রাণী?

বেচারী উমারাণীর মুখ লাল হ'য়ে উঠল লজ্জায়। সে এমন থতমত

খেয়ে গেল হঠাৎ যে, খামকা যে এত প্রণাম করে, আজ বিজয়ায় প্রণাম করতে সে ভুলে গেল। একটা কি কথা অস্পষ্টভাবে বার দুই ব'লে সে মাথা নীচু ক'রে রইল। আমি তার দিকে চেয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলুম, আজ যে তাকে ধ'রে ফেলেছি, তার ভাইবোন-বিহীন নির্জ্জন প্রাণটি কিসের জন্যে তৃষিত হয়ে আছে, তা যে আজ বার ক'রে ফেলেছি। আজ অনুভব করছিলুম, জগতের মধ্যে ভাইবোনের একটু স্নেহ পাবার জন্যে ব্যাকুল এমন অনেক হৃদয়কে আজ আমি আমার বড় ভাইয়ের উদার স্নেহ-ছায়াতলে আশ্রয় দিয়েছি। একটা বুকজুড়ানো তৃপ্তিতে আমার মন ভ'রে উঠল।

সেই সময় টুনি সে-ঘরে ঢুকে আমার সামনের টেবিলে থালা-ভরা মিষ্টান্ন রেখে বললে—দাদা, একটু মিষ্টি মুখ করুন।

আমি টুনিকে বললুম—আয় টুনি সকলে মিলে···

উমারাণীকে খাটের ওপর বসালুম। খাবার সকলকেই দিলুম। উমারাণী লজ্জায় একেবারে আড়ষ্ট। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জ'মে গেল তার লজ্জার চোটে। বেচারী লজ্জায় আর ঘামে হাঁপিয়ে মারা যায় দেখে তার ঘোমটা বেশ ক'রে খুলে দিলুম। বললুম—আমি দাদা, আমার কাছে লজ্জা কি রে রাণী? আমার লক্ষ্মী ছোট বোনটি···

জলযোগ-পর্ব্ব সমাধা করে বাইরের দালানে এসে টুনির মায়ের সঙ্গে গল্প করতে আরম্ভ করলুম। একটু পরে তিনি উঠে রান্নাঘরে চ'লে গেলেন। আরও খানিক পরে আমি উঠতে যাচ্ছি, উমারাণী কাছে এসে দাঁড়াল। জিজ্ঞাসা করলুম—রাণী, আজ ঠাকুর বিসর্জ্জন দেখলি নে?

—ওপরের ঘরের জানলা থেকে দেখছিলুম, বেশ ভাল।

—অনেক রকমের প্রতিমা, না?

—হ্যাঁ, কত সব বড় বড়।—তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে আমার দিকে চেয়ে বললে—দাদা, কাল আসবেন না?

আমি বললুম—সে কি বলতে পারি? সময় পাই তো আসব। আবার শীগ্‌গির চ'লে যাব কি না, অনেক কাজ আছে।

—আপনি কি খুব শীগ্‌গির যাবেন দাদা?

—হ্যাঁ, বেশী দিন তো ছুটি নেই, পূর্ণিমার পরেই যেতে হবে।

উমারাণী নতমুখে চুপ ক'রে রইল।

বললুম—তা তোকেও তো আর বেশী দিন থাকতে হবে না রে!

উমারাণী বললে—বাবা বোধ হয় কাল আসবেন।

ওকে একটু সান্ত্বনা দেবার জন্যে বললুম—তবে আর কি? এই দুটো দিন কোন রকমে কাটালেই তো…

সে একটু চুপ ক'রে থেকে তারপর যেন ভয়ে ভয়ে বললে—যাবার আগে একবারটি এ বাড়ী আসতে পারবেন না, দাদা?

বললুম—খুব খুব। আসব বৈকি। নিশ্চয়।

এর ছয় সাত দিন পরে গৌহাটী রওনা হলুম। এই কদিন নানা কাজে ব্যস্ত হয়ে চারিদিক ঘুরতে হয়েছিল। শচীশের মুখে শুনেছিলুম উমারাণীর পশ্চিম যাওয়া হয়নি। কি কারণে তার বাবা তাকে নিতে আসতে পারেন নি! শচীশ মাঝে মাঝে বলত—দাদা, যাবার আগে একবার দিদির সঙ্গে দেখা ক'রে যাবেন। তিনি আপনার কথা প্রায়ই বলেন।

ইচ্ছা থাকলেও গৌহাটী যাবার আগে উমারাণীর সঙ্গে দেখা করা আর আমার ঘটে ওঠেনি।

গৌহাটী গিয়ে এবার অনেক দিন রইলুম। উমারাণীর কথা প্রথম প্রথম আমার খুব মনে হ'ত, তারপর দিনকতক পরে তেমন বিশেষ ক'রে আর মনে হ'ত না, ক্রমে প্রায় ভুলেই গেলুম। কিছুদিন পরে গৌহাটীর চাকরী ছেড়ে দিলুম। শিলচর, দার্জ্জিলিং নানা চা-বাগান বেড়ালুম। দু'একটা হাসপাতালেও কাজ করলুম। সব সময় নির্জ্জনে কাটাতুম। একা বাংলোয় থেকে থেকে কেমন হয়েছিল, অনেক লোকের ভিড়, অনেক লোকের একসঙ্গে কথাবার্ত্তা সহ্য করতে পারতুম না। এখানে সন্ধ্যায় পাহাড়ের দেওয়ালের গায়ে কুঙ্কুম ছড়ানো সূর্য্যাস্ত, চা-ঝোপের চারিপাশ ঘেরা গোধূলির অন্ধকার, গভীর রাত্রির একটা স্তব্ধ গম্ভীর থমথমে ভাব, আর সরল গাছের ডালপালার মধ্যে বাতাসের বিচিত্র সুর, ওই আমার কাছে বড় প্রিয়, বড় স্বস্তিকর ব'লে

মনে হ'ত ।...বসবার ঘরটিতে সাজিয়ে রেখেছিলুম জগতের যুগ যুগের জ্ঞানবীরদের বই—Gauss, Zollner, Helmholtz, Giekie, Logan, Dawson, যাদের অলোক-সামান্য প্রতিভা আমাদের সুন্দরী বসুন্ধরার অতীত শৈশবের, তাঁর রহস্যময় বালিকা-জীবনের তমসাচ্ছন্ন ইতিহাসের পাতা আলোকোজ্জ্বল ক'রে তুলেছে, যাঁদের মনীষার যোগদৃষ্টি অসীম শূন্যের দূরতা ভেদ ক'রে বিশাল নক্ষত্র জগতের তত্ত্ব অবগত হচ্ছে, তাঁদের সঙ্গে অনেক রাত পর্য্যন্ত কাটাতুম। জগতের রহস্যভরা অন্ধিসন্ধি তাঁদেরই প্রতিভার তীব্র সার্চ্চ-লাইট-পাতে উজ্জ্বল হয়ে তবে তো আমাদের মত সাধারণ মানুষের দৃষ্টির সীমার মধ্যে আসছে!

এই রকম প্রায় সাত আট বছর পরে আবার কলকাতায় গেলুম। ভাবলুম কলকাতাতেই প্র্যাক্‌টিস্ আরম্ভ করব। মামার বাড়ী গিয়ে উঠলুম। শুনলুম সামনের বাড়ীটায় আমার ভগ্নীপতিরা আর থাকে না, তারা বছর পাঁচ ছয় হ'ল দেশে চ'লে গিয়েছে। কয়েকমাস কলকাতায় কাটল। প্র্যাকটিস্ যে খুব জ'মে উঠেছিল, এমন নয়, বা অদূর ভবিষ্যতেও যে খুব জ'মে উঠবে, এরকম মনে করবার কোন কারণও দেখতে পাচ্ছিলুম না। এমন অবস্থায় একদিন সকালে মামার বাড়ীর ওপরের ঘরে ব'সে পড়ছি, এমন সময় কে ঘরে ঢুকল। চেয়ে দেখে প্রথমটা যেন চিনতে পারলুম না। তারপর চিনলুম—টুনি। অনেক দিন তাকে দেখিনি, তার চেহারা খুব বদলে গিয়েছে। আমি তাকে হঠাৎ দেখে যেমন আশ্চর্য্যও হলুম, তেমনি খুব আনন্দিতও হলুম।

টুনি বললে, সে তার স্বামীর সঙ্গে আজ পাঁচ ছ'দিন হ'ল কলকাতায় এসেছে, শিম্‌লেতে তাদের কোন্ আত্মীয়ের বাড়ীতে এসে আছে, আজ এবাড়ীর সকলের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—সুরেন এখন কোথায়?

টুনি বললে—ছোড়দা এখন আবাদে কোথায় চাকরি করেন, সেখানেই থাকেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—উমারাণী কেমন আছে?

টুনি একটু চুপ ক'রে রইল। তারপর বললে, দাদা, সে অনেক কথা আপনি এখানে আছেন, তা আমি জানতুম। সে সব কথা আপনাকে বলব ব'লেই আমার একরকম এখানে আসা।

আমি বললুম—কি ব্যাপার শুনি? সে ভাল আছে তো?

টুনি বললে—সে ভাল আছে কি, কি আছে সে আপনিই শুনুন না। সেই যে-বছর পূজোর সময় আপনি এখানে ছিলেন, বৌদির বাপের নিতে আসবার কথা ছিল, সে তো আপনি জানেন। তখন তিনি ছুটি পান নি, ব'লে আসতে পারেন নি, পত্র দিয়েছিলেন পরের মাসে নিয়ে যাবেন। তার বুঝি মাসখানেক পরে খবর এল তিনি কলেরায় মারা গিয়েছেন। বৌদি সেই বিয়ের কনে বাপের বাড়ী থেকে এসেছিল, এমনি তার অদৃষ্ট, আর সে-মুখো হতে হ'ল না। তারপর···

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—উমারাণীর মা?

টুনি বললে—শুনুন না। মা আবার কোথায়? তিনি তো বৌদির বিয়ে হবার আগেই মারা গিয়েছিলেন। তারপর এদিকে আবার দাদা তার সঙ্গে বিশেষ কোন সম্বন্ধ রাখেন না। তিনি সেই যেখানে চাকরী করেন, সেখানেই থাকেন, বৌদি থাকে চাপাপুকুরের বাড়ীতে প'ড়ে, দাদা চিঠিপত্রও দেন না। বৌদি বড় শান্ত, বড় চাপা মেয়ে, সে মুখ ফুটে কখনো কিছু বলে না, কিন্তু তার মুখের দিকে চাইলে বুক ফেটে যায়। মেয়েমানুষের ও কষ্ট যে কি, সে আপনি বুঝবেন না দাদা। যতদিন মা ছিলেন বৌদিকে কষ্ট জানতে দেন নি, তা তিনিও আজ দু'বছর মারা গিয়েছেন। বাড়ীতে আছেন শুধু পিসিমা।

সেই শান্ত ছোট মেয়েটির ওপর দিয়ে এত ঝড় বয়ে গিয়েছে শুনে আমার মনে বড় কষ্ট হ'ল। জিজ্ঞাসা করলুম—সুরেনের এমন ব্যবহারের মানে কি?

টুনি বললে—তা তিনিই জানেন। তবে তিনি নাকি বলেন, জোর ক'রে তাঁর বিয়ে দেওয়া হয়েছে, বিয়ে করার তাঁর কোন ইচ্ছা ছিল না, এই সব। বড়দাও দেশের বাড়ীতে থাকেন না। বাড়ীতে থাকেন শুধু পিসিমা। কাজেই বৌদির মুখের দিকে চেয়ে তাকে একটু যত্ন ক'রে, দুটো কথা বলে,

এমন একটা লোক পর্য্যন্ত নেই। পিসিমা আছেন, কিন্তু সে না থাকারই মধ্যে।

সে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইল, তারপর বললে—আপনাকে একটা কথা বলি দাদা। আপনি একবার তার সঙ্গে দেখা ক'রে আসুন। আপনাকে সে যে কি চোখে দেখে তা বলতে পারিনে দাদা। সেবার চাঁপাপুকুরে গিয়েছিলুম বৌদি বললে, আমার দাদার কথা কিছু জান ঠাকুরঝি? আপনি এদেশ ওদেশ ক'রে বেড়াচ্ছেন শুনে সে কেঁদে বাঁচে না। মাঝে মাঝে যখনই তার কাছে গিয়েছি, আপনার কথা এমন দিন নেই—যে সে বলেনি। বলে, ভগবান আমার ভাইয়ের অভাব পূর্ণ করেছেন, দাদা আর শচীশকে দিয়ে। এখনও পর্য্যন্ত ফি চিঠিতেই আপনার খোঁজ নেয়। তা বড্ড পোড়াকপালী সে, কারুর কাছ থেকে কোন স্নেহই সে কোন দিন পেল না! আপনার পায়ে পড়ি দাদা, আপনি তাকে একবার গিয়ে দেখা দিয়ে আসুন, আপনি গেলে সে বোধহয় অর্দ্ধেক দুঃখ ভোলে।

ছাদের আলিসার ওপর থেকে রোদ নেমে গেল, পাশের বাড়ীর চিলছাদের ওপর ব'সে একটা কাক একঘেয়ে চীৎকার করছিল।...

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—সুরেন কি মোটেই বাড়ী যায় না?

টুনি বললে—সে একরকম না যাওয়াই দাদা। বছরে হয় তো দু'বার; তাও গিয়ে এক আধ দিন থাকেন। তাও যান সে কি জন্যে? কিস্তী না কি—সেই সময় যার কাছে যা খাজনা পাওয়া যাবে তাই আদায় করতে।

তারপর অন্যান্য এক-আধটা কথাবার্ত্তার পর টুনি চ'লে গেল। সেদিন বিকেলে সেনেট হলে একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের বক্তৃতা ছিল, তিনি কেম্‌ব্রিজ থেকে এসেছিলেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে। বক্তৃতার বিষয়টি ছিল যেমনই চিত্তাকর্ষক,—বক্তৃতার অর্থাংশ ও বক্তার যুক্তিপ্রণালী ছিল তেমনই দুর্ব্বোধ্য। আরম্ভ হবার সময় ছাত্রের দলে হল ভরা থাকলেও বেগতিক বুঝে বক্তৃতার মাঝামাঝি তারা প্রায় স'রে পড়েছিল। কেবল জনকতক নিতান্ত নাছোড়বান্দা রকমের ছাত্র তখনও হলের বিভিন্ন অংশে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ব'সে ছিল। বক্তা খ্যাতনামা

অধ্যাপক, রয়েল্ সোসাইটির ফেলো। তাঁর ব্যাখ্যার মৌলিকতার মোহে সকলেই তাঁর বক্তৃতায় অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ পোষাক পরা সৌম্যমূর্ত্তি ঋজুদেহ অধ্যাপককে সত্যদ্রষ্টা ঋষির মত বোধ হচ্ছিল।...বক্তৃতা শুনতে শুনতে কিন্তু আমার মন ভেসে যাচ্ছিল বক্তৃতার বিষয় থেকে অনেক দূর, কলকাতার ইটপাথরের রাজ্য থেকে অনেক দূর, আমার অভাগিনী বোনটি যেখানে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করছে সেই খানে। মাঝে মাঝে হলের খোলা দুয়ার দিয়ে জ্যোৎস্না-ওঠা বাইরের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে উমারাণীর বালিকা মুখখানি বড় বেশী ক'রে মনে পড়ছিল। আর মনে পড়ছিল তার সেই মিনতিভরা দৃষ্টি, অনেক দিন পরে বাবাকে দেখতে পাবার জন্যে তার সে করুণ আগ্রহ! তার আগ্রহভরা দাদা ডাকটি অনেক দিন পরে আবার বড মনে পড়ল। ভাবলুম সত্যিই কারুর কাছ থেকে কোন স্নেহ কখন সে পায়নি। আজ বিজ্ঞানের গভীর তত্ত্বকথার রস আমার স্নায়ুমণ্ডলী বেয়ে সমস্ত দেহে যখন পুলক ছড়িয়ে দিচ্ছে, তখন আমার মনের উন্নত আনন্দের অবস্থার সঙ্গে আমাব অভাগিনী স্নেহবঞ্চিতা বোনটির নির্জ্জন জীবনের অবস্থা কল্পনা ক'বে আমার মন যেন কেঁদে উঠল। বাইরের জগতে যখন এত বিচিত্র স্রোত বয়ে যাচ্ছে, তখন সে কি শুধু ঘরের কোণে ব'সে দিনরাত চোখের জলে ভাসবে? জগতের আনন্দবার্ত্তা তার কাছে বহন ক'রে নিয়ে যাবাব কি কেউ নেই? ··

বাইরে যখন এলুম তখন গোলদীঘির জলেব ওপব চাঁদ উঠেছে, কিন্তু ধোঁয়া-ভরা আকাশের মধ্যে দিয়ে জ্যোৎস্নার শুভ্রমহিমা আত্মপ্রকাশ কবতে পারছে না। আমার মস্তিষ্ক তখন বক্তৃতার নেশায় ভরপুর, পুকুরের জলের ধারে সবুজ ঘাসের মাঝে মাঝে মর্শুমী ফুলের ক্ষেতগুলো আমাব চোখের সামনে এক নতুন মূর্ত্তি ধরেছে। কিন্তু ত্রয়োদশীর অমন বৃষ্টি-ধোয়া যুঁই ফুলের মত জ্যোৎস্নাও ধোঁয়ার জাল কাটিয়ে বাইরে আসতে না পেরে, ব্যর্থতার দুঃখে কেমন বিবর্ণ হয়ে গেছে লক্ষ্য ক'রে আমার একটা কথাই কেবল মনে হ'তে লাগল—এই জ্যোৎস্না, এই ফুলের ক্ষেত, এই ত্রয়োদশী, এবারকার মত সব মিথ্যা, সব ব্যর্থ।...ও জ্যোৎস্না প্রতীক্ষায় থাকুক সেই

শুভ রাতটির, যে রাতে আকাশ-ভরা সার্থকতা ওকে বরণ ক'রে নেবে ফোটা ফুলের ঘন সুগন্ধের মধ্যে দিয়ে, তরুণ-তরুণীদের অনুরাগ-নম্র দৃষ্টি-বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে, গভীর রাতের নীরবতার কাছে পাপিয়ার আকুল আত্মনিবেদনের মধ্যে দিয়ে।…

বাড়ী এসে ভাবতে ভাবতে, এতদিন নানা কাজের ভিড়ে আমার যে বোনটিকে আমি হারিয়ে বসেছিলুম, তারই কাছে স্নেহের বাণী বয়ে নিয়ে যেতে আমার প্রাণ ব্যাকুল হ'য়ে উঠল।

এর কয়েকদিন পরে কলকাতা ছেড়ে বার হলুম উমারাণীর কাছে যাবো ব'লে। শীত সেদিন নরম প'ড়ে এসেছে, ফুটপাথ বেয়ে হাঁটতে-হাঁটতে দখিন্ হাওয়া অতর্কিত ভাবে গায়ের ওপর এসে প'ড়ে উৎপাত সুরু ক'রে দিয়েছে।…

পরদিন বেলা প্রায় ছুটোর সময় ওদের ষ্টিমার ষ্টেশনে নেমে শুনলুম, ওদের গাঁ সেখান থেকে প্রায় চার ক্রোশ। হেঁটে যাওয়া ছাড়া নাকি কোন উপায় নেই, কোন রকম যান-বাহনের সম্পূর্ণই অভাব।

কখনো এদেশে আসিনি, জিজ্ঞাসা করতে করতে পথ চলতে লাগলুম। কাঁচা রাস্তার দুধারে মাঠ, মাঝে মাঝে লতাপাতায় তৈরী বড় বড় ঝোপ। কোন কোন ঝোপের তাজা সবুজ ঘন বুনানি মাথা আলো ক'রে ফুটে আছে সাদা সাদা মেটে আলুর ফুল। মাঠে মাঠে মাটির ঢেলার আড়ালে ঝুপসি গাছে দ্রোণ-ফুলের থই ফুটে আছে। মাঠ ছাড়ালে গ্রামের মধ্যে দিয়ে যেতে মাটির পথের ওপর অভ্যর্থনা বিছিয়ে রেখেছে রাশি রাশি সজ্‌নে ফুল। গ্রামের হাওয়া আমের বোলের আর বাতাবী লেবু ফুলের গন্ধে মাতাল। বুনো কুলে আর বৈঁচি গাছের বনে কোন কোন মাঠ ভরা। পড়ন্ত রোদে গাছপালার তলায়, ঘন ঝোপের মধ্যে ফাঁকা জায়গায় ছোট ছোট পাখির দল কিচ্ কিচ্ করছে, মাঝে মাঝে কোন কোন জঙ্গলের কাছ দিয়ে যেতে যেতে কোন অজ্ঞাত বনফুলের এমনি সুগন্ধ বেরুচ্ছে, যে, তার কাছে খুব দামী এসেন্সের গন্ধও হার মানে। পায়ের শব্দ পেয়ে শুকনো

পাতার রাশির ওপর খস্ খস্ শব্দ করতে করতে দু'একটা খরগোস কান খাড়া ক'রে রাস্তার এ পাশের ঝোপ থেকে ওপাশের ঝোপে দৌড়ে পালাচ্ছে। মাঠের মাঝে মাঝে দূরে দূরে শিমুল ফুলের গাছগুলো দখিন্ হাওয়ার প্রথম স্পর্শেই আবেশ-বিধুরা তরুণীর মত রাগ-রক্ত হয়ে উঠেছে।···

অনেকগুলো গ্রাম ছাড়িয়ে যাওয়ার পর একজন দেখালে মাঠ ছাড়িয়ে এবার পড়বে চাঁপাপুকুর। গ্রামের মধ্যে যখন ঢুকলুম তখন গ্রামের পথ অন্ধকার হ'য়ে গিয়েছিল, আশপাশের নানাবাড়ী থেকে পল্লী-লক্ষ্মীদের সাঁজের শাঁখের রব নিস্তব্ধ বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছিল।···

কোন্ ঘরটি আলো ক'রে আছে আমার স্নেহের বোনটি? কোন্ গৃহস্থের আঙ্গিনায় আঁধার আজ দূর হ'য়ে উঠল তার সেবা-চঞ্চল চরণের শান্ত মধুর ছন্দে?··

রাস্তার মধ্যে এক জায়গায় কতকগুলো ছেলেকে দেখতে পেয়ে তাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতে তাদের মধ্যে একজন বললে—আসুন, আমি সে বাড়ী আপনাকে পৌছে দিচ্ছি। খানিক রাস্তা এগিয়ে গিয়ে সে পাশের একটা সরু পথ বেয়ে চলল। তারপর একটা বড় পুরানো বাড়ীর সামনে গিয়ে বললে, এই তাঁদের বাড়ী। আপনি একটু দাঁড়ান, আমি বাড়ীর মধ্যে বলি। একটু পরে একজন বৃদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে সে বাড়ীর মধ্যে থেকে বার হয়ে এল। বৃদ্ধাকে বললে—ইনি কলকাতা থেকে আসছেন জেঠাইমা, আপনাদের বাড়ী কোথায় জিজ্ঞাসা করাতে আমি ওপাড়া থেকে নিয়ে আসছি।

বৃদ্ধা আমার দিকে একটু এগিয়ে এসে আমায় ভাল ক'রে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমায় ত চিনতে পারছি নে বাবা, কোন্ জায়গা থেকে তুমি আসছ?

আমি আমার নাম বললুম—পরিচয় দিতেও উদ্যত হলুম।

বৃদ্ধা ব'লে উঠলেন যে, আমায় আর পরিচয় দিতে হবে না, আমার আসা-যাওয়া নেই ব'লে তিনি কখনো আমায় দেখেননি, তাই চিনতে পারছিলেন না। আমি বাইরে এসে দাঁড়িয়ে আছি এতে তিনি খুব দুঃখিত

হ'লেন। আমি কেন একেবারে বাড়ীর মধ্যে গেলুম না, আমি তো ঘরের ছেলের বাড়া, আমার আবার বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকাডাকি কি ইত্যাদি।

তাঁর সঙ্গে বাড়ীর মধ্যে ঢুকলুম। কেবল মনে হ'তে লাগল, আট বছর—আজ আট বছর পরে! কি জানি উমারাণী কেমন আছে, সে কেমন দেখতে হয়েছে! আজ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে আমায় দেখে সে যে আনন্দ পাবে, সে আনন্দের পরিমাণ আমি একটু একটু বুঝছি, আমার বুকের তারে তার প্রতিধ্বনি গিয়ে বাজছে। আজ এখনি তার স্নেহ মধুর ক্ষুদ্র হৃদয়টির সংস্পর্শে আসব, তার কালো চুলে ভরা মাথাটিতে হাত বুলিয়ে আদর করতে পারব, তার মিষ্টি দাদা ডাকটি শুনব, এ কথা ভেবে আনন্দে আমার মনের পাত্র ছাপিয়ে পড়ছিল।

দেখলুম এদের অবস্থা এক সময় ভাল ছিল, খুব বড় বাড়ী, এখন সব দিকেই ভাঙ্গা ঘর-দোর, দেওয়াল ফেটে বড় বড় অশ্বত্থ-চারা উঠেছে। বাইরের উঠান পার হ'য়ে ভেতর বাড়ীর উঠানের দরজায় পা দিয়েই বৃদ্ধা ব'লে উঠলেন—ও বৌমা, বার হয়ে দেখ কে এসেছে।

—কে, পিসীমা?—ব'লে প্রদীপ হাতে সে ওদিকের একটা ঘর থেকে বার হয়ে এল, অস্পষ্ট আলোয় দেখলুম, তার মুখখানি আধ-ঘোমটা দেওয়া, ঘোমটার পাশ দিয়ে চুলগুলো অসংযতভাবে কানের পাশ দিয়ে কাঁধের ওপর পড়েছে, পরণে আধ-ময়লা শাড়ী, চেহারা রোগা রোগা একহারা। এই সে-ই উমারাণী! তাকে দেখে প্রথমেই আমার মনে হ'ল সে আগের চেয়ে অনেক রোগা হ'য়ে গেছে, আর মাথায়ও অনেকটা বেড়ে গিয়েছে।

কয়েক সেকেণ্ড উমারাণী আমায় চিনতে পারলে না, তার পরই যেন হাঁপিয়ে ব'লে উঠল—দাদা!...

অন্য কোন কথা তার মুখ দিয়ে বেরুল না, প্রদীপটা কোন রকমে নামিয়ে রেখে সে এসে আমার পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়ল।

আমি তাকে ওঠালুম, তার মুখে দেখলুম এক অপূর্ব্ব ভাব! মনে হ'ল আনন্দ, বিস্ময়, আশা, অভিমান সব ভাবের রংগুলো এক সঙ্গে গুলে তার প্রতিমার মত মুখে কে মাখিয়ে দিয়েছে। বৃদ্ধা বললেন—বাবা, তুমিই আস

না, বৌমা দাদা বলতে অজ্ঞান। কত দুঃখ ক'রে, ব'লে, কলকাতায় থাকলে মাঝে মাঝে দাদার দেখা পেতাম, এ তেপান্তরের পুর, তিনি আসবেন কেমন ক'রে!—বৌমা, সতীশকে আগে হাতমুখ ধোবার জলটল দাও, বাছা একটু ঠাণ্ডা হোক, যে পথ।

হাতমুখ ধোবার পর উমারাণী একটা ঘরের মধ্যে আমায় নিয়ে গেল। আমি যে এখানে এ অবস্থায় হঠাৎ আসব, তা যেন সম্ভাবনার সীমার সম্পূর্ণ বাইরের জিনিষ। অন্ততঃ তার কাছে। তাই বেচারীর মুখ দিয়ে কথা বার হচ্ছিল না। তার আবেগকে স্বাভাবিক গতি লাভের সুযোগ দেবার জন্যে আমিও কোন কথা বলছিলুম না। একটুখানি দু' জনে চুপ ক'রে থাকার পর উমারাণী বললে—দাদা, এতদিন পরে বুঝি মনে পড়ল?

আমি আগেকার মত তার মাথার দু' পাশের চুলগুলোয় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললুম—রাণী, আসতে পারিনি হয়ত নানান্ কাজে। কিন্তু এ কথা মনে ভাবিসনি যে ভুলে গিয়েছিলুম। চেহারা যে একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে রে, বড্ড কি অসুখ বিসুখ হয়?

আট বছর আগেকার সেই ছোট্ট মেয়েটির মত মুখ নীচু ক'রে একটুখানি হেসে সে চুপ ক'রে রইল।

জিজ্ঞাসা করলুম—আচ্ছা রাণী, আমি আসব একথা ভেবেছিলি?

তার দুই চোখ জলে ভ'রে এল, বললে—কি ক'রে ভাবব দাদা? আমি আপনাদের আবার দেখতে পাব, আদর যত্ন করতে পারব এমন কপাল যে আমার হবে, তা কি ক'রে ভাবব?

এলোমেলো যে সব চুল তার ঘোমটার আশে পাশে পড়েছিল, সেগুলো সব ঠিক-মত সাজিয়ে দিতে দিতে বললুম—সেই জন্যেই ত এলুম রে। আর তোদের দেখবার ইচ্ছে বুঝি আমার হয় না? ভাবিস বুঝি দাদাদের মন সব সান-বাঁধানো।

সে বললে—তাই আজ দু'তিন দিন থেকে আমার বাঁ চোখের পাতা অনবরত নাচছে দাদা। আজ ওবেলা যখন ঘাটে যাই, তখন বড্ড নেচেছে। পিসিমাকে বলতে পিসিমা বললেন—মেয়েমানুষের বাঁ চোখ নাচলে ভাল হয়।

আমি বললুম—আমার কথা তোর মোটেই মনে ছিল না, না রে রাণী ?” সে একথার কোন উত্তর দিল না, তার দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। জিজ্ঞাসা করলুম, হ্যাঁ রে সুরেন বাড়ী থেকে গিয়েছে কতদিন ?

সে নতমুখে উত্তর দিল—প্রায় আট মাস।

বললুম—চিঠি পত্র দেয় ?

উত্তরে সে ঘাড় নেড়ে জানালে—হ্যাঁ।

তার মুখের ভাবে বুঝলুম যে তার বড় ব্যথার স্থানে আমি ঘা দিয়েছি, দুঃখিনী বোনটির এলোমেলো চুলে ঘেরা মুখখানির দিকে তাকিয়ে স্নেহে আমার মন গ'লে গেল। রুমাল বের ক'রে তার চোখের জল মুছিয়ে দিলুম। কত রাত তার এই রকম চোখের জলে কেটেছে, তার খোঁজ তো কেউ রাখেনি, তার সাক্ষী আছে কেবল আকাশের ঐ গহন অন্ধকার আর চারিপাশের গাছপালার মধ্যেকার ঐ ঝিঁঝিঁপোকার রব।...

উমারাণী জিজ্ঞাসা করলে—দাদা,আপনি কোথায় থাকেন ?

আমি বললুম—আগে নানা জায়গায় ঘুরছিলুম, এখন ঠিক করেছি কলকাতাতেই থাকব।

সে বললে—আপনি বিয়ে করেছেন, দাদা ?

বললুম—না রে। বিয়ের তাড়াতাড়ি কি ? সে একদিন করলেই হবে।

ছোট মেয়েটির মতন তার ঠোঁট দুটি অভিমানে ফুলে উঠল, বললে—তাই বৈকি ? আপনি বুঝি ভেবেছেন চিরকাল এই রকম ভেসে ভেসে বেড়াবেন ? তা হবে না দাদা, আমি এই বছরেই আপনার বিয়ে দেব।

আমার হাসি পেল, বললুম—দিবি তুই ?

সে বললে—দেবই তো, এই আষাঢ় মাসের মধ্যেই দেব।

আমি বললুম—তা যেন হ'ল। কিন্তু আমার তো বাড়ী-ঘর-দোর নেই, বিয়ে ক'রে রাখব কোথায় ?

সে বললে—কেন দাদা, রাখবার জায়গার বুঝি ভাবনা ? আমি বউকে এখানে রাখব। দু' জনে মিলে বেশ ঘর-সংসার ক'রব।

আমি একটু গম্ভীর ভাবে বললুম—তা হ'লে পাঁজিখানা আবার যে ফেলে এলুম রাণী, সামনের মাসে দিনটিন যদি থাকে···

উমারাণী বললে—পাঁজি ত ওপরের ঘরে রয়েছে দাদা। আপনি এখন খাওয়া-দাওয়া করুন, কাল সকালে দেখলেই হবে।

আশ্বস্ত হলুম। কি বলতে যাচ্ছিলুম, উমারাণী ব'লে উঠল—আপনাকে খাওয়ানোর বন্দোবস্ত করিগে, কাল থেকে পেটে ভাত যায়নি, আপনার মুখ একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে দাদা।

তার পরদিন ভোরে উঠে দেখি উমারাণী সেই ভোরে নাইতে যাবার উদ্যোগ করছে। শীত সেদিন সকালে একটু বেশী পড়েছে। উমারাণীর শরীরের দিকে চেয়ে দেখি, তার শরীরে আর কিছু নেই। রাত্রে ভাল টের পাইনি, আট বছর আগেকার সেই স্বাস্থ্যশ্রীসম্পন্না মেয়েটির সঙ্গে বর্ত্তমানের এই নিতান্ত রোগা মেয়েটির তুলনা ক'রে আমার বুকের মধ্যে কেমন ক'রে উঠল। তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—এত সকালে নাইতে যাবার কি দরকার রে রাণী?

সে বললে—একটু সকাল সকাল না নেয়ে এলে কখন্ রান্না চড়াব দাদা? কাল রাত্রে তো আপনার খাওয়াই হয়নি এক রকম।

আমি বললুম—তা হোক। আমাকে যে আটটার মধ্যেই খেতে হবে তার কোন মানে নেই। এত সকালে নাইতে যেতে হবে না তোর।

উমারাণী ঘড়া নামিয়ে রাখল।

পিসিমা বললেন—তোমার কথা, তাই শুনলে বাবা। নইলে ও কি তেমন পাগলী মেয়ে নাকি, দ্বাদশীর দিনে মাঘ মাসের ভোরে নাইতে যাবে। শোনে না, বলি, বৌমা তোমার শরীর ভাল নয়, এত সকালে জলে নেবো না। শোনে না, বলে, পিসিমা কাল গিয়েছে আপনার একাদশী, একটু সকাল সকাল কাজ না সেরে নিলে, আপনাকে দুটো খেতে দেব কখন?

সেদিন দুপুরে ওদের ওপরের ঘরে শুয়ে শুয়ে কি বই পড়ছিলুম। উমারাণী এসে চুপ ক'রে দোরের কাছে দাঁড়িয়ে রইল। বললুম—কে, রাণী? আয় না ভেতরে?

আমি উঠে বসলুম। সে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দেখলুম তার শরীর আগেকার চেয়ে খুব রোগা হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তার মুখখানি প্রতিমার মতই টলটল করছে। বয়স যদিও বাইশ তেইশ হ'ল, তার মুখ এখনও তের বছরের মেয়েটির মতই কচি। কথা আরম্ভ করবার ভূমিকাস্বরূপ বললুম—আজ বড় গরম পড়েছে, না?

উমারাণী বললে—হ্যাঁ দাদা। আমি ভাবলুম আপনি বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছেন, আপনি দিনমানে ঘুমোন না বুঝি?

বললুম—মাঝে মাঝে হয়তো ঘুমোই। আজ আর ঘুমোব না। আয় এখানে বোস, গল্প করি।

তাকে কাছে বসালুম। তার চুলের অবস্থা দেখে বুঝলুম সে চুলের যত্ন ক'রে না। মুখের আশে পাশে কোঁকড়া চুলের রাশ অযত্ন বিন্যস্ত ভাবে পড়েছিল, চুলগুলোর রং একটু কটা হয়ে গড়ছিল। রাত্রের মত চুলগুলো কানের পাশ দিয়ে তুলে দিতে দিতে বললুম—তোর শরীর তো খুব খারাপ হয়ে গেছে? বিয়ের পর সেই সময় কেমনটি ছিলি! খুব কি জ্বর হয়?

একটু হাসি ছাড়া সে এ কথার কোন উত্তর দিলে না।

আমি বললুম—না, এ কথা ভাল না রাণী। আমি গিয়ে একটা ওষুধ পাঠিয়ে দেব, সেইটে নিয়ম-মত খেতে হবে। না হ'লে এ যে মহা কষ্ট।

একটু পরে সে বললে—তা হ'লে সত্যি দাদা, আমি কিন্তু বিয়ের চেষ্টা করব। বলুন।

আমি তার কথায় মনে বড় কৌতুক অনুভব করলুম। এই অবোধ মেয়েটা জানে না যে সে এমনি একটা প্রস্তাব উত্থাপন ক'রে বসেছে, যাকে কার্য্যে পরিণত করা তার ক্ষুদ্র শক্তির বাইরে।

বললুম—বকিস্ নে, রাণী।

খানিকক্ষণ হয়ে গেল, সে আর কথা কয় না দেখে পেছন ফিরে দেখি ছেলেমানুষে হঠাৎ ধমক খেলে যেমন ভরসাহারা চোখে তাকায়, তার চোখে তেমনি দৃষ্টি। মনে হ'ল, একটা ভুল করেছি, উমারাণী সেই ধরণের মেয়ে যারা নিজেকে জোর ক'রে কখনও প্রচার করতে পারে না, পরের ইচ্ছার সঙ্গে

ইচ্ছা মিলিয়ে দিয়ে স্রোতের জলের শেওলার মত যারা জীবন কাটিয়ে দিতেই অভ্যস্ত। স্নেহ-সুখে সে আবোল-তাবোল বকছিল, এর সঙ্গে অত্যন্ত সতর্ক হ'য়ে ব্যবহার করতে হবে, বাতাস লজ্জাবতী লতার সঙ্গে যতটা সতর্ক হ'য়ে চলে তার চেয়েও। কথাটা যতটা পারি সামলে নেবার জন্য বললুম—তোর যদি সত্যি সত্যি বিয়ে দেবার ইচ্ছে থাকত, তাহ'লে তুই পাঁজিখানা আন্‌তিস্। দিন কোন্‌মাসে আছে না আছে সেগুলো সব দেখতে হ'বে তো, না শুধু শুধু তোর কেবল বকুনি।

উমারাণীর মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল, চোখের সে ভয় ভয় দৃষ্টিটা কেটে গেল। আমার কথার মধ্যে সে আমার বকুনির একটা কারণ খুঁজে পেল। বোধ হয়, বিয়ে করবার জন্যে নিতান্ত উৎসুক দাদাটির ওপর তার একটু কৃপাও হ'ল। সে বললে—পাঁজি আপনাকে দিয়ে আজ দেখিয়ে নেব সে তো ভেবেই রেখেছি দাদা। আপনি বসুন, আমি ও ঘর থেকে পাঁজিখানা নিয়ে আসি।

দালানের ওপাশে একটা ঘর ছিল, উমারাণী সেই ঘরটার মধ্যে উঠে গেল। সেই সময় পিসিমা নীচে থেকে ডাক দিলেন—বৌমা, নেমে এস, বেলা যে গেল, চালগুলো আবার কুটতে হবে তো।

উমারাণী ঘরটার বার হ'য়ে এসে আমার হাতে পাঁজিখানা দিয়ে বললে—আপনি দেখে রাখুন দাদা, আমায় বলবেন এখন। আমি এখুনি আসছি।

সে নীচে নেমে গেল।

তখন বেলা একটু প'ড়ে এসেছে, নীচের বাগানের সদ্য ফোটা বাতাবী লেবু ফুলের গন্ধে ঘরের বাতাস ভুর্‌ভুর্ করছে, বাগানের পথের পাশের সজনে গাছগুলো ফুলে ভর্ত্তি।...পড়ন্ত রোদ ঝির্‌ঝিরে বাতাসে পেয়ারা গাছের সাদা ডালগুলো বুটি-কাটা রাংতার সাজে মুড়ে দিয়েছে।...

উমারাণী কাজে গিয়েছে, এখন আর আসবে না ভেবে মাঠের দিকে বেড়াতে যাবার ইচ্ছে হ'ল। উঠতে গিয়ে লক্ষ্য করলুম খাটের পাশে একটা কাঠের হাত বাক্স রয়েছে, সেটা অনেক কালের, রং-ওঠা, তাতে চাবির কলটাও নেই। সেই কাঠের বাক্সটার ডালা খুললুম। দেখি তার মধ্যে

কতকগুলো টাট্কা-তোলা লেবু ফুল, কতকগুলো গাঁদা ফুল, আর কতকগুলো আধ শুকনো ঘেঁটু ফুল। ফুলগুলোর তলায় একটু আধ-ময়লা নেকড়ায় যত্ন ক'রে জড়ানো কি জিনিষ। নেকড়ায় এমন কি জিনিষ যার সঙ্গে এতগুলো ফুলের কার্য্যকারণ সম্পর্ক, এই নির্ণয় করতে কৌতূহলবশতঃ নেকড়ার ভাঁজ খুলে ফেলে দেখলুম তার মধ্যে খানকতক খামের চিঠি। চিঠিগুলোর ওপর উমারাণীর নামে ঠিকানা লেখা, হাতের লেখা আমার ভগ্নীপতি সুরেনের। তার পোষ্ট অফিসের মোহর দেখে বুঝলুম চিঠিগুলো পাঁচ-ছয় বছরের পুরানো, একখানা কেবল এক বছর আগে লেখা।

কৃপণের ধনের মত উমারাণী যার পুরোনো চিঠিগুলো এমন সযত্নে রক্ষা করছে, তার মধুর হৃদয়ের স্নেহচ্ছায়া-গহন যুথীবনে যার স্মৃতির নীরব আরতি এমনি দিনের পর দিন প্রতি সকাল-সাঁঝে চলছে, কেমন সে অভাগা দেবতা, যে এ উপাসনা মন্দিরের ধূপ-গন্ধকে এড়িয়ে চিরদিন বাইরে বাইরেই ফিরতে লাগল !...

মাঠ থেকে বেড়িয়ে যখন আসি, তখন সন্ধ্যা হ'য়ে গিয়েছে, ওদের রান্না-ঘরে আলো জ্বলছে। আমার পায়ের শব্দ শুনে উমারাণী বললে—দাদা এলেন ?...আমি উত্তর দেবার পূর্ব্বেই সে হাসিমুখে রান্নাঘর থেকে বার হ'য়ে এল। বললে—দাদা বুঝি আমাদের দেশ বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন ? কোন্ দিক বেড়িয়ে এলেন, নদীর ধারে বুঝি ? তারপর সে বললে—দাদা, আপনি রান্নাঘরে বসবেন ? আমি আপনার জন্যে পিঁড়ি পেতে রেখেছি।

পিসিমা বললেন—বৌমার যত অনাছিষ্টি, এখানে বাছাকে ধোঁয়ার মধ্যে বসিয়ে রাখা।

আমি বললুম—আমার কোন কষ্ট হবে না, এখানেই বসি পিসিমা।

রান্নাঘরের মধ্যে গিয়ে বসলুম। উমারাণী খাবার তৈরী ক'রে রেখেছিল আমায় খেতে দিল, তারপর কাজ করতে ব'সে গেল। দেখলুম সে অনেক-গুলো চালের গুঁড়ো ময়দা ইত্যাদি উপকরণ নিয়ে খুব উৎসাহের সঙ্গে পিঠে তৈরী সুরু করেছে। পিসিমা খুবই বৃদ্ধা, তিনি কাজকর্ম্ম বিশেষ কিছু করতে পারেন না। খাটতে সবটাই হচ্ছিল উমারাণীর। রোগা মেয়েটির অবস্থা

দেখে বড় কষ্ট হ'ল, ভাবলুম কেন অনর্থক পিঠে করতে ব'সে মিথ্যে কষ্ট পাওয়া? সেবার আনন্দে উমারাণী যা করতে বসেছে তার বিরুদ্ধে কোন কথা বললুম না অবশ্য।

জিজ্ঞাসা করলুম—রাণী, আমায় পিঠে গড়তে শিখিয়ে দেবি?

উমারাণীর বড় লজ্জা হ'ল। মুখটি নীচু ক'রে সে বললে—দাদা আমরা বেঁচে থাকতে পিঠে খাওয়ার ইচ্ছে হ'লে আপনাকে কি পিঠে গ'ড়ে নিতে হ'বে যে আপনি পিঠে গড়তে শিখবেন?

পিসিমা বললেন—না, তোমার দাদার পিঠে খাবার ইচ্ছে হ'লে এই সাত লঙ্কা পাড়ি দিয়ে এসে তোমার এখানে খেয়ে যাবেন!

উমারাণী চুপ ক'রে রইল।

আমি বললুম—তা কেন, পিসিমা। ও তার আর এক উপায় বার করেছে, শোনেন নি বুঝি?

পিসিমা বললেন—কি বাবা?

আমি বললুম—ও এই আষাঢ় মাসের মধ্যেই ওর দাদার বিয়ে দেবে।

পিসিমা বললেন—তা বৌমা তো ঠিক কথাই বলেছে বাবা। এত বড়টি হয়েছো, আর কি বিয়ে না করা ভাল দেখায়? সংসারী হ'তে হবে তো।

উমারাণী বলে উঠল—ভাল কথা দাদা। দিন তখনতো আর দেখা হ'ল না পাঁজিতে, আমি আর ওপরে যেতে পারলুম না। অবিশ্যি ক'রে বলবেন খাওয়ার পর রাত্রে।

আমি বললুম—বলব রে বলব। এতদিন তো মনে ছিল না তোর, এখন সামনে পেয়ে বুঝি দাদার ওপর ভারি মায়া।

পিসিমা বললেন—ও তোমার তেমন পাগলী বোন নয় বাবা। সে কথা বুঝি বৌমা বলেনি তোমায়। আজ তিন চার বছর হ'ল, ওরা যখন প্রথম কলকাতা থেকে এখানে আসে, তখন বৌমা এক জোড়া পশমের জুতো বুনে রেখেছে তোমার জন্যে। বলে, দাদা দুঃখু করেছেন যে আমার বোন আমার জুতো বুনে দেবার জন্যে উলবোনা শেখে, প্রথম কিনা জুতো বুনলো তার স্বামীর। তা আমি এবার দাদাকে পশমের জুতো পরাব। তারপর

ওদের আর কলকাতায় যাওয়া হ'ল না, সুরেনের অন্য জায়গায় চাকরি হ'ল। তুমিও আর কখনো এদিকে আসোনি। কাল তুমি আসতেই বৌমার যে আহ্লাদ! আমায় বললে—পিসিমা, আমার সাধ এইবার পুরলো, এতদিন পরে দাদাকে পশমের জুতো পরাতে পারব।

উমারাণীর চোখ দুটি লজ্জায় নীচু হ'য়ে রইল, প্রদীপের আলোয় উজ্জল তার মুখখানি কিশোরীর মুখের মতন এমন লাবণ্যমাখা অথচ কচি মনে হচ্ছিল, যে, বোধ হ'ল নোলক পরলে তাকে এখনও বেশ মানায়।

তারপর নানা কথায় আর খাওয়া শেষ হ'তে অনেক রাত হ'য়ে গেল। সেদিন অনেক রাত্রে যখন ওপরের ঘরে শুতে গেলুম, তখন চাঁদ উঠেছে। গভীর রাতের মৌন শান্তি সেদিন বড় করুণ হয়ে বাজল আমার মনে। আজ অনেকক্ষণ উমারাণীর নিকট ব'সে থেকে একটা জিনিষ বেশ বুঝতে পেরেছি —উমারাণীর থাইসিস্ হয়েছে।

মৃত্যু ওর শান্ত ললাটে তার তিলক পরিয়ে ওরে বরণ ক'রে রেখেছে, শীগ্‌গির ওকে বেরিয়ে পড়তে হবে অনন্তের পথের তীর্থ যাত্রায়।···

উমারাণী এক গ্লাস জল দিতে আমার ঘরে ঢুকল। জল নামিয়ে রেখে বললে—কৈ দাদ, সে পাঁজিখানা?

তার মুখখানির দিকে চেয়ে বড় মন-কেমন ক'রে উঠল! বললুম—রাণী এদিকে আয়।···একথা আমার মনে উঠল না যে উমারাণী আমার আপন বোন নয় বা আমাদের দু'জনেরই বয়স কম। আমিও যেমন নিঃসঙ্কোচে বললুম, সেও তেমনি নিঃসঙ্কোচে এসে আমার পায়ের কাছে খাটের নীচে মাটিতে ব'সে পড়ল। আট বছর আগের মত আজও ওকে আদর ক'রে তার বিদ্রোহী চুলগুলো কানের পাশ দিয়ে তুলে দিতে দিতে বললুম—রাণী, জুতোর কথা কে বলেছিল রে তোকে?

উমারাণী অসীম নির্ভরতার সঙ্গে ছোট্ট মেয়েটির মত খাট থেকে ঝোলানো আমার পায়ের ওপর তার মুখটি লুকিয়ে রাখলে।···ওরে, স্নেহ যদি রোগ সারানোর ওষুধ হ'ত, তাহলে আমি বড় ভাইয়ের স্নেহ তোকে শিশি ভ'রে দাগ কেটে ডাক্তারী ওষুধের মত দিয়ে যেতুম।

আমার প্রশ্নের কোন উত্তর তার কাছ থেকে পেলুম না। কেন না, তাও একটু পরেই বুঝলুম। একমাত্র লোক যে ঐ জুতোর কথা জানে বা যার কাছে আমি এক সময় এ কথা বলেছিলুম, সে হচ্ছে—সুরেন। সুরেনই বোধ হয় বিয়ের পর কোন সময় উমারাণীকে এ কথা বলে থাকবে। বড় ভাইয়ের কাছে ছোট বোনটি তো আর সে কথা বলতে পারে না।

বললুম—রাণী, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি! টুনি বলছিল—মানে, সুরেন কি ঠিক চিঠিপত্র দেয়? বাড়ীটাড়ী আসে?

উমারাণী বড্ড জড়সড় হয়ে গেল। আমার কথার কোন উত্তর দিলে না, মুখও তুলে নিলে না, আগের মত আমার পায়ের ওপর মুখটি লুকিয়ে চুপ ক'রে রইল।

অনেকক্ষণ কেটে গেল, তারপব বুঝলুম সে কাঁদছে।...

তাকে সান্ত্বনা কি ব'লে দেব ঠিক বুঝতে পারলুম না, শুধু তার মাথার চুলগুলোর ওপর পরম স্নেহে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলুম। বেশীদিন না রে, সোনার বোনটি, বেশীদিন না। তোর মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে।

ব্যর্থ নারী-হৃদয়ের রুদ্ধ আবেগ পরম নির্ভরতার সঙ্গে তার দাদার বুকে নিঃশেষে ঢেলে দিয়ে যখন সে নীচে শুতে নেমে গেল, চাঁদের আলোর তলায় ঘুমন্ত বাতাস সজনে ফুলের মিষ্টি গন্ধে তখন স্বপ্ন দেখছে।

এর দু'তিন দিন পরে তাদের ওখান থেকে চ'লে আসবার জন্যে প্রস্তুত হলাম। এর আগেই চ'লে আসতুম, কলকাতায় অনেক কাজ ছিল আমার, কিন্তু উমারাণীর করুণ মিনতি এড়াতে না পেরে কিছু দেরী হ'য়ে গেল।

কাপড় প'রে তৈরী হয়েছি, উমারাণী কাঁদো-কাঁদো মুখে নিকটে এসে দাঁড়াল। আমায় বললে—আবার কবে আসবেন দাদা?

বললুম—আসব রে, আবার পূজোর সময় আসব।

সে বললে—সে যে অনেকদিন! না দাদা আপনি আষাঢ় মাসে রথের সময় আসবেন। আমাদের এখানে রথের বড় জাঁকজমক হয় দাদা। আর, আমি কিন্তু আপনার বিয়ে দেবই এই বছরে, লক্ষ্মী দাদামণি, আপনার পায়ে পড়ি—আপনি অমত করবেন না।

তারপর সে সেই পশমের জুতো জোড়া বের ক'রে আমার সামনে মাটিতে রাখলে; বললে—আমি আন্দাজে বুঝেছি, আপনি পায়ে দিয়ে দেখুন দেখি দাদা, হবে এখন বোধ হয়।

জুতো জোড়াটা পায়ে ঠিক হয়েছে দেখে উমারাণী বড় খুসী হ'ল, তা'র সমস্ত মুখখানা সার্থকতার আনন্দে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল।

তারপর সে আবার বললে—দাদা, আমি আপনার গরীব বোন, কখন আসেন না এখানে, যদি বা এলেন, না পারলুম ভাল ক'রে খাওয়াতে দাওয়াতে, না পারলুম আদর যত্ন করতে। এসে শুধু কষ্টই পেলেন, কি করব আমার যেমন কপাল!

অনেকদিন আগের মত সেই রকম গলায় আঁচল দিয়ে সে আমায় প্রণাম করলে, তার চোখের জল আমার পায়ের ওপর টপ্ টপ্ ক'রে ঝ'রে পড়তে লাগল।

আমি তাকে উঠিয়ে তার মাথার হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললুল—রাণী, তুই আমার মায়ের পেটের বোনই। একথা ভুলে যাসনে কখনো যে তোর বড় ভাই এখনও বেঁচে আছে।

যখন চ'লে আসি তখন সে তাদের বাইরের বাড়ীর দোর ধ'রে দাঁড়িয়ে রইল, আসতে আসতে পেছন ফিরে দেখলুম সে কাতর চোখে একদৃষ্টে চেয়ে আছে।

যখন পথের বাঁক ফিরেছি, তখনও তাকে দেখা যাচ্ছিল, বেলাশেষের হলদে রোদ সুপারি গাছের সারির ফাঁক দিয়ে তার রুক্ষ কোঁকড়া চুলে ঘেরা বিষণ্ণ মুখখানির ওপর গিয়ে পড়েছিল।...

বছরখানেক পরে আমি আবার চাকরি নিয়ে গেলুম ময়ূরভঞ্জ রাজস্টেটে। সেখানে থাকতে সুরেনের এক পত্রে জানলুম উমারাণী মারা গিয়েছে।

যাবেই, তা জানতুম। সেবার যখন তার কাছ থেকে চ'লে আসি তখনই বুঝে এসেছিলুম, এই তার সঙ্গে শেষ দেখা। সুরেনকে এসে পত্র লিখেছিলুম উমারাণীর অবস্থা সব খুলে, কোন একটা ভাল জায়গায় তাকে

কিছুদিন নিয়ে যেতে। সুরেন লিখেছিল, জমিদারের কাজ আদায় পত্র হাতে, পূজোর সময় বরং দেখবে, এখন যাবার কোন উপায় নেই ইত্যাদি। উমারাণী মারা গেল সেই ভাদ্র মাসে।

তারপর আরও বছর খানেক কেটে গেল। সেবার কিছুদিন ছুটি নিয়ে কলকাতা এসে দেখলুম ওদের সেই বাড়ীতে ওরা আবার বাস করছে। আমি এসেছি শুনে টুনি দেখা করতে এল। খানিক একথা-সেকথার পর টুনি কাগজে-মোড়া একটা কি আমার হাতে দিল, খুলে দেখি মেয়েদের মাথায় দেবার কতকগুলো রূপোর কাঁটা।

টুনি বললে—বৌদি যে ভাদ্র মাসে মারা যায়, আমি সেই শ্রাবণ মাসে চাঁপাপুকুর গিয়েছিলুম। বৌদি আপনার কত গল্প করলে, বললে—মায়ের পেটের ভাই যে কি জিনিষ ঠাকুরঝি, তা আমি দাদাকে দিয়ে বুঝেছি। আমার বড় ইচ্ছে আমি দাদার বিয়ে দিয়ে তাঁকে সংসারী ক'রে দেব। দাদা আমার ভেসে ভেসে বেড়ান কেউ একটু যত্ন করবার নেই, ওতে আমার বড় কষ্ট হয়। ওই রূপোর কাঁটাগুলো সে গড়িয়ে ছিল আপনার বিয়ে হলে আপনার বৌকে দেবার জন্যে। সে আষাঢ় মাসে ওগুলো গড়িয়েছিল, আমি গেলে আমায় দেখিয়ে বললে—ইচ্ছে ছিল সোনার চিরুণী দিয়ে দাদার বৌয়ের মুখ দেখব কিন্তু এখন এত পয়সা কোথায় পাব, এই বছরেই দাদার বিয়ে না দিলে নয়। বিয়ে হোক, তারপর চেষ্টা ক'রে গড়িয়ে দেব। কাঁটা ওর বাক্সে তোলা ছিল, তারপর ভাদ্র মাসে বৌদি মারা গেল, আমি তার বাক্স থেকে কাঁটাগুলো বের ক'রে এনেছিলাম আপনাকে দেব ব'লে। কোথায় পয়সা পাবে, সারা বছর জমিয়ে যা করেছিল তাতেই ঐগুলো গড়িয়েছিল। দাদা তো এক পয়সাও তার হাতে দিতেন না, সংসার খরচ ব'লে যা দিতেন তাতে সংসার চলাই ভার, তা তো আপনি একবার গিয়ে দেখেই এসেছিলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—তাহ'লে তার হাতে পয়সা জমল কোথা থেকে?

টুনি বললে—বৌদি বাজারের খাবার বড় ভালবাসত। ওরা পশ্চিমে

থাকত, সেখানে ওসব বোধহয় তেমন মেলে না, সেই জন্যে ঐ বাজারের কচুরী নিমকির ওপর তার কেমন ছেলেমানুষের মত একটা লোভ ছিল। বৌদি করত কি, নারকেল পাতা চেঁচে ঝাঁটার কাটি ক'রে রাখত, লোকে পয়সা দিয়ে তা কিনে নিয়ে যেত। এই রকম ক'রে যে পয়সা পেত, তাই দিয়ে গোপালনগরের হাট থেকে পাড়ার ছেলে-পিলেদের দিয়ে খাবার আনাত, নিজে খেত, তাদের দিত। আপনি সেবার চ'লে আসবার পর থেকে সেই পয়সা'য় আর খাবার না খেয়ে তাই জমিয়ে জমিয়ে ঐ রূপোর ঝাঁটাগুলো গড়িয়েছিল।

আমি বললুম—সে মারা গেল কোন সময়ে?

টুনি বললে—শেষ রাত্রে, প্রায় রাত চারটের সময়। রাত্রে বৌদির ভয়ানক জ্বর হ'ল, সেই জ্বরে একেবারে বেহুঁস হ'য়ে গেল। তার পরদিন বিকালবেলা আমি ওর বিছানার পাশে ব'সে আছি, দেখি বৌদি বালিশের এপাশ ওপাশ হাতড়াচ্ছে, কি যেন খুঁজছে। আমি বললুম—বৌদি লক্ষীটি, ও রকম করছ কেন? তখন তার ভাল জ্ঞান নেই, যেন আচ্ছন্ন মত। বললে, আমার চিঠিগুলো কোথায় গেল, আমার সেই চিঠিগুলো? ব'লে আবার বিছানা হাতড়াতে লাগল। দাদা বিয়ের পর প্রথম প্রথম যেসব চিঠি তাকে লিখেছিলেন, সে সেগুলো যত্ন ক'রে ওর বাক্সে তুলে রেখেছিল, আমি তা জানতুম। আমি সেগুলো বাক্স থেকে বের ক'রে নিয়ে এসে তার আঁচলে বেঁধে দিলুম—তখন থামে। তারপর সেই রাত্রেই সে মারা গেল। যখন তাকে বার ক'রে নিয়ে গেল তখনও তার আঁচলে সেই চিঠিগুলো বাঁধা।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—সুরেন সে সময় ছিল না?

টুনি বললে—ছোড়দাকে টেলিগ্রাম করা হয়েছিল, তিনি যখন এসে পৌঁছুলেন, তখন বৌদিকে দাহ করা হয়ে গিয়েছে।···

অনেক বছর হয়ে গিয়েছে।

এখনও শীতের অবসানে যখন আবার বাতাবী-লেবুর ফুল ফোটে,

সজনে-তলায় ফুল কুড়োবার ধুম প'ড়ে যায়, পাড়াগাঁয়ের বন ঝোপ ঘেঁটু ফুলে আলো ক'রে রাখে, পুকুরের জলে কাঞ্চন-ফুলের রাঙা ছায়া পড়ে, ফাগুন দুপুরের আবেশ বিভোর রোদ আকাশে-বাতাসে থর্ থর্ ক'রে কাঁপতে থাকে, তখন আপন মনে ভাবতে ভাবতে কার কথা যেন মনে পড়ে যায়···মনে হয় কে যেন অনেক দূর থেকে এলোমেলো-চুলে ঘেরা কাতর মুখে একদৃষ্টে চেয়ে আছে···তখন মন বড় কেমন ক'রে ওঠে, হঠাৎ যেন চোখে জল এসে পড়ে···

ষষ্ঠী-চণ্ডীর মাঠ

গ্রামের বাঁওড়ের মধ্যে নৌকা ঢুকেই জল-ঝাঁঝির দামে আটকে গেল।

কানুনগো হেমেনবাবু বললেন—বাব্‌লা গাছটার গায়ে কাছি জড়িয়ে বেঁধে নাও···

বাইরের নদীতে ভাঁটার টান ধরেছে, নাটা-কাঁটার ঝোপের নীচের জল স'রে গিয়ে একটু একটু ক'রে কাদা বার হচ্ছে।

হেমেনবাবু বললেন—একটুখানি নেমে দেখবেন না কোথায় পিন ফেলা হয়েছে? যত শীগগির খানাপুরীটা শেষ হয়ে যায়···

এমন সুন্দর বিকালটাতে আর কাজ করতে ইচ্ছা হ'ল না। পিছনের নৌকো থেকে লোকজনেরা নেমে জায়গা ঠিক ক'রে সেখানে তাঁবু ফেলবে। জরিপের বড় সাহেবের শীগগির সদর থেকে আসবার কথা আছে, কাজেই যত তাড়াতাড়ি কাজ আরম্ভ হয়, সকলেরই সেই দিকে ঝোঁক। সাব ডেপুটী নৃপেনবাবু কাজ শেখবার জন্যে এইবার প্রথম খানাপুরীর কাজে এসেছিলেন। বয়স বেশী না, ছোকরা—কিন্তু মাঝনদীতে নৌকা দুললেই তাঁর অত্যন্ত ভয় হচ্ছিল। বোধহয় ভয়কে ফাঁকি দেবার জন্যেই তিনি এতক্ষণ ছই-এর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়বার ভান ক'রে শুয়েছিলেন—এবার ডাঙায় নৌকো লাগাতে তিনি ছই-এর ভেতর থেকে বার হ'য়ে এলেন এবং একটু পরে হেমেনবাবুর সঙ্গে কথায় কথায় কি নিয়ে বেশ একটু তর্ক সুরু করলেন।

নৃপেনবাবুকে বললুম—Tenancy Act-এর কচ্‌কচিতে আর দরকার নেই, তার চেয়ে বরং চলুন নেমে তাঁবুর জায়গাটা ঠিক করা যাক—কাল সকালেই যাতে কাজ আরম্ভ করা যায়···

চৈত্র মাস যায় যায়। গ্রাম্য-নদীটির দু'পাড় ভ'রে সবুজ সবুজ লতানে গাছে নীল-পাপড়ি বন-অপরাজিতা ফুল ফুটে আছে। বাঁশ-ঝাড় কোথাও জলের ধারে নত হয়ে পড়েছে, তলায় আকন্দ ঘেঁটু ফুলের বন ফুলের ডালি মাথায় নিয়ে ঝিরঝিরে বাতাসে মাথা দোলাচ্ছে। দু'ধারের রোদ-পোড়া

কটা ঘাস-ওয়ালা মাঠের মাঝে মাঝে পত্র-বিরল বাব্‌লা গাছে গাঙ্‌-শালিকের ঝাঁক কিচ্‌ কিচ্‌ কচ্ছে—নদীর বাঁ পাড়ের গায়ে গর্ত্তের মধ্যে তাদের বাসা। মাকাল-লতার ঝোপের তলায় জলের ধারে কোথাও উঁচু উঁচু বন মূলোর ঝাড়, তাদের কুচো কুচো হলদে ফুল থেকে জায়ফলের মত একটা ঘন গন্ধ উঠছে।...

বেলা আর একটু পড়লে আমরা সেই বাঁওড়ের ধারের মাঠে তাঁবুর জায়গা কোথায় ঠিক হ'বে দেখতে গেলুম। নদীর ধার থেকে গ্রাম একটু দূর হ'লেও গ্রামের মেয়েরা নদীতেই জল নিতে আসে। আমাদের যেখানে নৌকাখানা বাঁধা হয়েছিল, তার বাঁ-ধারে খানিকটা দূরে মাটিতে ধাপ কাটা কাঁচা ঘাট। গ্রামের একজন বৃদ্ধ বোধহয় নদীতে গ্রীষ্মের দিনের বৈকালে স্নান করতে আসছিলেন, তাঁকে আমরা জিজ্ঞাসা করলুম—রসুলপুর কোন্ গাঁ খানার নাম মশাই—সামনের এটা, না ওই পাশে?

তিনি বললেন—আজ্ঞে না, এটা হ'ল কুমুরে, পাশের ওটা আমডাঙ্গা—রসুলপুর হল এ গাঁ-গুলোর পেছনে, কোশ দুই তফাৎ—আপনারা?

আমাদের পরিচয় শুনে বৃদ্ধ বললেন—এই মাঠটাতেই আপনারা তাঁবু ফেলবেন?...আপনাদের জরিপের কাজ শেষ হ'তেও তো পাঁচ ছয় মাস...

আমরা বললুম—তা তো হবেই, বরং তার বেশী....

বৃদ্ধ বললেন—এখানটা একটা ঠাকুরের স্থান, গাঁয়ের মেয়েরা পূজো দিতে আসে, বরং আর একটু স'রে গিয়ে নদীর মুখের দিকে তাঁবু ফেলুন, নৈলে মেয়েদের একটু অসুবিধে...

বৃদ্ধের নাম ভুবন চক্রবর্ত্তী। জরিপ আরম্ভ হ'য়ে গেলে নিজের দরকারে চক্রবর্ত্তী মশায় দলিল-পত্র বগলে অনেকবার তাঁবুতে যাতায়াত সুরু ক'রে দিলেন, সকলের সঙ্গে তাঁর বেশ মেশামেশি ও আলাপ পরিচয় হ'য়ে গেল। তাঁর পৈতৃক জমা-জমি অনেকে নাকি ফাঁকি দিয়ে দখল করছে, আমাদের সাহায্যে এবার যদি সেগুলোর একটা গতি হয়—এই সব ধরণের কথা তিনি আমাদের প্রায়ই শোনাতেন।

আমি সেখানে বেশীদিন ছিলুম না। থানাপুরীর কাজ আরম্ভ হ'য়ে গিয়েছে, আমি সেদিনই জেলায় ফিরব—জোয়ারের অপেক্ষায় নৌকা ছাড়তে দেরী হ'তে লাগল। চক্রবর্ত্তী মশায়ও সেদিন উপস্থিত ছিলেন। কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলুম—এটাকে বউ-চণ্ডীর মাঠ বলে কেন চক্কত্তি মশায়?....আপনাদের কি কোন...

নৃপেনবাবুও বললেন—ভাল কথা, বলুন তো চক্কত্তি মশাই, বউ-চণ্ডী আবার কি কথা—শুনিনি তো কখনো!

আমাদের প্রশ্নের উত্তরে চক্রবর্ত্তী মশায়ের মুখে একটা অদ্ভুত গল্প শুনলুম। তিনি বলতে লাগলেন—শুনুন তবে, এটা সেকেলের গল্প। ছেলেবেলায় আমার ঠাকুরমার কাছে থেকে শোনা। এ অঞ্চলের অনেক প্রাচীন লোকে এ গল্প জানে।

সেকালে এ গ্রামে এক ঘর সম্পন্ন গৃহস্থ বাস করতেন। এখন আর তাদের কেউ নেই, তবে আমি যে সময়ের কথা বলছি সে সময় তাঁদের বড়সরিক পতিতপাবন চৌধুরী মহাশয়ের খুব নামডাক ছিল।

এই পতিতপাবন চৌধুরী মহাশয় যখন তৃতীয় পক্ষের বিয়ে ক'রে বউ ঘরে আনলেন, তখন তার বয়স পঞ্চাশ পার হ'য়ে গিয়েছে। এমন যে বিশেষ বয়স তা নয়, বিশেষতঃ ভোগের শরীর—পঞ্চাশ বছর বয়স হ'লেও চৌধুরী মহাশয়কে বয়সের তুলনায় অনেক ছোট দেখাত।...বউ দেখে বাড়ীর সকলেই খুব সন্তুষ্ট হ'ল। তৃতীয় পক্ষের বিয়ে ব'লে চৌধুরী মশায় একটু ডাগর মেয়ে দেখেই বিয়ে করেছিলেন, নতুন বউয়ের বয়স ছিল প্রায় সতেরোর কাছাকাছি। বউয়ের মুখের গড়নটি বড় সুন্দর, মুখের ছাঁচ যেন হরতনের টেক্কাটির মত। চোখ দুটি বেশ ডাগর, ভাসা ভাসা মুখে চোখে ভারি একটা শান্ত ভাব। নতুন বউয়ের কাজ-কর্ম্ম আর ধীর শান্ত ভাব দেখে পাড়ার লোকে বললে, এ রকম বউ এ গাঁয়ে আর আসেনি। সে মাটির দিকে চোখ-রেখে ছাড়া কথা বলে না, অল্প বয়সের খুড়-শাশুড়ী

দজের সামনেও ঘোমটা দেয়; সকলে বললে যেমন লক্ষ্মীর মত রূপ তেমনই গুণ।

মাস-দুই-তিন পরে কিন্তু একটা বড় বিপদ ঘটল। সকলে দেখলে বৌটির আর সব ভাল বটে, একটা কিন্তু বড় দোষ। সে কিছুতেই স্বামীর ঘেঁস নিতে চায় না, প্রাণপণে এড়িয়ে চলতে চায়।....প্রথম প্রথম সকলে ভেবেছিল, নতুন বিয়ে হয়েছে, ছেলেমানুষ, বোধহয় সেই জন্যেই এ রকম করে! ক্রমে কিন্তু দেখা গেল, স্বামী কেন, যে কোন পুরুষ মানুষ দেখলেই সে কেমন যেন ভয়ে কাঁপে। বাড়ীতে যেদিন যজ্ঞি কি কোন বড় কাজ-কর্ম্মে বাইরের লোকের ভিড় হয়, সে দিন সে ঘর থেকে আর বারই হয় না। স্বামীর ঘরে কিছুতেই তো-যেতে রাজী হয় না, মাসে দু'দিন কি একদিন সকলে আদর ক'রে গায়ে হাত বুলিয়ে পাঠাতে যায়—সে জনে-জনের পায়ে প'ড়ে, এর-ওর কাছে কাকুতি মিনতি ক'রে, কিছুতেই বুঝ মানে না। পুরুষ মানুষের গলার স্বর শুনলেই কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে পড়ে!

অনেক ক'রে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সকলে তাকে একদিন স্বামীর ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে দোরে শিকল বন্ধ ক'রে দিলে। চৌধুরী মশায় অনেক রাত্রে ঘরে ঢুকে দেখেন তাঁর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী ঘরের এক কোণে জড়সড় হ'য়ে দাঁড়িয়ে ভয়ে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছে। এর পর আর কিছুতেই কোনো দিন সে স্বামীর ঘরে যেতে চাইত না, বাড়ী সুদ্ধ লোকের হাতে পায়ে প'ড়ে বেড়াতে লাগল; সকলকে বলে—আমার বড্ড ভয় ক'রে, আমায় ওরকম ক'রে আর আর পাঠিও না....তোমাদের পায়ে পড়ি।....

বোঝাতে বোঝাতে বাড়ীর লোকে হয়রান হ'য়ে গেল।

দিনকতক গেল, একদিন তাকে সকলে মিলে জোর ক'রে স্বামীর ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে বার থেকে দোর বন্ধ ক'রে দিলে। তারা ঠিক করলে এই রকম দিতে দিতে ক্রমে লজ্জা ভাঙবে—নৈলে কতদিন আর এ ন্যাকামি ভাল লাগে?...ভোরে উঠে সকলে দেখলে ঘরের মধ্যে বউ নেই, বাড়ীর কোথাও নেই। নিকটেই বাপের বাড়ীর গাঁ, সেখানে পালিয়ে গিয়েছে ভেবে লোক পাঠানো গেল। লোক ফিরে এল, সে সেখানে যায় নি। তখন

সকলে বললে—পুকুরে ডুবে মরেছে। পুকুরে জাল ফেলা হয়, কোন সন্ধান মেলে না। বউয়ের কচি মুখের ও নিরীহ চোখের ভাব মনে হ'য়ে লোকের মনে অন্য কোন সন্দেহ জাগবার অবকাশ পেল না। কত দিকে কত সন্ধান ক'রে যখন কোন খোঁজই মিলল না, চৌধুরী মশায় মানসিক শোক নিবারণ করবার জন্যে চতুর্থ পক্ষের স্ত্রী ঘরে আনলেন।

অজ পাড়া-গাঁ, নতুন কিছু একটা বড় ঘটে না, অনেকদিন এটা নিয়ে নাড়াচাড়া চলল। তারপর ক্রমে সেটা কেটে গিয়ে গ্রাম ঠাণ্ডা হ'ল। এই মাঠের পুবধারে গ্রামের মধ্যেই চৌধুরীদের বাড়ী ছিল। তখন এইখান দিয়েই নদীর স্রোত বইত—ম'জে বাঁওড় হয়ে গিয়েছে তো সেদিন, আমরা ছেলেবেলাতেও ধান-বোঝাই নৌকা চলাচল হ'তে দেখেছি। ক্রমে চৌধুরী-দের সব ম'রে হেজে গেল, শেষ পর্য্যন্ত বংশে একজন কে ছিল, উঠে গিয়ে অন্য কোথাও বাস করলে। এ সব অনেক বছর আগেকার কথা, সত্তর আশী বছর খুব হবে। সেই থেকে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এই সব মাঠে বড় এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে শোনা যায়।

এই ফাল্গুন চৈত্র মাসে যখন খুব গরম পড়ে, তখন রাখালেরা গরু চরাতে এসে দূর থেকে কতদিন দেখেছে, মাঠের ধারে বনের মধ্যে নিভৃত দুপুরে বাঁশবনের ছায়ায় কে যেন শুয়ে আছে, কাছে গেলে কেউ কখনো দেখতে পায়নি।...কতদিন সন্ধ্যার সময় তারা গরুর দল নিয়ে গ্রামের মধ্যে যেতে যেতে শুনেছে, অন্ধকার ঝোপের মধ্যে যেন একটা চাপা কান্নার রব উঠছে।... স্নমুখ জ্যোৎস্না-রাত্রে অনেকে নদীর ঘাট থেকে ফেরবার পথে ছাতিম গাছের নীচু ডালের তলা দিয়ে যেতে যেতে দেখেছে, দূর মাঠে সন্ধ্যার আব্‌ছায়া জ্যোৎস্নার মধ্য দিয়ে সাদা কাপড় প'রে কে যেন ক্রমেই দূরে চ'লে যাচ্ছে —তার সমস্ত গায়ের সাদা কাপড়ে জ্যোৎস্না প'ড়ে চিক্‌মিক্ করতে থাকে। ...মাঠে যখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে, তখন ফুলেভরা নাগকেশর গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ভাল ক'রে দেখলে মনে হয়, কে খানিকটা আগে এইখানে দাঁড়িয়ে ডাল নীচু ক'রে ফুল পেড়ে নিয়ে গিয়েছে...তার ছোট ছোট পায়ের দাগ, ঝোপ যেখানে বড় ঘন সেদিকেই চ'লে গিয়েছে।...

মাঠের ধারে ঐই ছাতিম গাছের তলায় উলো-চণ্ডী তলা। চৈত্র সংক্রান্তিতে গ্রাম-বধূরা পিঠে, কাঁচা দুধ আর নতুন আখের গুড় নিয়ে বউ-চণ্ডীর পূজো দিতে আসে। বউ-চণ্ডী সকলের মঙ্গল করেন, অসুখ হ'লে সারিয়ে দেন, নতুন প্রসূতীর স্তনে দুধ শুকিয়ে গেলে, ওঁর কাছে পূজো দিলে আবার দুধ হয়। কচি ছেলের সর্দ্দি সারে, ছেলে বিদেশে থাকবার সময় চিঠি আসতে দেরী হ'লে পূজো মানত করবার পরই শীগগির সুসংবাদ আসে। মেয়েদের বিপদে-আপদে তিনিই সকলকে বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধার ক'রে থাকেন।...

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের গল্প শেষ হ'ল। তারপর আরও নানা কথাবার্ত্তার পর তিনি ও আর সকলে উঠে চ'লে গেলেন।

বেলা বেশ প'ড়ে এসেছে। সন্ধ্যার বাতাসে ছাতিম বনে স্থর্ স্থর্ শব্দ হচ্ছে। গ্রামের মাঠটা অনেকদূর পর্য্যন্ত উঁচু-নীচু ঢিবি আর ঘেঁটু ফুলের বনে একেবারে ভরা। বাঁদিকে খানিক দূরে একটা পুরোনো ইটের পাঁজার খানিকটা ঘন জিউলি গাছের সারির মধ্য দিয়ে চোখে পড়ে।

নৌকার গলুই-এ ব'সে আসন্ন সন্ধ্যায় আশী বছর আগেকার পলাতকা গ্রাম্যবধূর ইতিহাসটা ভাবতে লাগলুম। মাঠের মাঝে উঁচু ঢিবির ওপরকার ঘেঁটু ফুলের ঘন বনের দিকে চেয়ে মনে হ'ল যে—সারা দিনমান সে হয়ত ওর মধ্যে লুকিয়ে ব'সে থাকে, কেবল গভীর রাত্রে লুকোনো জায়গা থেকে বেরিয়ে আসে মাঠের মধ্যের বটগাছের তলায় চুপ ক'রে ব'সে আকাশের তারার দিকে চায়।...পাশের ঝোপের ফুটন্ত বন-অপরাজিতা ফুলের রংএর সঙ্গে রং মিলিয়ে নদী ব'য়ে যায়...ছাতিম বনের পাখিরা ঘুমের ঘোরে গান গেয়ে ওঠে—ওপার থেকে হু হু ক'রে হাওয়া বয়...সে ভয়ে ভয়ে মাঝে মাঝে পূব দিকে চেয়ে দেখে ভোরের আলো ফোটবার দেরী কত!...

সন্ধ্যা হ'য়ে গেল। বনের ওপর নবমীর চাঁদ উঠল। একটু পরেই জোয়ার পেয়ে আমাদের নৌকো ছাড়া হ'ল। জলের ধারের আঁধার-ভরা নিভৃত

ঝোপের মধ্য থেকে সত্যিই যেন একটা চাপা কান্নার রব পাওয়া যাচ্ছিল—সেটা হয়ত কোন রাত-জাগা বনের পাখির, কি কোন পতঙ্গের ডাক।

বাঁওড়ের মুখ পার হ'য়ে যখন আমরা বাইরের নদীতে এসে পড়েছি, তখন পিছন ফিরে চেয়ে দেখি নির্জ্জন গ্রামের মাঠে সাদা কুয়াসায় ঘোমটা-দেওয়া ঝাপ্‌সা জ্যোৎস্না রাত্রি অল্পে অল্পে লুকিয়ে চোরের মত আত্মপ্রকাশ করছে, অনেককাল আগেকার সেই লজ্জা কুন্ঠিতা ভীরু পল্লীবধূটির মত !···

কর্ণপুর সংসার ছাড়িয়া বৃন্দাবন যাইতেছিলেন।

সংসারে তাঁহার কেহই ছিল না। স্ত্রী পাঁচ ছয় বছর মারা গিয়াছে, একটি দশ বৎসরের পুত্র ছিল, সেও গত শরৎকালে শারদীয় পূজার অষ্টমীর দিনে হঠাৎ বিসূচিকা রোগে দেহত্যাগ করিয়াছে। সংসারের অন্য বন্ধন কিছুই নাই। বিষয়-সম্পত্তি যাহা ছিল, সেগুলি সব জ্ঞাতি-ভ্রাতাদের দিয়া অত্যন্ত পুরাতন তালপত্রে কয়েকখানি ভক্তি-গ্রন্থ জীর্ণ তসরের পুঁটুলিতে বাঁধিয়া লইয়া কর্ণপুর পদব্রজে বৃন্দাবন যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

কর্ণপুরের জন্মপল্লী অজয় নদের ধারে। তিনি পরম বৈষ্ণবের সন্তান। অজয়ের জলের গৈরিক দুই তীরের বন-তুলসীর মঞ্জরীর ঘ্রাণে কোন্ শৈশবেই তাঁর বৈষ্ণব ধর্ম্মে মানসিক দীক্ষা হয়। তিনি গ্রামের টোলে উত্তমরূপে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। দুই-একটি ছাত্রকে কিছুকাল স্মৃতি ও বৈদ্যকশাস্ত্রও পড়াইয়াছিলেন। ছাত্রেরা দেখিত তাহাদের অধ্যাপক মাঝে মাঝে ঘরে দুয়ার বন্ধ করিয়া সমস্ত দিন কাঁদেন। পাগল বলিয়া অখ্যাতি রটাতে ছাত্রেরা ছাড়িয়া গেল, প্রতিবেশীরা তাচ্ছিল্য করিতে সুরু করিল, তাহার উপর প্রথমে স্ত্রী তৎপরে পুত্রের মৃত্যু। সংসারের উপর কর্ণপুর নিতান্তই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন।

যাইবার সময় জ্ঞাতি ভ্রাতা রসরাজ আসিয়া মায়াকান্না কাঁদিল, গ্রামের এক ব্রাহ্মণ বহুদিন ধরিয়া কর্ণপুরের নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল এবং তাহার পর হইতেই সে তাঁহাকে বাজি-জ্ঞানে শত হস্ত দূরে রাখিয়া চলিয়া আসিতেছিল। আজ যখন সে দেখিল কর্ণপুর সত্য সত্যই বাহির হইয়া যাইতেছেন, ফিরিবার কোন আশঙ্কা নাই, তখন সে আসিয়া মহা পীড়াপীড়ি সুরু করিল—আর কয়েকটা মাস থাকুন, যে করিয়া পারি ঋণটা শোধ করিয়া ফেলি, কারণ ঋণ পাপ ইত্যাদি।...উদারচিত্ত কর্ণপুর এসব কপট প্রবন্ধ বুঝিলেন না। তিনি রসরাজকে তাঁহার প্রার্থনা-মত তাল-দিঘীর পাড়ের

আশুধান্যের, এক টুকরা উৎকৃষ্ট ভূমি দানপত্র করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ অধমর্ণকে বলিলেন—এক কড়া কড়ি আন ভায়া, গ্রহণ করিয়া তোমায় ঋণ মুক্ত করি।

আপনার বলিতে কেহ না থাকায় গ্রাম ছাড়িয়া যাইবার সময় তাঁহার জন্য সত্যকার ভাবনা কেহই ভাবিল না। শৈশব-স্মৃতির প্রথম দিনটি হইতে পরিচিত মাটির চণ্ডী-মণ্ডপ, স্বহস্ত-রোপিত কত ফল-ফুলের গাছ, কত খেলা-ধূলার জন্মভিটার আঙ্গিনা পেছনে ফেলিয়া চলিলেন, ফিরিয়াও চাহিলেন না, শুধু গ্রাম-সীমায় অজয়ের ধারে গিয়া কর্ণপুর একটুখানি দাঁড়াইলেন।···অজয়ের ধারে প্রাচীন শিরীষ গাছের তলে গ্রামের শ্মশান, কয়েকমাস পূর্ব্বে তিনি মাতৃহীন বালক পুত্রটিকে এইখানে দাহ করিয়া গিয়াছেন। অজয় আর বাড়ে নাই, সুতরাং সে চিতার চিহ্ন এখনও একেবারে বিলীন হয় নাই। তার কচিমুখের অবোধ হাসিটুকু মনে পড়িয়া গেল, মৃত্যুর পূর্ব্বে শ্বাসকষ্টে বড় যন্ত্রণা পাইয়াছিল, সে সময়কার তার আতঙ্কে আকুল অসহায় দৃষ্টি মনে পড়িল।···কর্ণপুর অবাক হইয়া অজয়ের ওপারে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন।·· ধূ ধূ গৈরিক বালুরাশির শয্যায় জীর্ণ-শীর্ণ নদ অবসন্ন দেহ প্রসারিত করিয়া দিয়াছে, উপরে এখানে-ওখানে এক-আধটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দিকহারা মেঘশিশু আকাশের কোন্ কোণ হইতে বাহির হইয়া তখনই আবার সুদূর অনন্তের পথে কোথায় মিলাইয়া যাইতেছে, কোথাও কোন চিহ্ন রাখিয়া যাইতেছে না।···খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিয়া পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলেন। পৃষ্ঠের পুঁটুলিতে কয়েকখানি বস্ত্র, সামান্য কিছু তণ্ডুল ও অন্যান্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, দক্ষিণ হস্তে মাধবীলতার আঁকাবাঁকা একগাছি দৃঢ় যষ্টি, বাম হস্তে একটি পিতলের ঘটি মাত্র লইয়া অজয় পার হইয়া কর্ণপুর পশ্চিম মুখে যাত্রা করিলেন। · জীবনে যাহা কিছু প্রিয়, যাহা কিছু পরিচিত ছিল—সবই এপারে রহিয়া গেল।

দিনের পর দিন তিনি অবিশ্রান্ত পথ চলিতে লাগিলেন। এক এক দিন

সন্ধ্যার সময় কোন গ্রামের চটীতে, নয় তো কোন গৃহস্থের চণ্ডীমণ্ডপে আশ্রয় লইতেন। গ্রামপথে চলিবার সময় লোকে আদর করিয়া গৃহত্যাগী সৌম্যদর্শন ব্রাহ্মণের পুঁটুলি ভরিয়া খাদ্যদ্রব্য দিত, পিতলের ঘটিটা পূর্ণ করিয়া নির্জ্জলা খাঁটি দুগ্ধ দিত; তিনি কোন দিন তাহার সামান্য অংশ খাইতেন, কোন দিন কোন দরিদ্র পথযাত্রী ভিক্ষুক বা কোন বুভুক্ষু গ্রাম্য কুকুরকে খাওয়াইতেন। কত গ্রাম, হাট, মাঠ, কত সমৃদ্ধিশালী বাণিজ্যের গঞ্জ, কত নদী উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে যাইতে অবশেষে তিনি বসতি-বিরল খুব বড় বড় নির্জ্জন মাঠ ও বনজঙ্গলের পথে আসিয়া পড়িলেন। চিরকাল নিতান্ত ঘরোয়া-ধরণের গৃহস্থ, বিদেশে কখনই বাহির হন নাই, সূর্য্য ডুবিয়া যাওয়ার পরই দিগন্ত-বিস্তৃত জনহীন প্রান্তরে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিত; কর্ণপুর একস্থানে দাঁড়াইয়া চারিদিকে লোকালয়ের অন্বেষণে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন—লোকালয় মিলিত না, তাঁহার মনে অত্যন্ত ভয় হইত যদি কোন বন্যজন্তু বা কোনো দস্যু আসিয়া আক্রমণ করে!...পরক্ষণেই ভাবিতেন, আমি তো সন্ন্যাসী মানুষ, দস্যুতে আমার কি কাড়িয়া লইবে?...অজয়ের ধারের বৃদ্ধ শিরীষ বৃক্ষতলে এক ধূসর হেমন্ত সন্ধ্যার কথা মনে পড়িলেই অমনি কর্ণপুরের মন হইতে বন্যজন্তুর ভয় দূর হইত। বনের পথে চলিতে চলিতে অন্য খাদ্য মিলিত না, কোন দিন বুনো কুল, মহুয়া ফুল, কোন দিন বা ছোট তাল চারার নবোদ্গত পত্রকোরক খাইয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতেন; অঞ্জলি পুরিয়া পার্ব্বত্য নদীর জলধারা পান করিতেন। মাঝে মাঝে আবার গ্রামও পাইতেন।

সন্ধ্যার সময় সেদিন তিনি একটি তালবনে আশ্রয় লইলেন। নিকটে লোকালয় নাই, পাথুরে মাটিতে অভ্রকণিকা চিক্ চিক্ করিতেছে, একটু পরে তালবনের পিছনে সূর্য্য ডুবিয়া গেল।... সন্ধ্যার আকাশে পঞ্চমীর এক ফালি চাঁদ।...

সেদিন পথে এক ভিক্ষুকের সঙ্গে তাঁর আলাপ হইয়াছিল, তিন চার মাস পূর্ব্বে জীবিকার চেষ্টায় বাড়ীর বাহির হইয়া কিছু উপার্জ্জন করিয়া সেদিন সে বাড়ী ফিরিতেছে। বাড়ীতে তার ছোট ছোট দুটি মেয়ে ও একটি

ছেলে আছে, তাদের মুখের দিকে চাহিয়া সে প্রবাসের কোন কষ্টকেই কষ্ট বলিয়া মনে করে নাই। ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটুলির মধ্যে রাঙা রাঙা পাথরের নুড়ি, নূতন ধরণের পাখির রঙিন পালক, নানা তুচ্ছ জিনিষ সযত্নে বাঁধিয়া লইয়া চলিয়াছে—বাড়ীতে ছেলে মেয়েদের খেলনা করিতে।...কর্ণপুরের মনে হইয়াছিল সেদিন—দূর, মূর্খ সংসারাসক্ত জীব!...আজ কিন্তু নিজের অজ্ঞাতসারে তাঁহার মনে জাগিল ঐ ভিক্ষুকটা তাঁহার চেয়ে সুখী। সে তো তবুও কতদিন পরে গৃহে ফিরিয়া চলিয়াছে কিন্তু তাঁহার গৃহ কোথায়?... পরক্ষণেই দুর্ব্বলতাটুকু বুঝিয়া ফেলিয়া অপ্রতিভ হইয়া ভাবিলেন, ভগবান দয়া করিয়াই সংসারের ভার তাঁহার স্কন্ধ হইতে নামাইয়া লইয়াছেন। ভালই তো, ইহাতে মন খারাপ করিবার কি আছে?

তাহার পর বসিয়া বসিয়া তিনি তাঁহার প্রিয় একটি শ্লোক আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। তালবনের মাথায় পঞ্চমীর চাঁদের দিকে চাহিয়া বার বার গাঢ়স্বরে শ্লোকটি আবৃত্তি করিতে তাঁহার চক্ষু সজল হইয়া উঠিতেছিল। রাত্রির পাতলা জ্যোৎস্নায়, মাঠের নির্জ্জনতায়, শ্লোকের পদ-লালিত্যে তাঁহার মনে কি একটা অব্যক্ত ব্যথা যেনো ক্রমেই মাথা চাড়া দিয়া উঠিতে লাগিল। সেটাকে চাপা দিবার জন্য তিনি বসিয়া ইষ্টদেবতার চিন্তা করিতে লাগিলেন। ইষ্টদেবের মূর্ত্তি কল্পনা করিতে গিয়া কর্ণপুরের মনে হইল, ঐ অনন্ত আকাশের মত উদার-প্রাণ, ঐ জ্যোৎস্নার মত অনাবিল, চারিধারের প্রান্তর বনের মত শান্ত তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ। এই শ্লোকের ললিত শব্দের মত তাঁর বাণী মধুর, শ্যামায়মান বনভূমির মতই তার স্নিগ্ধ কান্তি...কিন্তু তাহার মুখটি কল্পনা করিতে গিয়া কেমন করিয়া কর্ণপুর বার বার তাঁহার মৃতপুত্রের মুখটিই ভাবিতে লাগিলেন। তাহাকে দাহ করিবার সময় হইতে কর্ণপুর সে মুখটি কখনই ভোলেন নাই, মনে কেমন আঁটিয়া ছিল। সেই মুখ ছাড়া অন্য কোন মুখ তাঁহার ভাল লাগে না। নিজের কাছে সম্পূর্ণ ভাবে স্বীকার না করিতে চাহিলেও কর্ণপুরের মনের গোপন কোণে এ কথা জাগিতেছিল, ইষ্টদেব যদি তাঁর পুত্রের রূপ ধরিয়া দেখা দেন, তবে না সুখ! যদি কখনও দেখা পান, তবে যেন পুত্রের সেই রূপেই পান।

শেষ রাতের স্বপ্নে কর্ণপুর দেখিলেন, জ্যোৎস্না দিয়া গড়া দেহ তাঁরই ছেলেটি আসিয়া কাছে দাঁড়াইয়াছে।...তাঁর মৃতপুত্রের মুখটি খুব সুশ্রী ছিল, তবুও তাহার মুখের যেখানে যাহা কিছু ছোট-খাটো খুঁৎ ছিল, সেই সুন্দর অতি-প্রিয় খুঁৎগুলি ঠিক সেই ভাবেই আছে। বাম ভুরুর উপরে শান্তশিষ্টতার জয়-তিলকটি এখনও তো বিলীন হয় নাই, সেই রকম পাগলের হাসি।.... আস্তে আস্তে সে তাঁর কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপিচুপি ডাক দিল—বাবা।...অনেকদিন-হারা-পুত্রকে ক্ষুধার্ত্ত ব্যগ্র দুই হাতে জড়াইয়া ধরিতে গিয়া কর্ণপুরের ঘুম ভাঙিয়া গেল। দেখিলেন সকাল তো হইয়াছেই, তাল-বনের মাথায় রৌদ্রও উঠিয়া গিয়াছে।

সকালে উঠিয়া তিনি পুনরায় পথ চলিতে সুরু করিলেন। পথে কয়েক-খানা গ্রাম পাইলেও কোথাও বিলম্ব করিলেন না। সারাদিন পথ চলিবার পরে সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে দূর হইতে একটি ছোটখাটো গ্রাম দেখা গেল। অত্যন্ত ক্লান্ত অবস্থায় সম্মুখে লোকালয় দেখিয়া কর্ণপুরের মনে বড় স্বস্তিবোধ হইল। আশ্রয় স্থান সন্ধানে তিনি গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গ্রাম-প্রান্তের প্রথম দুই-চারিখানা বাড়ী ছাড়াইয়া গ্রামের ভিতর অল্প দূর অগ্রসর হইতে হইতেই গ্রামের দৃশ্য যেন কর্ণপুরের কাছে কেমন কেমন ঠেকিল। কোন গৃহস্থ-বাড়ীতেই কোন সাড়াশব্দ নাই, কোন বাড়ী হইতেই রন্ধনের ধূম উঠিতেছে না, পথে পথিকের যাতায়াত নাই, জনপ্রাণী কোন দিকে চোখে পড়ে না। অধিকাংশ গৃহস্থবাটীরই বাহির দরজা খোলা—খোলা দরজা দিয়া চাহিলে বাটীর ভিতর একখানা কাপড় পর্য্যন্ত দেখা যায় না। কিন্তু আশ্চর্য্য বোধ হইলেও সারাদিনের পথশ্রমে কর্ণপুর এত ক্লান্ত হইয়া-ছিলেন যে—অতশত ভাবিবার, বুঝিবার বা ব্যাপার কি অনুসন্ধান করিবার অবস্থা তাঁহার ছিল না। তিনি সম্মুখে এক গৃহস্থ বাটীর বাহিরের ঘরে গিয়া উঠিলেন ও মোট পুঁটুলি নামাইয়া বিশ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।...দণ্ড-দুই কাটিয়া গেল অথচ বাড়ীর ভিতর হইতে কোন মনুষ্য-কণ্ঠধ্বনি তাঁহার কর্ণে আসিল না। সম্মুখের পথ দিয়া এই দুই দণ্ডের মধ্যে মানুষ তো দূরের কথা, একটি গৃহপালিত পশুকে পর্য্যন্ত যাইতে দেখিলেন না। ততক্ষণে তিনি অনেকটা

সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন, ভাবিলেন, এই বাড়ীটার মধ্যেই ঢুকিয়া দেখা যাউক লোকজনেরা কি করিতেছে।

বাড়ীর মধ্যে পায়ে পায়ে ঢুকিয়া যাহা তাঁহার চোখে পড়িল তাহাতে তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। দেখিলেন, ঘরের মধ্যে দুই তিনটি মৃতদেহ পাশাপাশি পড়িয়া আছে, মৃত্যু অনেকক্ষণ পূর্ব্বে ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়। পাশের একটি ক্ষুদ্র কক্ষে গিয়া দেখিলেন, গৃহতলে একটি স্ত্রীলোকের মৃতদেহ শয্যার উপর পড়িয়া আছে, মৃতদেহের পাশে একটি অনিন্দ্যসুন্দর গৌরবর্ণ শিশু খল্‌বল্‌ করিয়া শয্যার পাশে বেড়াইতেছে ও ঘরের আড়া হইতে ঝুলিয়া পড়া একগাছি মাকড়সার জালের অগ্রভাগে দোদুল্যমান একটি মাকড়সার দিকে হাত বাড়াইয়া ধরিতে যাইতেছে এবং আপন মনে হাসিতেছে।

ভাব-গতিকে কর্ণপুর অনুমান করিলেন কোন ভীষণ মহামারীর আবির্ভাবে দুই একদিনের মধ্যে গ্রাম জনশূন্য হইয়া গিয়াছে। ঘরে ঘরে মৃতদেহ রাশি হইয়া আছে, সৎকারের মানুষ নাই, দেখিবার মানুষ নাই, হয়তো যাহারা বাঁচিয়াছিল তাহারা গ্রাম ছাড়িয়া প্রাণ লইয়া পলাইয়া গিয়াছে।

কর্ণপুরকে দেখিয়া শিশু একগাল হাসিয়া হাত বাড়াইল। তাহার মা যে খুব বেশীক্ষণ মারা যায় নাই, ইহা দুইটি বিষয়ে তাঁহার অনুমান হইল। প্রথমতঃ, এই ক্ষুদ্র শিশুটি ক্ষুৎপিপাসাক্রান্ত হইয়া পড়িলে এতক্ষণ এরূপ হাসিত না, কিছুক্ষণ পূর্ব্বেও তাহার মা জীবিতাবস্থায় তাহাকে স্তন্য পান করাইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, মৃতদেহের এতটুকু বিকৃতি হয় নাই, শিশুর মা যেন এইমাত্র ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।···আসন্ন মৃত্যু ও ঘনীভূত বিপদের সম্মুখে পড়িয়াও অবোধ শিশুর এই নিশ্চিন্ত হাসি ও ক্রীড়া দেখিয়া কর্ণপুরের মনে হইল বাল্যকালে অজয়ের তীরের বনে তিনি এক প্রকার পতঙ্গকে লক্ষ্য করিতেন, সূর্য্যের আলোতে খেলা করিবার অধীর আনন্দে সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে কোথা হইতে রাশি রাশি আসিয়া জুটিত এবং খানিকক্ষণ রৌদ্রে উড়িয়া নাচিয়া খেলা করিবার পর রৌদ্র বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ-নৃত্য শেষ করিয়া মাটি

ছাইয়া মরিয়া থাকিত।...কর্ণপুরের মন মমতায় গলিয়া গেল, তিনি তাড়াতাড়ি তাহাকে কোলে উঠাইয়া লইলেন। ঘটিতে জল ছিল, বাহিরের ঘরে আসিয়া গণ্ডূষ করিয়া শিশুর মুখে ধরিতে পিপাসার তাড়নায় সে আগ্রহের সহিত উপরি উপরি বহু গণ্ডূষ জল খাইয়া ফেলিল।

তৎপরে তিনি শিশুর মাতার মুখে শুষ্ক তৃণ জ্বালাইয়া অগ্নি প্রদান করিলেন, মস্তকের কাছে কর রাখিয়া বিষ্ণুমন্ত্র জপ করিলেন। এইরূপে সংক্ষিপ্ত সৎকার কার্য্য শেষ করিয়া তিনি শিশুকে লইয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে সে-বাড়ী হইতে বাহির হইলেন।

কর্ণপুর আবার পৈত্রিক ভিটাতে ফিরিয়া আসিলেন। শুধু ফিরিয়া আসা নহে, তিনি এখন পুরামাত্রায় সংসারী। জ্ঞাতি রসরাজের সঙ্গে দ্বন্দ বিবাদ করিয়া বিষয়-সম্পত্তি ও ধান্য-রোপণের ভূমি কাড়িয়া লইয়াছেন, ব্রাহ্মণ অধমর্ণকে দু'বেলা তাগাদা করেন। দুপুর-রৌদ্রে উত্তরীয় মাথায় জড়াইয়া নিজের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ধান্য-বপনের তদারক করিয়া ঘুরিয়া বেড়ান। বৃক্ষবাটিকায় স্বহস্তে বহুদিন পরে ফল-ফুলের চারা রোপণ করেন।

কুড়াইয়া পাওয়া সেই শিশুটি এখন তাঁহার চক্ষের পুতলি। তাহাকে একদণ্ড চোখের আড়াল করিতে পারেন না। সমস্ত সকালটি সেই বহির্ব্বাটিতে বসিয়া শিশুকে পথের লোকজন, গরু, শিবিকা-যাত্রী নববিবাহিতা দম্পতি—এই সব দেখাইয়া তাহাকে আমোদ দেন। লোকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলে, কর্ণপুরের কাণ্ড দেখ, তীর্থের পথ হইতে এক বন্ধন জুটাইয়া আনিয়াছে। হৃত-সম্পত্তি রসরাজ পাড়ায় পাড়ায় বলিয়া বেড়ায়, মর্কট বৈরাগ্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে চৈতন্য মহাপ্রভু যে উক্তি করিয়াছেন তাহা কি আর মিথ্যা হইবার? হাতের কাছে দেখিয়া লও প্রমাণ! শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুলোকে কর্ণপুরের পুনরাগমনে আনন্দ প্রকাশ করেন।

কর্ণপুর এসব কথা শুনিয়াও শোনেন না। শিশু আজকাল ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথা বলিতে শিখিয়াছে—তাহার মুখে আধ-আধ বুলি শুনিয়া তিনি দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বের অন্তর্হিত আনন্দ আবার ফিরিয়া পান। তারও আগের কথা মনে হয়, যখন তাঁহার নব-বিবাহিতা পত্নী প্রথম ঘর করিতে আসিয়াছিল।

পিতামাতা বর্ত্তমানে প্রথম যৌবনের সেই সুখের দিনগুলা কত প্রভাতের বিহঙ্গ-কাকলীর সঙ্গে, কত পরিশ্রমক্লান্ত মধ্যাহ্নে প্রিয়ার হাতের অন্ন-ব্যঞ্জনের সুঘ্রাণের সঙ্গে, অবসন্ন গ্রীষ্মদিনের শেষে উঠানের পুষ্পভারানত বাতাবী লেবু গাছটির সঙ্গে পুরাতন দিনের কত হাসি-আনন্দের স্মৃতি জড়ানো আছে। তার পরে তাঁহার প্রথম পুত্রের জন্মোৎসব, স্বামী-স্ত্রীতে মিলিয়া কোলের শিশুকে কেন্দ্র করিয়া কত সুখ-স্বর্গ গড়িয়া তোলা। আবার মনে হয় জীবনটাকে বিশ বৎসর পিছু হঠাইয়া দিয়া কে যেন পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি করাইতেছে।

শিশুকে সামলাইয়া রাখা দায়! অনবরত হামাগুড়ি দিয়া দাওয়ার ধারে আসিয়াছে—হঠাৎ একবার অত্যন্ত ধারে আসিয়া হাত পিছ্‌লাইয়া মুখ থুবড়াইয়া নীচে পড়িয়া যাইতে বসিয়াছিল—তাড়াতাড়ি আসিয়া কর্ণপুর ধরিয়া ফেলিলেন। কি একটা বিপদ ঘটিবার অজানা ভয়ে পতনোন্মুখ শিশুর অবোধ চক্ষুদুটি ডাগর হইয়া উঠিয়াছে!··· এ নিজের ভালও বুঝে না, এই ভাবনায় তাঁহার মন এই ক্ষুদ্র পাগলের দিকে অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়।

বন্ধন এইরূপ করিয়াই জড়ায়। ক্রমে ক্রমে কয়েক বৎসর হইয়া গেল, শিশু এক্ষণে সাত আট বৎসরের বালক। তাহার দুষ্টামির জ্বালায় কর্ণপুর দিনে রাত্রে একদণ্ড শান্তি পান না। এখানকার দ্রব্য ওখানে লইয়া গিয়া ফেলে, কখন কি করিয়া বসে। নিষিদ্ধ কার্য্য করিতেই তাহার আগ্রহ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

বর্ষার দিনে কর্ণপুর তাহাকে ঘরের মধ্যে বসাইয়া পড়ান। পড়িতে পড়িতে সে ছুটি লইয়া অল্পক্ষণের জন্য বাহিরে যায়। অনেকক্ষণ আসে না দেখিয়া কর্ণপুর দাওয়ায় আসিয়া দেখেন—বালক অবিশ্রান্ত বর্ষণের মধ্যে উঠানের এ প্রান্ত হইতে ও প্রান্তে মহা খুশির সহিত নাচিয়া বেড়াইতেছে! কর্ণপুর তিরস্কারের সুরে বলেন—ছি বাবা নীলু, দুষ্টুমি ক'রো না। উঠে এসো।···আদর করিয়া বালকের নাম রাখিয়াছেন নীলমণি।

বালক বর্ষণ-ধৌত সুন্দর মুখখানি উঁচু করিয়া হাসিমুখে দাওয়ায় উঠিয়া

আসে। শাসন করিতে কর্ণপুরের মন সরে না, মনে ভাবেন—কোথায় ছিল এর পাত্তা? সে সন্ধ্যাবেলা যদি উঠিয়ে না আনতাম, মুখে জলের গণ্ডুষ না দিতাম—তবে?…মমতায় তাঁহার মন আর্দ্র হইয়া পড়ে। মুখে তিরস্কার করিতে করিতে বালকের সিক্তকেশ মুছাইয়া শুষ্কবস্ত্র পরাইয়া পুনরায় পড়াইতে বসেন।

আবার অন্যমনস্ক হইলে কোন্ ফাঁকে সে বাহির হয়। কর্ণপুর পুঁথি হইতে মুখ তুলিয়া বাহিরে গিয়া দেখেন সে দুই হাত জোড় করিয়া মুখ উঁচু করিয়া খড়ের চাল হইতে পতনোন্মুখ এক বিন্দু জল ধরিবার জন্য ঠায় দাঁড়াইয়া আছে। হাত ধরিয়া আবার তাহাকে ঘরের মধ্যে টানিয়া আনেন।

বালক উত্তমরূপে বুঝে বাবা তাহাকে কখনো মারিবেন না।

নিজ পুত্রের শোক কর্ণপুব ইহাকে পাইয়া ভুলিয়াছেন। কেবল এক এক দিন নির্জ্জন দ্বিপ্রহরে তাহার মুখেব হাসি দূরাগত করুণ সঙ্গীতের মত মনে আসে। মনের ইতিহাসে এই বালকের সে অগ্রজ, রৌদ্রভরা দ্বিপ্রহরে সে-ই আসিয়া তাহার দাবী জানায়। কর্ণপুর উঠিয়া গিয়া নিদ্রিত বালকেব চুলগুলির মধ্যে আঙ্গুল চালাইয়া দেন। মুখেব দিকে চাহিয়া থাকেন।

শীঘ্রই কিন্তু বালককে লইয়া তাঁহার বড বিপদ হইল। এত বেশী এবং এত বিনা-কারণে সে মিথ্যা কথা বলে যে কর্ণপুর রীতিমত বিপন্নবোধ করিতে লাগিলেন। নানা রকমে মিথ্যা-কথনের দোষ ও সত্যভাষণের পুরস্কার সম্বন্ধে বহু গল্প উপদেশ বলিয়াও তাহাকে সংশোধন করিতে পারিলেন না। তাঁহার কাছে সে অনেক কথা আজকাল লুকায়—আগে তাহা করিত না। কর্ণপুর ইহাতে মনে মনে কষ্ট পান। তাহা ছাড়া তাহার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ প্রতিবেশীদের নিকট হইতে আসে। এ গাছের লেবু, ও গাছের আম ছিঁড়িয়া আনিয়াছে, অমুকের ছেলেকে মারিয়াছে। কর্ণপুর বসিয়া বসিয়া ভাবেন, কোন্ বংশের ছেলে কি কুলগত স্বভাবচরিত্র লইয়া জন্মিয়াছে কে জানে? তাঁহার আপন ছেলের বেলায় এগারো বৎসরেও কোনো অভি-যোগ তাঁহাকে শুনিতে হয় নাই—কিন্তু এ বালক তাঁহাকে একি মুস্কিলে

ফেলিল ?…ধর্ম্মভীরু সরল-স্বভাব কর্ণপুর বালকের এসব ব্যাপারে মনে মনে বড় ব্যথিত হন। তাহার ভবিষ্যৎ কি হইবে ভাবিয়া সময় সময় ভীত হইয়া পড়েন। বালস্বভাব-সুলভ চপলতা বলিয়া উড়াইয়া দিতে গিয়াও মনে মনে অস্বস্তি বোধ করেন ; ভাবেন—উঠন্ত মুল পত্তনেই চেনা যায়—কোন্ বংশের ছেলে ঘরে আসিল, কি জানি গতিক কি দাঁড়াইবে ?

অন্য সময় বসিয়া বসিয়া ভাবেন, তাঁহার অবর্ত্তমানে বালকের ভরণ-পোষণের কি হইবে ? যদি মানুষ করিয়া দিয়াও মারা যান, তাহা হইলেও একটা এমন ব্যবস্থা করিয়া যাইতে চাহেন—যাহাতে তাহার ভবিষ্যতে সাংসারিক কষ্ট না ঘটে। কোন্ জমির কি ব্যবস্থা করিবেন, কুসীদ ব্যবসায় করিলে কিরূপ উপার্জ্জন হইতে পারে ইত্যাদি চিন্তায় কর্ণপুর ব্যস্ত থাকেন।

এক-এক সময় হঠাৎ যেন আত্ম-বিস্মৃতি ঘটিয়া যায়। বিষয় চিন্তা !

মনে মনে ভাবেন এ সব কি আসিয়া জুটিল ? সারাদিনে একদণ্ড ইষ্ট চিন্তা করিতে পাই না, প্রৌঢ় বয়সে এ দুর্দ্দৈব মন্দ নয়।

প্রতিবেশী রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য অভিযোগ করিলেন, কর্ণপুরের পালিতপুত্র তাঁহার বাড়ীর ময়নাপাখির খাঁচা খুলিয়া পাখি উড়াইয়া দিয়াছে। বালক বাড়ী আসিলে কর্ণপুর জিজ্ঞাসা করিলেন—নীলু, শুনছি তুমি নাকি ওদের পাখি উড়িয়ে দিয়ে এসেছ ?

বালক বলিল—না বাবা—আমি না…

একে অপরাধ লঘু নহে, তাহার উপর তাঁহার মনে হইল এ মিথ্যা কথা বলিতেছে। কর্ণপুরের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। তাহাকে খুব প্রহার করিলেন।

তাহার বাবা তাহাকে মারিবেন বালক ইহা ভাবে নাই—কারণ বাবার হাতে কখনো সে মার খায় নাই। তাহার চোখের সে বিস্ময় ও ভয়ের দৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া কর্ণপুর তাহাকে হাত ধরিয়া দরজার কাছে লইয়া গিয়া বলিলেন—যাও, বাড়ী থেকে বেরোও—দূর হও—মিথ্যা কথা যে বলে তার স্থান নেই আমার বাড়ী…

বালকের ভরসা-হারা দৃষ্টি তাঁহাকে তীক্ষ্ণ তীরের মত বিঁধিল, কিন্তু তিনি দৃঢ়হস্তে দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।

অর্দ্ধ-দণ্ড পরে তাঁহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি বহির্দ্বার খুলিয়া দেখিলেন সেখানে বালক নাই। তাহার নাম ধরিয়া ডাকিলেন, কিন্তু উত্তর পাইলেন না। বাড়ীর এদিক ওদিক খুঁজিলেন—কোথাও দেখিতে পাইলেন না। নিকটবর্ত্তী প্রতিবেশীদের বাড়ী খুঁজিলেন—কেহ তাহাকে দেখে নাই।

কর্ণপুর অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। সন্ধ্যাকাল—বেশীদূর কোথায় গেল? তিনি নিজের হাতে রন্ধন করিতেন - বালক ভৎর্সনা সহ্য করিয়াছে, তাহার জন্য দুই-একটা, সে যাহা খাইতে ভালবাসে, এমন ব্যঞ্জন রন্ধন করিবার কল্পনা করিতেছিলেন—আজ রাত্রে মিষ্ট কথায় কি কি উপদেশ দিবেন ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন। বালককে না পাইয়া তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গেল। তন্ন তন্ন করিয়া পাড়ার সব বাড়ী খুঁজিলেন; কেহ সন্ধান দিতে পারে না। রঘুনাথ ভট্টাচার্য্যের পুত্র শিবানন্দ তাঁহার কাছে বৈদ্যক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত, সে তাঁহাকে বলিল—তিনি রন্ধন করুন, সে আর একবার ভাল করিয়া সকল স্থান খুঁজিতেছে। ইতিমধ্যে যদি বাড়ী ফিরিয়া থাকে দেখিবার জন্য বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু কোথায়? সে বাড়ী আসে নাই।

কি করিবেন চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় শুনিলেন উঠানের পার্শ্বের গোশালার মধ্যে শিবানন্দ বার বার বালকের নাম ধরিয়া ডাকিতেছে। তাড়াতাড়ি গিয়া দেখেন, গোশালায় রক্ষিত তৃণরাশির উপর বালক কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল—শিবানন্দের ডাকাডাকিতে নিদ্রাজড়িত চোখে উঠিয়া ব্যাপার কি ঘুমের ঘোরে হঠাৎ না বুঝিতে পারিয়া, অর্থহীন দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতেছে।...কর্ণপুর তাহাকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া আনিলেন। পরে খাওয়াইয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিলেন। অভিমানে বালক তাঁহার সহিত অনেকক্ষণ কথা কহিল না—বহু আদরের কথা বলিয়া ও কাটোয়ার ফেণী বাতাসা কিনিয়া দিবেন অঙ্গীকার করিয়া কর্ণপুর তাহাকে প্রসন্ন করিলেন।

সেদিন রাত্রে কর্ণপুর মনে মনে ভাবিলেন—কাল হইতে ইহাকে একটু একটু ভক্তিগ্রন্থ পাঠ করিয়া শোনাইব, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে এ স্বভাবটা শোধরাইয়া যাইবে।

পরদিন হইতে তিনি তাহাকে অবসর-মত নানা ভক্তিগ্রন্থ পাঠ করিয়া শোনাইতে আরম্ভ করিলেন। নরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনা মুখস্থ করাইয়া দিলেন, প্রতি সকালে উঠিয়া বালককে তাঁহার সম্মুখে আবৃত্তি করিতে হয়। ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলা পড়িয়া শোনান। সন্ধ্যার সময় বসিয়া বালককে ডাকিয়া বলেন—ঠাণ্ডা হয়ে বসো, একটা গল্প করি!

পরে মাধবেন্দ্রপুরীর উপাখ্যান বর্ণনা করেন।

মহাভক্ত মাধবেন্দ্রপুরী বৃন্দাবনে গিয়া শৈল পরিক্রমা করিয়া গোবিন্দ কুণ্ডের বৃক্ষতলায় সন্ধ্যার অন্ধকারে নির্জ্জনে বসিয়া আছেন, এক গোপাল বালক একভাণ্ড দুগ্ধ লইয়া আসিয়া পুরীর সম্মুখে ধরিয়া বলিল, তুমি কাহারও কাছে কিছু চাও না কেন? বোধ হয় সারাদিন উপবাসী আছ—এই ধরো দুগ্ধ। পুরী আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি করিয়া জানিলে আমি উপবাসে আছি? বালক মৃদু হাসিয়া বলিল, গ্রামের মেয়েরা জল লইতে আসিয়া তোমাকে দেখিয়া গিয়াছে, এখানে কেহ উপবাসী থাকে না; তাহারাই এই দুগ্ধভাণ্ড দিয়া আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছে। ভাণ্ড রহিল, গরু দুহিয়া আসিয়া লইয়া যাইব।

বালক চলিয়া গেল, কিন্তু ভাণ্ড লইতে আর ফিরিল না।····রাত্রে পুরী স্বপ্ন দেখিলেন, সেই বালক আসিয়া নিকটবর্ত্তী এক বনে তাঁহার হাত ধরিয়া লইয়া গিয়া বলিতেছে, দেখ পুরী, আমি বহুদিন হইতে এই বনের মধ্যে আছি। যবনের অক্রমণের ভয়ে আমার সেবক এইখানে আমায় ফেলিয়া রাখিয়া পালাইয়া গিয়াছে, কেহ দেখে নাই; শীত-বৃষ্টি-দাবানলে বড় কষ্ট পাই, তুমি আমার একটা ব্যবস্থা ক'রো। অনেকদিন হইতে তোমার পথ চাহিয়া বসিয়া আছি—মাধব আসিয়া কবে আমায় সেবা করিবে!

মাধবপুরী মঠ স্থাপন করিয়া সেখানে শ্রীগোপাল বিগ্রহ স্থাপন করিলেন।

পর বৎসর নীলাচল হইতে মলয়-চন্দন আনিয়া বিগ্রহের অঙ্গে লেপন করিয়া দিবেন ভাবিয়া ঝাড়খণ্ডের পথে পুরী নীলাচল যাত্রা করিলেন।··· যাইতে যাইতে রেমুনাতে আসিয়া রাত্রিবাসের জন্য তথাকার গোপীনাথ

বিগ্রহের মন্দিরে আশ্রয় লইলেন। তখন রাত্রি অনেক হইয়া গিয়াছে ঠাকুরের ভোগের সময় উপস্থিত। কথায় কথায় পুরী মন্দিরের পূজারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গোপীনাথের ভোগের কি ব্যবস্থা আছে? পূজারী বলিল, গোপীনাথের ভোগের জন্য অমৃতকেলি নামক ক্ষীর দ্বাদশ মৃৎপাত্র ভরিয়া সন্ধ্যার পর দেওয়া হয়, অমৃত সমান তাহার আস্বাদ—গোপীনাথের ক্ষীর বলিয়া তাহা প্রসিদ্ধ—অন্য কোথাও তাহা পাওয়া যায় না। কথা বলিতে বলিতে ভোগের শঙ্খঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। পুরী মনে মনে ভাবিলেন, অযাচিতভাবে কিছু ক্ষীর প্রসাদ পাওয়া যায় না? তাহা হইলে কিরূপ আস্বাদ জানিয়া ঐরূপ ভোগ বৃন্দাবনের মঠে শ্রীগোপাল বিগ্রহের জন্য ব্যবস্থা করি। ভাবিতেই পুরীর মনে লজ্জা হইল—শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করিয়া তিনি তথা হইতে বাহির হইয়া গ্রামের হাটে আসিয়া বসিলেন।

অযাচিত-বৃত্তি পুরী বিরক্ত-উদাস
অযাচিত পাইলে খান নহে উপবাস।

রাত্রে গোপীনাথের পূজারী স্বপ্ন পান—গোপীনাথ স্বয়ং তাহাকে বলিতেছেন, দেখ, এই গ্রামের হাটে এক সন্ন্যাসী বসিয়া আছে, তার নাম মাধবপুরী; তাহার জন্য একখণ্ড ভোগের ক্ষীর ধড়ার আঁচলে ঢাকা রাখিয়া দিয়াছি, আমার মায়ায় তোমরা তাহা টের পাও নাই। সে সারাদিন কিছু খায় নাই, শীঘ্র মন্দিরের দ্বার খুলিয়া লইয়া গিয়া তাহাকে দিয়া এসো।...

পূজারী তখনই আসিয়া দ্বার খুলিয়া দেখিল, সত্যই বিগ্রহের ধড়ার অঞ্চলে এক পাত্র ক্ষীর চাপা আছে বটে। কে এমন মহা ভাগ্যবান পুরুষ, যাহার জন্য স্বয়ং ঠাকুর ক্ষীর চুরি করিয়াছেন?...ক্ষীর পাত্র লইয়া পূজারী গ্রামের হাটে আসিয়া তাঁহাকে খোঁজ করিয়া বাহির করিলেন। মাধবপুরী একা অন্ধকারে হাটচালাতে বসিয়া বসিয়া নাম জপ করিতেছিলেন। পূজারী তাঁহার হাতে ক্ষীর পাত্র তুলিয়া দিয়া পায়ের ধুলা লইয়া বলিল, ত্রিভুবনে তোমার সমান ভাগ্যবান পুরুষ নাই; পায়ের ধুলা দেও, উদ্ধার হইয়া যাই। তোমার জন্য স্বয়ং গোপীনাথ ক্ষীর চুরি করিয়াছেন।

বালক এক মনে শান্তভাবে শোনে।

বার বার সে তাহাকে প্রশ্ন করে—বাবা কৃষ্ণ কোথায় থাকেন? বৃন্দাবনে?

…প্রতিদিন এক প্রশ্নে বিরক্ত হইয়া কর্ণপুর বলেন— হাঁ হাঁ থাকেন।

ইহার পর হইতেই সে সুর ধরে—বৃন্দাবন কোথায় বাবা, আমি বৃন্দাবন যাবো…

কর্ণপুর ভাবিলেন, ইহার কিছুই হইতেছে না দেখিতেছি—আমার পরিশ্রম সবই পণ্ড হইতেছে, এ কিছুই বোঝে না, শুধু বাজে দুষ্টামির দিকে ঝোঁক।

বার বার তাগাদায় বালক কর্ণপুরকে বিরক্ত করিয়া তুলিল। কিছু দিন পরে দূর-গ্রামে তাঁহার এক ধান্য-ক্ষেত্রের কার্য্য ধরাইবার জন্য কর্ণপুরের সেখানে যাওয়ার প্রয়োজন হইল। পূর্ব্ব হইতেই ঠিক করিয়াছিলেন, বালক যেরূপ দুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে তাহাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া চোখে চোখে রাখাই ভাল, এক কাজে দুই কাজ হইবে। কর্ণপুর বলিলেন—চল নীলু। আমরা বৃন্দাবনে যাই।

উৎসাহে বালকের রাত্রে নিদ্রাবন্ধের উপক্রম হইল। প্রতি রাত্রে সে জিজ্ঞাসা ক'রে যাইবার আর কয় দিন বাকী।…গন্তব্য স্থানে পৌছিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। সেদিন রাত্রে শুইয়া সে কর্ণপুরকে বিরক্ত করিয়া তুলিল—আমি কৃষ্ণকে দেখতে যাবো বাবা! কৃষ্ণ কোথায় গরু চরান বাবা? কাল সকালে উঠে যাবো…

পরদিন স্বীয় ধান্যক্ষেত্রে যাইবার সময় কর্ণপুর তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন ও ক্ষেত্র হইতে কিছু দূরে পথের ধারে বসাইয়া রাখিয়া বলিলেন—এখানে চুপ ক'রে ব'সে থাকো, কৃষ্ণ এই পথে যাবেন। উঠে এদিক ওদিক গেলে কিন্তু আর দেখতে পাবে না। চুপ ক'রে ব'সে থাকো।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে ক্ষেত্রের কার্য্য শেষ করিয়া কর্ণপুর বালককে লইতে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সে মহা উৎসাহে বলিল—দেখেছি বাবা, এই মাত্র কৃষ্ণ গরুর পাল চরিয়ে নিয়ে ফিরে গেলেন—তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? তুমি দেখতে পেলে না!

কর্ণপুর বুঝিলেন, নির্ব্বোধ বালক গ্রামের রাখালদিগকে গরুর পাল লইয়া ফিরিতে দেখিয়াছে ; বলিলেন—চলো বাড়ী চলো—আমি অনেক দেখেছি—তুমি দেখেছ তো, তাহলেই ভাল।

তার পরদিন হইতে বালক প্রায়ই বাবার সঙ্গে মাঠে যায় ও পথের ধারে নির্দ্দিষ্ট স্থানটিতে বসিয়া থাকে। রোজই বাপকে অনুযোগ করে, কেন বাবা এখানে সন্ধ্যার সময় থাকে না, কেন দেখে না। কোন কোন দিন বলে—কাল আমার দিকে চেয়ে কৃষ্ণ বললেন, আয় না গরু চরাবি—আমি তোমায় না জিজ্ঞাসা ক'রে যেতে পারিনি—যাবো বাবা কাল ?

প্রতিদিন এক কথা শুনিয়া কর্ণপুরের মনে খটকা লাগিল। বালক যে ভাবে কথাগুলা বলে তাহাতে মিথ্যা কথা বলিতেছে বলিয়াও মনে হয় না। ব্যাপারটা কি ? একদিন বালককে বলিলেন, এবার সে-সময় যেন তাঁহাকে সে ক্ষেত্র হইতে ডাকিয়া লয়, তিনিও দেখিবেন।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে বালক ছুটিয়া আসিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল—শীগ্‌গির এসো বাবা—কৃষ্ণ আসছেন···

কর্ণপুর বালকের পাছু-পাছু পথের ধারে গিয়া দাঁড়াইলেন। কোথাও কেহ নাই, মাঠের ধারের নির্জ্জন পথ···কিন্তু বালক দুই হাত তুলিয়া মহা উৎসাহে বলিল—ঐ দেখ বাবা—গরুর দল ?···ঐ যে—ঐ দেখো·· আসছেন··

কর্ণপুর বলিলেন—কৈ কৈ ?···কোন কিছুই তাঁহার চোখে পড়িল না।

বালক বলিল—এইবার দেখেছ তো বাবা ? দেখেছ কত গরু ?···ঐ দেখো কৃষ্ণ কেমন পোষাক প'রে ?···

কর্ণপুর বিস্মিত হইলেন। বালকের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—সে কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে উত্তেজিত ভাবে জনশূন্য পথের দিকে চাহিয়া আছে। ভাবিলেন, ইহা মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণ নয় তো ?

হঠাৎ কিন্তু সেই নির্জ্জন পথে কর্ণপুরের কানে গেল, সত্য সত্যই যেন একদল গরুর সম্মিলিত পদশব্দ হইতেছে, যেন অদৃশ্য একদল গরু কে তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা অদৃশ্য বাঁশির তান তাঁহার সম্মুখের পথ দিয়া একটানা বাজিয়া চলিয়াছে···খুব মৃদু বটে কিন্তু বেশ স্পষ্ট !···

অপূর্ব্ব, মধুর তান !…জীবনে সেরূপ কখনো তিনি শোনেন নাই।

কর্ণপুরের সর্ব্ব শরীর শিহরিয়া রোমাঞ্চ হইয়া উঠিল।

বাঁশির সুর একটানা বাজিতে বাজিতে দূর হইতে দূরে চলিয়া যাইতে লাগিল।…ক্রমে দূরে আরও দূরে দিয়া আম্‌শি ফুলের বনের প্রান্তে মিলাইয়া গেল…

বালক বলিল…দেখলে বাবা ? আমি বুঝি মিথ্যে কথা বলি ?

কর্ণপুর চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

অভিশপ্ত

আমার জীবনে সেই একটা অদ্ভুত ব্যাপার সেবার ঘটেছিল।

বছর তিনেক আগেকার কথা। আমাকে বরিশালের ওধারে যেতে হয়েছিল একটা কাজে।

ও অঞ্চলের একটা গঞ্জ থেকে বেলা প্রায় বারোটার সময় নৌকোয় উঠলুম। আমার সঙ্গে এক নৌকোয় বরিশালের এক ভদ্রলোক ছিলেন। গল্পে-গুজবে সময় কাটতে লাগল।

সময়টা পূজোর পরেই। দিনমানটা মেঘলা মেঘলা কেটে গেল। মাঝে মাঝে টিপ টপ্ ক'রে বৃষ্টিও পড়তে শুরু হ'ল। সন্ধ্যার কিছু আগে কিন্তু আকাশটা অল্প পরিষ্কার হয়ে গেল। ভাঙা ভাঙা মেঘের মধ্যে দিয়ে চতুর্দ্দশীর চাঁদের আলো অল্প অল্প প্রকাশ হ'ল।··

সন্ধ্যা হবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বড় নদী ছেড়ে একটা খালে পড়লুম—শোনা গেল খালটা এখান থেকে আরম্ভ হয়ে নোয়াখালির উত্তর দিয়ে একেবারে মেঘনায় মিশেছে। পূর্ব্ববঙ্গে সেই আমার নতুন যাওয়া, চোখে কেমন সব একটু নতুন ঠেকতে লাগল। অপরিসর খালের দুধারে বৃষ্টিস্নাত কেয়ার জঙ্গলে মেঘে আধো-ঢাকা চতুর্দ্দশীর জ্যোৎস্না চিক্ মিক্ করছিল। মাঝে মাঝে নদীর ধারে বড় বড় মাঠ। শটি, বেত, ফার্নগাছের বন জায়গায় জায়গায় খালের জলে ঝুঁকে পড়েছে।···বাইরে একটু ঠাণ্ডা থাকলেও আমি ছইএর বাইরে ব'সে দেখতে দেখতে যাচ্ছিলুম···বরিশালের সে অংশটা সুন্দরবনের কাছাকাছি, ছোট ছোট খাল ও নদী চারিধারে, সমুদ্র খুব দূরে নয়, দশ-পনেরো মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমেই হাতিয়া ও সন্দ্বীপ। আর একটু রাত হ'ল। খালের দু'পাড়ের নির্জ্জন জঙ্গল অস্ফুট জ্যোৎস্নায় কেমন যেন অদ্ভুত দেখাতে লাগল। এ অংশে লোকের বসতি একেবারে নেই ; শুধু ঘন বন আর জলের ধারে বড় বড় হোগলা গাছ।

আমার সঙ্গী বললেন—এত রাতে আর বাইরে থাকবেন না, আসুন ছইএর মধ্যে। এসব জঙ্গলে—বুঝলেন না ?

তারপর তিনি সুন্দরবনের নানা গল্প করতে লাগলেন। তাঁর এক কাকা নাকি ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টে কাজ করতেন, তাঁরই লঞ্চে ক'রে তিনি একবার সুন্দরবনের নানা অংশে বেড়িয়েছিলেন—সেই সব গল্প।

রাত প্রায় বারোটার কাছাকাছি হ'ল।

মাঝি আমাদের নৌকোয় ছিল মোটে একটি। সে ব'লে উঠল—বাবু একটু এগিয়ে গিয়ে বড় নদী পড়বে। এত রাতে একা সে নদীতে পাড়ি জমাতে পারব না। এখানেই নৌকো রাখি।

নৌকো সেখানেই বাঁধা হ'ল। এদিকে বড় বড় গাছের আড়ালে চাঁদ অস্ত গেল, দেখলুম অপ্রশস্ত খালের দুধারেই অন্ধকারে ঢাকা ঘন জঙ্গল। চারিদিকে কোন শব্দ নেই, পতঙ্গগুলো পর্য্যন্ত চুপ করেছে।···সঙ্গীকে বললুম—মশায় এই ত সরু খাল—পাড় থেকে বাঘ লাফিয়ে পড়বে না ত নৌকোর ওপর ?

সঙ্গী বললেন—না পড়লেই আশ্চর্য্য হবো।

শুনে অত্যন্ত পুলকে ছইএর মধ্যে ঘেঁসে বসলুম। খানিকটা ব'সে থাকবার পর সঙ্গী বললেন—আসুন একটু শোয়া যাক। ঘুম তো হবে না আর ঘুমোনো ঠিকও না, আসুন একটু চোখ বুজে থাকি।

খানিকটা চুপ ক'রে থাকবার পর সঙ্গীকে ডাকতে গিয়ে দেখি তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন, মাঝিও জেগে আছে ব'লে মনে হ'ল না; ভাবলুম তবে আমিই বা কেন মিথ্যে মিথ্যে চোখ চেয়ে চেয়ে থাকি – মহাজনদের পথ ধরবার উদ্যোগ করলুম।

তারপর যা ঘটল সে আমার জীবনের এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। শুতে যাচ্ছি হঠাৎ আমার কানে গেল অন্ধকার বন-ঝোপের ওপারে অনেক দূরে গভীর জঙ্গলের মধ্যে কে যেন কোথায় গ্রামোফোন বাজাচ্ছে।····তাড়াতাড়ি উঠে বসলুম—গ্রামোফোন ? এ বনে এত রাতে গ্রামোফোন বাজাবে কে ? কান পেতে শুনলুম—গ্রামোফোন না। অন্ধকারে হিজল হিন্তাল গাছগুলো যেখানে খুব ঘন হয়ে আছে, সেখান থেকে কারা যেন উচ্চ কণ্ঠে আর্ত্তকরুণ সুরে কি বলছে।···খানিকটা শুনে মনে হ'ল সেটা একাধিক লোকের সমবেত

কণ্ঠস্বর। প্রতিবেশীর তেতালার ছাদে গ্রামোফোন বাজলে যেমন খানিকটা স্পষ্ট, খানিকটা অস্পষ্ট অথচ বেশ একটা একটানা স্বরের ঢেউ এসে কানে পৌঁছয়—এও অনেকটা সেই ভাবের। মনে হ'ল যেন কতকগুলো অস্পষ্ট বাংলা ভাষার শব্দও কানে গেল—কিন্তু ধরতে পারা গেল না কথাগুলো কি। শব্দটা মাত্র মিনিটখানেক স্থায়ী হ'ল, তারপরই অন্ধকার বনভূমি যেমন নিস্তব্ধ ছিল, আবার তেমনি নিস্তব্ধ হয়ে গেল।…তাড়াতাড়ি ছইএর বাইরে এলুম। চারিপাশের অন্ধকার ঝিঙের বিচির মতন কালো। বনভূমি নীরব, শুধু নৌকার তলায় ভাঁটার জল কল্‌কল্ ক'রে বাধছে, আর শেষ রাত্রের বাতাসে জলের ধারে কেয়া-ঝোপে এক প্রকার অস্পষ্ট শব্দ হচ্ছে। পাড় থেকে দূরে হিজল গাছের কালো গুঁড়িগুলোর অন্ধকারে এক অদ্ভুত চেহারা হয়েছে।

ভাবলুম সঙ্গীদের ডেকে তুলি। আবার ভাবলুম বেচারীরা ঘুমুচ্ছে, ডেকে কি হবে, তার চেয়ে বরং নিজে জেগে ব'সে থাকি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরালুম: তারপর আবার ছইএর মধ্যে ঢুকতে যাবো, এমন সময় সেই অন্ধকারে ঢাকা বিশাল বনভূমির কোন্ অংশ থেকে এক সুস্পষ্ট উচ্চ আর্ত্তকরুণ ঝিঁঝিঁ পোকার রবের মত তীক্ষ্ণস্বর তীরের মতন জমাট অন্ধকারের বুক চিরে আকাশে উঠল—ওগো নৌকাযাত্রীরা তোমরা কারা যাচ্ছ…আমরা শ্বাস বন্ধ হয়ে ম'লাম…আমাদের ওঠাও ওঠাও…আমাদের বাঁচাও।

নৌকার মাঝিটা ধড়মড় ক'রে জেগে উঠল, আমি সঙ্গীকে ডাকলুম—মশায় ও মশায়, উঠুন উঠুন।

মাঝি আমার কাছে ঘেঁসে এল, ভয়ে তার গলার স্বর কাঁপছিল। বললে—আল্লা! আল্লা। শুনতে পেয়েছেন বাবু?

সঙ্গী উঠে জিজ্ঞাসা করলে—কি, কি মশায়! ডাকলেন কেন? কোন জানোয়ার টানোয়ার নাকি?

আমি ব্যাপারটা বললুম। তিনিও তাড়াতাড়ি ছইএর বাইরে এলেন। তিনজনে মিলে কান খাড়া ক'রে রইলুম। চারিদিক আবার চুপ…ভাঁটার জল নৌকার তলায় বেধে আগের চেয়েও জোরে শব্দ হচ্ছিল।…

সঙ্গী মাঝিকে জিজ্ঞাসা করলেন—এটা কি তবে…

মাঝি বললে—হ্যাঁ বাবু বাঁয়েই কীর্ত্তিপাশার গড়।

সঙ্গী বললেন—তবে তুই এত রাত্রে এখানে নৌকো রাখলি কেন? বেকুব কোথাকার!…

মাঝি বললে—তিন জন আছি ব'লেই রেখেছিলাম বাবু। ভাটার টানে নৌকো পিছিয়ে নেবার তো জো ছিল না।

কথা-বার্ত্তার ধরণ শুনে সঙ্গীকে বললুম—কি মশায়, কি ব্যাপার? আপনি কিছু জানেন নাকি?

ভয়ে যত হোক না হোক বিস্ময়ে আমরা কেমন হয়ে গিয়েছিলুম। সঙ্গী বললেন—ওরে তোর সেই কেরোসিনের ডিবেটা জ্বাল্। আলো জ্বেলে ব'সে থাকা যাক—রাত এখনও ঢের।

মাঝিকে বললুম—তুই শব্দটা শুনতে পেয়েছিলি?

সে বললে, হ্যাঁ বাবু, আওয়াজ কানে গিয়েই ত আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমি আরও তুবার নৌকো বেয়ে যেতে যেতে ও ডাক শুনিছি।

সঙ্গী বললেন—এটা এ অঞ্চলের একটা অদ্ভুত ঘটনা। তবে এ জায়গাটা সুন্দরবনের সীমানায় ব'লে, আর এ অঞ্চলে কোন লোকালয় নেই ব'লে, শুধু নৌকার মাঝিদের কাছেই এটা সুপরিচিত। এর পেছনে একটা ইতিহাস আছে—সেটা অবশ্য নৌকোর মাঝিদের পরিচিত নয়—সেইটে আপনাকে বলি শুনুন।

তারপর ধূমায়িত কেরোসিনের ডিবার আলোয় অন্ধকার বনের বুকের মধ্যে ব'সে সঙ্গীর মুখে কীর্ত্তিপাশার গড়ের ইতিহাসটা শুনতে লাগলুম…

তিন শ' বছর আগেকার কথা। মুনিম খাঁ তখন গৌড়ের সুবাদার। এ অঞ্চলে তখন বারভুঁইয়ার তুই প্রতাপশালী ভুঁইয়া রাজা রামচন্দ্র রায় ও ঈশা খাঁ মশনদ-ই-আলির খুব প্রতাপ। মেঘনার মোহানার বাহির সমুদ্র, যাকে এখন সন্দ্বীপ চ্যানেল বলে, সেখানে তখন মগ আর পর্ত্তুগীজ জলদস্যুরা শিকারান্বেষণে শ্যেনপক্ষীর মত ওৎ পেতে ব'সে থাকত।

সে সময় এখানে এ রকম জঙ্গল ছিল না। এ সমস্ত জায়গা তখন কীর্ত্তি রায়ের অধিকারে ছিল। এইখানে তাঁর সুদৃঢ় দুর্গ ছিল—মগ জলদস্যুদের সঙ্গে তিনি অনেক বার লড়েছিলেন। তাঁর অধীনে সৈন্যসামন্ত, কামান, যুদ্ধের কোষা সবই ছিল। সন্দ্বীপ তখন ছিল পর্ত্তুগীজ জলদস্যুদের প্রধান আড্ডা। এদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে এ অঞ্চলের সকল জমিদারকেই সৈন্যবল দৃঢ় ক'রে গড়তে হ'ত। এ বনের পশ্চিম ধার দিয়ে তখন আর একটা খাল বড় নদীতে পড়ত, বনের মধ্যে তার চিহ্ন এখনও আছে।

কীর্ত্তি রায় অত্যন্ত অত্যাচারী এবং দুর্দ্ধর্ষ জমিদার ছিলেন। তাঁর রাজ্যে এমন সুন্দর মেয়ে কমই ছিল, যে তাঁর অন্তঃপুরে একবার না ঢুকেছে। তা ছাড়া তিনি নিজেও এক প্রকার জলদস্যু ছিলেন। তাঁর নিজের অনেকগুলো বড় ছিপ ছিল। আসপাশের জমিদারী এমন কি নিজের জমিদারীর মধ্যেও সম্পত্তিশালী গৃহস্থের ধনরত্ন স্ত্রী-কন্যা লুঠপাট-করা-রূপ মহৎ-কার্য্যে সেগুলি ব্যবহৃত হ'ত।

কীর্ত্তি রায়ের পাশের জমিদারী ছিল কীর্ত্তি রায়ের এক বন্ধুর। এঁরা ছিলেন চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্র রায়েদের পত্তনিদার। অবশ্য সে সময় অনেক পত্তনিদারের ক্ষমতা এখনকার স্বাধীন রাজাদের চেয়ে বেশী ছিল। কীর্ত্তি রায়ের বন্ধু মারা গেলে তাঁর তরুণবয়স্ক পুত্র নরনারায়ণ রায় পিতার জমিদারীর ভার পান। নরনারায়ণ তখন সবে যৌবনে পদার্পণ করেছেন, অত্যন্ত সুপুরুষ, বীর ও শক্তিমান্। নরনারায়ণ কীর্ত্তি রায়ের পুত্র চঞ্চল রায়ের সমবয়সী ও বন্ধু।

সেবার কীর্ত্তি রায়ের নিমন্ত্রণে নরনারায়ণ রায় তাঁর রাজ্যে দিনকতকের জন্যে বেড়াতে এলেন। চঞ্চল রায়ের তরুণী পত্নী লক্ষ্মী দেবী স্বামীর বন্ধু নরনারায়ণকে দেবরের মত স্নেহের চক্ষে দেখতে লাগলেন। দু'এক দিনের মধ্যেই কিন্তু সে স্নেহের চোটে নরনারায়ণকে বিব্রত হ'য়ে উঠতে হ'ল। নরনারায়ণ রায় তরুণবয়স্ক হ'লেও একটু গম্ভীর-প্রকৃতি। বিদ্যুৎ-চঞ্চলা তরুণী বন্ধুপত্নীর ব্যঙ্গ পরিহাসে গম্ভীর-প্রকৃতি নরনারায়ণের মান বাঁচিয়ে চলা দুষ্কর হয়ে পড়ল।...স্নান ক'রে উঠেছেন, মাথার তাজ খুঁজে পাওয়া যায় না, নানা

জায়গায় খুঁজে হয়রান হয়ে তার আশা ছেড়ে দিয়ে ব'সে আছেন, হঠাৎ কখন নিজের বালিশ তুলতে গিয়ে দেখেন তার নীচেই তাজ চাপা আছে—যদিও এর আগেও তিনি বালিশের নীচে খুঁজেছেন।...তাঁর প্রিয় তরবারি-খানা দুপুর থেকে বিকেলের মধ্যে পাঁচ বার হারিয়ে গেল, আবার পাঁচ বারই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত স্থান থেকে খুঁজে পাওয়া গেল। তাম্বুলে এমন সব দ্রব্যের সমাবেশ হ'তে লাগল, যা কোনো কালেই তাম্বুলের উপকরণ নয়।... তরল-মস্তিষ্ক বন্ধুপত্নাকে কিছুতেই এঁটে উঠতে না পেরে অত্যাচার-জর্জ্জরিত নরনারায়ণ রায় ঠিক করলেন তাঁর বন্ধুর স্ত্রীটি একটু ছিটগ্রস্ত। বন্ধুর দুর্দ্দশায় চঞ্চল রায় মনে মনে খুব খুশি হ'লেও বাইরে স্ত্রীকে বললেন—দু'দিনের জন্য এসেছে বেচারী, ওকে তুমি যে রকম বিব্রত ক'রে তুলেছ, ও আর কখনো এখানে আসবে না।

দিন-কয়েক এ রকমে কাটবার পর কীর্ত্তি রায়ের আদেশে চঞ্চল রায়কে কি কাজে হঠাৎ গৌড়ে যাত্রা করতে হ'ল! নরনারায়ণ রায়ও বন্ধুপত্নী কখন কি ক'রে বসে, সেই ভয়ে দিনকতক সশঙ্ক অবস্থায় কাল যাপন করবার পর নিজের বজ্‌রায় উঠে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। যাবার সময় লক্ষ্মী দেবী ব'লে দিলেন—এবার আবার যখন আসবে ভাই, এমন একটি বিশ্বাসী লোক সঙ্গে এনো যে রাত-দিন তোমার জিনিষপত্র ঘরে ব'সে চৌকী দেবে—বুঝলে তো?

নরনারায়ণ রায়ের বজরা রায়মঙ্গলের মোহানা ছাড়িয়ে যাবার একটু পরেই জলদস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হ'ল।...তখন মধ্যাহ্নকাল, প্রখর রৌদ্রে বজ্‌রার দক্ষিণ দিকের দিগ্বলয়-প্রসারী জলরাশি শানানো তলোয়ারের মত ঝক্‌ঝক্ করছিল, সমুদ্রের সে অংশে এমন কোন নৌকো ছিল না—যারা সাহায্য করতে আসতে পারে। সেটা রায়মঙ্গল আর কালাবদর নদীর মুখ, সামনেই বার সমুদ্র, সন্দ্বীপ চ্যানেল, জলদস্যুদের প্রধান ঘাঁটি।...নর-নারায়ণের বজ্‌রার রক্ষীরা কেউ হত হ'ল, কেউ সাংঘাতিক জখম হ'ল। নিজে নরনারায়ণ দস্যুদের আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে উরুদেশে কিসের খোঁচা খেয়ে সংজ্ঞাশূন্য হ'য়ে পড়লেন।

জ্ঞান হ'লে দেখতে পেলেন তিনি এক অন্ধকার স্থানে শুয়ে আছেন, তাঁর সামনে কি যেন একটা বড় নক্ষত্রের মতন জলছে।...খানিকক্ষণ জোরে চোখের পলক ফেলবার পর তিনি বুঝলেন যাকে নক্ষত্র ব'লে মনে হয়েছিল তা প্রকৃত পক্ষে একটি অতি ক্ষুদ্র গবাক্ষপথে আগত দিবালোক।...নরনারায়ণ দেখলেন তিনি একটি অন্ধকার কক্ষের আর্দ্র মেজের ওপর শুয়ে আছেন, ঘরের দেওয়ালে স্থানে স্থানে সবুজ শেওলার দল গজিয়েছে।

আরো ক-দিন আরো ক-রাত কেটে গেল। কেউ তাঁর জন্যে কোন খাদ্য আনলে না, তিনি বুঝলেন যারা তাঁকে এখানে এনেছে তাঁকে না খেতে দিয়ে মেরে ফেলাই তাদের উদ্দেশ্য। মৃত্যু! সামনে নির্ম্মম মৃত্যু!...

সে দিনমানও কেটে গেল। আঘাত-জনিত ব্যথায় এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অবসন্ন-দেহ নরনারায়ণের চোখের সামনে থেকে গবাক্ষ-পথের শেষ দিবালোক মিলিয়ে গেল।...তিনি অন্ধকার ঘরের পাষাণ-শয্যায় ক্ষুধা-কাতর দেহ প্রসারিত ক'রে অধীরভাবে মৃত্যুর অপেক্ষা করতে লাগলেন।...প্রকৃতির একটা ক্লোরোফর্ম্ম আছে, যন্ত্রণা পেয়ে মরছে এমন প্রাণীকে মৃত্যু-যন্ত্রণা থেকে বাঁচাবার জন্যে সেটা মুমূর্ষু প্রাণীকে অভিভূত করে। ধীরে ধীরে যেন সেই দয়াময়ী মৃত্যু-তন্দ্রা এসে তাঁকেও আশ্রয় করলে। অনেকক্ষণ পরে, কতক্ষণ পরে তা তিনি বুঝতে পারলেন না—হঠাৎ আলো চোখে লেগে তাঁর তন্দ্রাঘোর কেটে গেল। বিস্মিত নরনারায়ণ চোখ মেলে দেখলেন, তাঁর সামনে প্রদীপ-হস্তে দাঁড়িয়ে তাঁর বন্ধুপত্নী লক্ষ্মী দেবী। কথা বলতে গিয়ে লক্ষ্মী দেবীর ইঙ্গিতে নরনারায়ণ থেমে গেলেন। লক্ষ্মী দেবী হাতের প্রদীপটি আঁচল দিয়ে ঢেকে নরনারায়ণকে তাঁর অনুসরণ করতে ইঙ্গিত করলেন। একবার নরনারায়ণের সন্দেহ হ'ল—এসব স্বপ্ন নয় ত? কিন্তু ঐ যে দীপ-শিখার উজ্জ্বল আলোয় আর্দ্র ভিত্তিগাত্রের সবুজ শেওলার দল স্পষ্ট দেখা যায়!...

নরনারায়ণ শক্তিমান্ যুবক, ক্ষুধায় দুর্ব্বল হয়ে পড়লেও নিশ্চিত মৃত্যুর গ্রাস থেকে বাঁচবার উৎসাহে তিনি দৃঢ়পদে অগ্রবর্ত্তিনী ক্ষিপ্রগামিনী বন্ধুপত্নীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চললেন। একটা বক্রগতি পাথরের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে

একটা দীর্ঘ সুড়ঙ্গ পার হবার পর তিনি দেখলেন যে তাঁরা কীর্ত্তি রায়ের প্রাসাদের সামনের খাল ধারে এসে পৌঁছেছেন। লক্ষ্মী দেবী একটা ছোট বেতে-বোনা থলি বার ক'রে তাঁর হাতে দিয়ে বললেন—এতে খাবার আছে, এখানে খেও না, তুমি সাঁতার জানো, খাল পার হ'য়ে ওপারে গিয়ে কিছু খেয়ে নাও, তারপর যত শীগ্‌গির পারো, পালিয়ে যাও।"

ব্যাপার কি নরনারায়ণ রায় একটু একটু বুঝলেন। তাঁর বিস্তৃত জমিদারী কীর্ত্তি রায়ের জমিদারীর পাশেই এবং তাঁর অবর্ত্তমানে কীর্ত্তি রায়ই দনুজমর্দ্দনদেবের বংশধরদের ভবিষ্যৎ পত্তনিদার। অত বড় বিস্তৃত ভূসম্পত্তি সৈন্যসামন্ত কীর্ত্তি রায়ের হাতে এলে তিনি কি আর কিছু গ্রাহ্য করবেন? কীর্ত্তি রায় যে মাথা নীচু ক'রে আছেন, তার এই কি কারণ নয় যে, তাঁর এক পাশে বাক্‌লা, চন্দ্রদ্বীপ—অন্যপাশে ভুলুয়ার প্রতাপশালী ভুঁইয়া রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য?

প্রদীপের আলোয় নরনারায়ণ দেখলেন, তাঁর বন্ধুপত্নীর মুখের সে চটুল হাস্য-রেখার চিহ্নও নেই, তাঁর মুখখানি সহানুভূতিতে-ভরা মাতৃমুখের মতন স্নেহ-কোমল হ'য়ে এসেছে। তাঁদের চারিপাশে গাঢ় অন্ধকার, মাথার ওপর আকাশের বুক চিরে দিগন্ত-বিস্তৃত উজ্জ্বল ছায়াপথ, নিকটেই খালের জল জোর ভাঁটার টানে তীরের হোগলা গাছ দুলিয়ে কল্‌কল্ শব্দে বড় নদীর দিকে ছুটেছে।··· নরনারায়ণ আবেগপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—বৌ-ঠাকরুণ! চঞ্চলও কি এর মধ্যে আছে?

লক্ষ্মী দেবী বললেন—না ভাই, তিনি কিছু জানেন না। এসব শ্বশুর-ঠাকুরের কীর্ত্তি। এই জন্যেই তাঁকে অন্য জায়গায় পাঠিয়েছেন, এখন আমার মনে হচ্ছে। গৌড়-টৌড় সব মিথ্যে।

নরনারায়ণ দেখলেন, লজ্জায় দুঃখে তাঁর বন্ধুপত্নীর মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। লক্ষ্মী দেবী আবার বললেন—আমি আজ জানতে পারি। খিড়কী গড়ের পাইক সর্দ্দার আমায় মা বলে, তাকে দিয়ে দুপুর রাতের পাহারা সব সরিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। তাই···

নরনারায়ণ বললেন—বৌ-ঠাকরুণ, আমার এক বোন ছেলেবেলায় মারা গিয়েছিল—তুমি আমার সেই বোন, আজ আবার ফিরে এলে।

লক্ষ্মী দেবীর পদ্মের মতন মুখখানি চোখের জলে ভেসে গেল। একটু ইতস্ততঃ ক'রে বললেন—ভাই বলতে সাহস পাইনে, তবুও একটা কথা বলছি—বোন ব'লে যদি রাখো…

নরনারায়ণ জিজ্ঞাসা করলেন—কি কথা বৌ-ঠাকরুণ?

লক্ষ্মী দেবী বললেন…তুমি আমার কাছে ব'লে যাও ভাই যে, শ্বশুর-ঠাকুরের কোন অনিষ্ট-চিন্তা তুমি করবে না?

নরনারায়ণ রায় একটুখানি কি ভাবলেন, তারপর বললেন—তুমি আমার প্রাণ দিলে বৌ-ঠাকরুণ, তোমার কাছে ব'লে যাচ্ছি—তুমি বেঁচে থাকতে আমি তোমার শ্বশুরের কোন অনিষ্ট-চিন্তা করব না।

বিদায় নিতে গিয়ে নরনারায়ণ একবার জিজ্ঞাসা করলেন—বৌ-ঠাকরুণ, তুমি ফিরে যেতে পারবে তো?

লক্ষ্মী দেবী বললেন—আমি ঠিক যাবো, তুমি কিন্তু যত দূর পারো সাঁতরে গিয়ে তারপর ডাঙায় উঠে চ'লে যেও।

নরনারায়ণ রায় সেই ঘনকৃষ্ণ অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে খালের জলে প'ড়ে মিলিয়ে গেলেন।…

লক্ষ্মী দেবীর প্রদীপটা অনেকক্ষণ বাতাসে নিবে গিয়েছিল—তিনি অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে শ্বশুরের গড়ের দিকে ফিরলেন। একটু দূরে গিয়েই তিনি দেখতে পেলেন, পাশের ছোট খালটায় দু'খানা ছিপ মশালের আলোয় সজ্জিত হচ্ছে—ভয়ে তাঁর বুকের রক্ত জ'মে গেল—সর্ব্বনাশ! এরা কি তবে জানতে পেরেছে? দ্রুতপদে অগ্রসর হয়ে গুপ্ত সুড়ঙ্গের মুখে এসে তিনি দেখলেন সুড়ঙ্গের পথ খোলাই আছে। তিনি তাড়াতাড়ি সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

কীর্ত্তি রায় বুঝতেন নিজের হাতের আঙুলও যদি বিষাক্ত হ'য়ে ওঠে তো তাকে কেটে ফেলাই সমস্ত শরীরের পক্ষে মঙ্গল।…পরদিন আবার দিনের

আলো ফুটে উঠল, কিন্তু লক্ষ্মী দেবীকে আর কোন দিন কেউ দেখেনি। রাতের হিংস্র অন্ধকার তাঁকে গ্রাস ক'রে ফেলেছিল।...

নরনারায়ণ রায় নিজের রাজধানীতে ব'সে সব শুনলেন—গুপ্ত সুড়ঙ্গের দু'ধারের মুখ বন্ধ ক'রে কীর্ত্তি রায় তাঁর পুত্রবধূর শ্বাসরোধ ক'রে তাঁকে হত্যা করেছেন। শুনে তিনি চুপ ক'রে রইলেন।...এর কিছুদিন পরে তাঁর কানে গেল—বাশুণ্ডার লক্ষণ রায়ের মেয়ের সঙ্গে শীঘ্র চঞ্চলের বিয়ে।

সেদিন রাত্রে চাঁদ উঠলে নিজের প্রাসাদ-শিখরে বেড়াতে বেড়াতে চারিদিকের শুভ্র সুন্দর আলোয় সাগরের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে দৃঢ়চিত্ত নরনারায়ণ রায়েরও চোখের পাতা যেন ভিজে উঠল। তাঁর মনে হ'ল তাঁর অভাগিনী বৌ-ঠাকুরাণীর হৃদয়-নিঃসারিত নিষ্পাপ অকলঙ্ক পবিত্র স্নেহের ঢেউয়ে সারা জগৎ ভেসে যাচ্ছে...মনে হ'ল, তাঁরই অন্তরের শ্যামলতায় জ্যোৎস্না-ধৌত বনভূমির অঙ্গে অঙ্গে শ্যামলসুন্দর শ্রী...নীরব আকাশের তলে তাঁরই চোখের দুষ্ট হাসিটি তারায় তারায় নবমল্লিকার মতন ফুটে উঠেছে।... নরনারায়ণ রায়ের পূর্ব্বপুরুষেরা ছিলেন দুর্দ্ধর্ষ ভূম্যধিকারী দস্যু—হঠাৎ পূর্ব্বপুরুষের সেই বর্ব্বর রক্ত নরনারায়ণের ধমনীতে নেচে উঠল, তিনি মনে মনে বললেন—আমার অপমান আমি এক রকম ভুলেছিলাম বৌ-ঠাকরুণ, কিন্তু তোমার অপমান আমি সহ্য করব না কখনও।

কিছুদিন কেটে গেল। তারপর একদিন এক শীতের ভোর রাত্রির কুয়াসা কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, কীর্ত্তি রায়ের গড়ের খালের মুখ ছিপে, সুলুপে, জাহাজে ভ'রে গিয়েছে। তোপের আওয়াজে কীর্ত্তি রায়ের প্রাসাদ দুর্গের ভিত্তি ঘন ঘন কেঁপে উঠতে লাগল। কীর্ত্তি রায় শুনলেন আক্রমণকারী নরনারায়ণ রায়, সঙ্গে দুরন্ত পর্ত্তুগীজ জলদস্যু সিবাষ্টিও গঞ্জালেস্। উভয়ের সম্মিলিত বহরের চল্লিশখানা কোষা খালের মুখে চড়াও হয়েছে; পুরা বহরের বাকী অংশ বাহির নদীতে দাঁড়িয়ে!

এ আক্রমণের জন্য কীর্ত্তি রায় পূর্ব্ব থেকে প্রস্তুত ছিলেন—কেবল প্রস্তুত ছিলেন না নরনারায়ণের সঙ্গে গঞ্জালেসের যোগদানের জন্যে। রাজা

রামচন্দ্র রায় এবং রাজা লক্ষ্মণ-মাণিক্যের সঙ্গে গঞ্জালেসের কয়েক বৎসর ধ'রে শত্রুতা চ'লে আসছে, এ অবস্থায় গঞ্জালেস্ যে তাঁদের পত্তদিনার নরনারায়ণ রায়ের সঙ্গে যোগ দেবে—এ কীর্ত্তি রায়ের কাছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ঘটনা। তা হ'লেও, কীর্ত্তি রায়ের গড় থেকেও তোপ চলল।

গঞ্জালেস্ সুদক্ষ নৌ-বীর। তার পরিচালনে দশখানা স্লুপ চড়া ঘুরে গড়ের পাশের ছোট খালে ঢুকতে গিয়ে কীর্ত্তি রায়ের নওয়ারার এক অংশ দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হ'ল। গড়ের কামান সেদিকে এত প্রখর যে খালের মুখে দাঁড়িয়ে থাকলে বহর মারা পড়ে। গঞ্জালেস্ দু'খানা ছোট কামান-বাহী স্লুপ ছোট খালের মুখে রেখে বাকীগুলো সেখান থেকে ঘুরিয়ে এনে চড়ার পিছনে দাঁড় করালে। গঞ্জালেসের অধীনস্থ অন্যতম জলদস্যু—মাইকেল রোজারিও ডি ভেগা—এই ছোট বহর খালের মধ্যে ঢুকিয়ে গড়ের পশ্চিমদিক আক্রমণ করবার জন্যে আদিষ্ট হ'ল।

অতর্কিত আক্রমণে কীর্ত্তি রায়ের নওয়ারা শত্রু-বহর কর্ত্তৃক ছিপি-আঁটা বোতলের মতন খালের মধ্যে আটকে গেল—বার নদীতে গিয়ে যুদ্ধ দেবার ক্ষমতা তাদের আদৌ রইল না। তবুও তাদের বিক্রমে রোজারিও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কিছু ক'রে উঠতে পারলে না। কীর্ত্তি রায়ের নৌ-বহর দুর্ব্বল ছিল না, কীর্ত্তি রায়ের গড় থেকে পর্ত্তুগীজ জলদস্যুদের আড্ডা সন্দ্বীপ খুব দূরে নয়, কাজেই কীর্ত্তি রায়কে নৌ-বহর সুদৃঢ় ক'রে গড়তে হয়েছিল।

বৈকালের দিকে রোজারিওর কামানের মুখে গড়ের পশ্চিম দিকটা একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। নরনারায়ণ রায় দেখলেন প্রায় ত্রিশখানা কোষা জখম অবস্থায় খালের মুখে প'ড়ে, কীর্ত্তি রায়ের গড়ের কামানগুলো সব চুপ, নদীর দু'পাড় ঘিরে সন্ধ্যা নেমে আসছে। ঊর্দ্ধে নিস্তব্ধ নীল আকাশে কেবলমাত্র এক ঝাঁক শকুনি কীর্ত্তি রায়ের গড়ের উপর চক্রাকারে ঘুরছে···হঠাৎ বিজয়োন্মত্ত নরনারায়ণ রায়ের চোখের সম্মুখে বন্ধু-পত্নীর বিদায়ের রাতের সন্ধ্যার পদ্মের মতন বিষাদভরা ম্লান মুখখানি, কাতর মিনতিপূর্ণ সেই চোখ দুটি মনে পড়ল—তীব্র অনুশোচনায় তাঁর মন

তখনি ভ'রে উঠল।…তিনি করেছেন কি! এই রকম ক'রে কি তিনি তাঁর স্নেহময়ী প্রাণদাত্রীর শেষ অনুরোধ রাখতে এসেছেন?……

নরনারায়ণ রায় হুকুম জারি করলেন—কীর্ত্তি রায়ের পরিবারের এক প্রাণীরও যেন প্রাণহানি না হয়।

একটু পরেই সংবাদ এল, গড়ের মধ্যে কেউ নেই। নরনারায়ণ রায় বিস্মিত হলেন। তিনি তখনি নিজে গড়ের মধ্যে ঢুকলেন। তিনি এবং গঞ্জালেস্ গড়ের সমস্ত অংশ তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজলেন—দেখলেন সত্যিই কেউ নেই। পর্ত্তুগীজ বহরের লোকেরা গড়ের মধ্যে লুঠপাট করতে গিয়ে দেখলে মূল্যবান্ দ্রব্যাদি বড় কিছু নেই। পরদিন দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত লুঠপাট চলল… কীর্ত্তি রায়ের পরিবারের এক প্রাণীরও সন্ধান পাওয়া গেল না। অপরাহ্ণে কেবলমাত্র দুখানা স্লুপ খালের মুখে পাহারা রেখে নরনারায়ণ রায় ফিরে চ'লে গেলেন।

এই ঘটনার দিন-কয়েক পরে, পর্ত্তুগীজ জলদস্যুর দল লুঠপাট ক'রে চ'লে গেলে, কীর্ত্তি রায়ের এক কর্ম্মচারী গড়ের মধ্যে প্রবেশ করে। আক্রমণের দিন সকালেই এ লোকটি গড় থেকে আরও অনেকের সঙ্গে পালিয়েছিল। ঘুরতে ঘুরতে একটা বড় থামের আড়ালে সে দেখতে পেলে একজন আহত মুমূর্ষু লোক তাকে ডেকে কি বলবার চেষ্টা করছে। কাছে গিয়ে সে লোকটাকে চিনলে—লোকটি কীর্ত্তি রায়ের পরিবারের এক বিশ্বস্ত পুরোনো কর্ম্মচারী। তার মৃত্যুকালীন অস্পষ্ট বাক্যে আগন্তুক কর্ম্মচারীটি মোটামুটি যা বুঝলে, তাতেই তার কপাল ঘেমে উঠল। সে বুঝলে কীর্ত্তি রায় তাঁর পরিবারবর্গ এবং ধনরত্ন নিয়ে মাটির নীচের এক গুপ্তস্থানে আশ্রয় নিয়েছেন এবং এই লোকটিই একমাত্র তার সন্ধান জানে। তখনকার আমলে এই গুপ্ত গৃহগুলি প্রায় সকল বাড়ীতেই থাকত এবং এর ব্যবস্থা এমন ছিল যে বাইরে থেকে কেউ এগুলো না খুলে দিলে তা থেকে বেরুবার উপায় ছিল না।…কোথায় সে মাটির নীচে ঘর, তা স্পষ্ট ক'রে বলবার আগেই আহত

লোকটি মারা গেল। বহু অনুসন্ধানেও গড়ের কোন্ অংশে সে গুপ্ত-গৃহ ছিল তা কেউ সন্ধান করতে পারলে না।

এই রকমে কীর্ত্তি রায় ও তাঁর পরিবারবর্গ অনাহারে তিলে তিলে শ্বাস-রুদ্ধ হয়ে গড়ের যে কোন্ নিভৃত ভূ-গর্ভস্থ কক্ষে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন, তার আর কোন সন্ধানই হ'ল না···সেই বিরাট প্রাসাদ-দুর্গের পর্ব্বত-প্রমাণ মাটি-পাথরের চাপে হতভাগ্যদের শাদা হাড়গুলো যে কোন্ বায়ুশূন্য অন্ধকার ভূ-কক্ষে তিলি তিলে গুঁড়ো হচ্ছে, কেউ তার খবর পর্য্যন্ত জানে না।

ওই ছোট খালটা প্রকৃত পক্ষে সন্দ্বীপ চ্যানেলেরই একটা খাড়ি। খাড়ির ধার থেকে একটুখানি গেলে গভীর অরণ্যের ভিতর কীর্ত্তি রায়ের গড়ের বিশাল ধ্বংসস্তূপ এখনও বর্ত্তমান আছে দেখা যাবে। খাল থেকে কিছু দূরে অরণ্যের মধ্যে দুই সার প্রাচীন বকুল গাছ দেখা যায়, এখন এ বকুল গাছের সারের মধ্যে দুর্ভেদ্য জঙ্গল আর শূলো-কাঁটার বন, তখন এখানে রাজপথ ছিল। আর খানিকটা গেলে একটা বড় দীঘি চোখে পড়বে। তারই দক্ষিণে কুচো ইটের জঙ্গলাবৃত স্তূপে অর্দ্ধ-প্রোথিত হাঙ্গর-মুখো পাথরের কড়ি, ভাঙা থামের অংশ—বারভূঁইয়াদের বাংলা থেকে, রাজা প্রতাপাদিত্য রায়ের বাংলা থেকে বর্ত্তমান যুগের আলোয় উঁকি মারছে। দীঘির যে ইষ্টক-সোপানে সকাল-সন্ধ্যায় তখন অতীত যুগের রাজবধূদের রাঙা পায়ের অলক্তক রাগ ফুটে উঠত, এখন সেখানে দিনের বেলায় বড় বড় বাঘের পায়ের থাবার দাগ পড়ে, গোখুরা কেউটে সাপের দল ফণা তুলে ঘুরে বেড়ায়।

বহুদিন থেকেই এখানে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে থাকে। দুপুর রাতে গভীর বনভূমি যখন নীরব হয়ে যায়, হিন্তাল হিজল গাছের কালো গুঁড়িগুলো অন্ধকারে যখন বনের মধ্যে প্রেতের মত দাঁড়িয়ে থাকে···সন্দ্বীপ চ্যানেলের জোয়ারের ঢেউয়ের আলোকোৎক্ষেপী লোনা জল খাঁড়ির মুখে জোনাকীর মতন জ্বলতে থাকে···তখন খাল দিয়ে নৌকা বেয়ে যেতে যেতে মোম-মধু সংগ্রাহকেরা কতবার শুনেছে, অন্ধকার বনের এক গভীর অংশ থেকে কারা যেন আর্ত্তস্বরে চীৎকার করছে—ওগো পথযাত্রীরা, ওগো নৌকাযাত্রীরা···

আমরা যে এখানে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গেলাম···দয়া ক'রে আমাদের তোলো ···ওগো আমাদের তোলো···

ভয়ে বেশী রাত্রে এ পথে কেউ নৌকা বাইতে চায় না।

খুকীর কাণ্ড

হরি মুখুয্যের মেয়ে উমা কিছু খায় না। না খাইয়া খাইয়া রোগা হইয়া পড়িয়াছে বড়।

উমার বয়স এই মোটে চার। কিন্তু অমন দুষ্ট মেয়ে পাড়া খুঁজিয়া আর একটি বাহির ক'রো তো দেখি?···তাহার মা সকালে দুধ খাওয়াইতে বসিয়া কত ভুলায়, কত গল্প ক'রে, সব মিথ্যা হয়। দুধের বাটিকে সে বাঘের মত ভয় ক'রে—মায়ের হাতে দুধের বাটি দেখিলেই সোজা একদিকে টান্ দিয়া দৌড়।

মা বলে—রও দুষ্টু মেয়ে, তোমাব দুষ্টুমি আমি···দুধ খাবেন না, সুজি খাবেন না, খাবেন যে কি দুনিয়ায় তাও তো জানি নে—চ'লে আয় ইদিকে···

খুকী নিরুপায় দেখিয়া কান্না সুরু করে। তাহায় মা ধরিয়া ফেলিয়া জোব করিয়া কোলে শোয়াইয়া ঝিনুক মুখে পুরিয়া দুধ খাওয়ায়। কিন্তু জোর-জবরদস্তিতে অর্দ্ধেকের ওপর দুধ ছড়াইয়া গড়াইয়া অপচয় হয়, বাকী অর্দ্ধেকটুকু কায়ক্লেশে খুকীর পেটে যায় কি না যায়।

সময়ে সময়ে সে আবার মেয়ের সঙ্গে লড়াই করে। চার বছব বয়স বটে, না খাইয়া খাইয়া কাটি কাটি হাত পাও-বটে, কিন্তু তাহাকে কায়দায় ফেলিতে তাহার মায়ের এক একদিন গল্‌দঘর্ম্ম। রাগ করিয়া মা বলে—থাক্ আপদ বালাই কোথাকার, না খাস তো বয়ে গেল আমার—সারাদিন খেটে খেটে মুখে রক্ত উঠবে, আবার ওই দস্যি মেয়ের সঙ্গে দিনে পাঁচবার কুস্তী ক'রে দুধ খাওয়াবার শক্তি আমার নেই—মর্ শুকিয়ে।

খুকী বাঁচিয়া যায়, ছুটিয়া এক দৌড়ে বাড়ীর সামনের আমতলায় দাঁড়াইয়া চেঁচাইয়া সমবয়সী সঙ্গিনীকে ডাকে—ও নেনু উ-উ···

তাহার বাবা একদিন বাড়ীতে বলিল—দেখ খুকীটাকে আজ দিন পনেরো ভাল ক'রে দেখিনি—আসবার সময় দেখি পথের ওপর খেলা ক'চ্ছে, এমনি রোগা হয়ে গিয়েছে যেন চেনা যায় না, পিঠটা সরু, কণ্ঠার হাড়

বেরিয়েছে, অসুখ-বিসুখ নেই, দিন দিন ওরকম রোগা হয়ে পড়ছে কেন বলো তো?

খুকীর মা বলে—পড়বে না আর রোগা হয়ে? সারা দিন রাতে ক'ঝিনুক দুধ পেটে যায়? মরে মরুক, আমি আর পারি নে লড়াই করতে....কে এখন ওই দস্যি মেয়েকে রোজ রোজ যায় দুধ খাওয়াতে? যা-ই ওর কপালে থাকে তাই হোক গে...

তাই হয়। দস্যি মেয়ে শুকাইতে থাকে।

ভাদ্র মাস, হঠাৎ বর্ষা বন্ধ হইয়া রৌদ্র বড় চড়িয়া উঠিয়াছে, গ্রামের ডোবা পুকুরে সারা গাঁয়ের পাটক্ষেতের পাটের আঁটি ভিজানো।...নদীর ধারে কাশের ফুল ফুটিয়াছে।

গ্রামের হীরু চক্রবর্ত্তীর আড়তে এই সময়ে কাজকর্ম্মের বড় ভীড়। নানাদেশের ধানের ও পাটের নৌকা সব গঙ্গার ঘাটে জড়ো হইয়াছে। হরিশ যুগী আড়তের কয়াল—কাঁটার ফের্ত্তায় এক মণ ধানে আরও সের দশেক ঢুকাইয়া লওয়া তাহার কাছে ছেলেখেলা মাত্র। হাজরের মুখখোদাই বড় একখানা মহাজনী নৌকা হইতে ধানের বস্তা নামিতেছে, পট্‌পটি গাছের ছায়ায় উঁচুকরা ধানের স্তূপ হইতে হরিশ সুর সংযোগে কাঁটায় করিয়া ধান মাপিতেছে—রাম—রাম—রাম হে, রাম—রাম হে দুই—দুই দুই—দুই হে তিন—তিন তিন··

গফুর মাঝি ডাবা হুঁকায় তামাক টানিতে টানিতে বলিতেছে—তা নেন্ গো কয়াল মশাই, একটু হাত চালিয়ে নেন্ দিকি মোরা একবার দেখি? ইদিকি নোনা গাঙের গোন্ নামলি কি আর নৌকা বাইতি দেবানে?

হরি মুখুয্যে মহাশয়কে একটু ব্যস্ত-সমস্তভাবে আসিতে দেখিয়া হীরু চক্রবর্ত্তী বলিলেন—আরে এস হরি, কি মনে ক'রে?...এসো তামাক খাও...

—না থাক তামাক—ইয়ে আমার মেয়েটাকে ইদিকে দেখেছ হীরু? না?....বড় মুস্কিলে ফেলেছে বাঁদর মেয়ে...বারোটা বাজে, সেই বাড়ী থেকে নাকি বে'রিয়েছে সকাল ন'টার সময়...একটু দেখি ভাই খুঁজে, এত জ্বালাতনও ক'রে তুলেছে মেয়েটা, সে আর তোমাকে কি বলব...

অনেক খোঁজাখুঁজির পরে রায়বাড়ীর পথে উমাকে ধূলার উপর পা ছড়াইয়া বসিয়া কি একটা হাতে লইয়া চুষিতে ও আপন মনে বকিতে দেখা গেল।

ওরে দুষ্টু মেয়ে···

হরি মুখুয্যে গিয়া মেয়েকে কোলে তুলিয়া লইলেন। বাবার কোলে উঠিতে পাইয়া উমা খুব খুশি হইল, হাত পা নাড়িয়া বলিতে লাগিল—বাবা, ও বাবা···ওই ওদের নাহু ভারি দুত্তু···এই, এই দুধ এই খায় না···আমি দুধ খাই, না বাবা ?

—বেশ মেয়ে, দুধ খেতে হয়। ওটা কি খাচ্ছিস, হাতে কি ?

—নেবেঞ্চুশ, ওই পুঁটির মামা এসেছে, তাই দিয়েছে।

বাড়ীতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উমার শাস্তি শুরু হয়। বাটিভরা দুধ, ঝিনুক টানাটানি ইত্যাদি। তাহার কান্না, কাকুতি-মিনতি পাষাণী মা শোনে না···জোর করিয়া ঝিনুক মুখে পুরিয়া দিয়া ঢোঁকে ঢোঁকে দুধ খাওয়ায়···শেষের দিকটায় সে পা ছুঁড়িতে গিয়া খানিকটা দুধসুদ্ধ বাটিটা উল্টাইয়া ফেলিয়া দিল।

দুম্ দুম্ দুই নির্ঘাত কিল পিঠে। পিঠ প্রায় বাঁকিয়া যায়।

—হতভাগা দস্যি আপদ কোথাকার—ছ'সের ক'রে দুধ টাকায়, ভাত জোটে না, দুধের খরচ যোগাতে যোগাতে প্রাণ গেল···দস্যি মেয়ের ন্যাকরা দেখ···আদ্ধেকটা দুধ কিনা না ঠ্যাং ছুঁড়ে মাটিতে দিলে ফেলে ? ··

খুকী কম দম সাম্‌লাইয়া লইবার পরে পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিল। অনেকক্ষণ কাঁদিল।

বেলা পড়িয়া আসে। ওদের উঠানে পূর্ব্বপুরুষের আমলের বীজু আম-গাছের ছায়ায় অপরাহ্ণের রোদকে আট্‌কাইয়া রাখে। খুকী বসিয়া বসিয়া ভাবে, অপরের বাড়ীতে ভাল খাবার খাইতে পাওয়া যায়—মিষ্টি—তাহাদের বাড়ীতে শুধু দুধ আর দুধ।

তাহার মা বলিল—টিপ পরবি ও দস্যি ?

খুকী ঘাড় নাড়িয়া মায়ের কাছে সরিয়া আসিল।

—বলে নয়ন-তারা টিপ, দুটো ক'রে এক পয়সায়, বেশ টিপগুলো—স'রে এসে বোস দিকি ?

টিপ পরিয়া খুকী আবার পাড়া বেড়াইতে বাহির হয়। বাঁশবনের তলা দিয়া গুটি গুটি হাঁটে। পুনরায় সে লোভে লোভে রায়বাড়ী যায়, পরের বাড়ীতেই যত ভাল খাবার। বিস্কুট, নেবেঞ্চুস, কত কি।

নানুদের উঠানে পেঁপে গাছের মাথার দিকে তাহার চোক পড়িতে সে প্রথমটা অবাক হইয়া গেল—সঙ্গিনীকে ডাকিয়া দেখাইয়া কহিল—ও নানু, ঐ পিঁপে।

পেঁপে তাহার মা কাটিয়া খাইতে দেয়, বেশ খাইতে লাগে, কিন্তু তাহা গাছের আগ্‌ডালে কি অমন ভাবে দোলে! চাহিয়া চাহিয়া সে কিছু ঠাহর করিতে পারিল না।··

পূজার কিছু পূর্ব্বে খুকীর আপন মামা কলিকাতা হইতে আসিল। এত ধরনের খাবার কখনও সে চক্ষেও দেখে নাই। কিসমিস দেওয়া মেঠাই, বড় বড় অমৃতি জিলিপি, গজা, কমলালেবু আবও কত কি!

পাশের গ্রামে মামার এক বন্ধুর বাড়ী। মামা পবদিন সকালে উঠিয়া তাহাকে সাজাইয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিল।

পথে কে একজন সাইকেলে চড়িয়া যাইতেছে, খুকী চাহিয়া চাহিয়া দেখিল। মামাকে বলিল—ও কে গেল মামা ?

—ও রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে একজন লোক··

উমা বলিল—ফরসা মুখ, ফরসা জামা গায়, না মামা ?·· চমৎকার !···

তাহার মামা হাসিয়া বলিল—'চমৎকার' কথাটা তুই শিখলি কি ক'রে ? ···আচ্ছা খুকু তুই ওকে বিয়ে করবি ?

উমা সপ্রতিভ মুখে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল তাহার কোন আপত্তি নাই।

ভাদ্রের শেষ, ম্যালেরিয়ার সময়, তবে এখনও খুব বেশী আরম্ভ হয় নাই, বাড়ী বাড়ী কাঁথামুড়ি দেওয়া শুরু হইতে এখনও দেরী আছে। উমার হাঁটুনির বেগ নিস্তেজ হইয়া পড়িতে থাকে, ক্রমে সে মাঝে মাঝে পথের

ধারে বসিতে লাগিল, মাঝে মাঝে হাই তুলিতে লাগিল। তাহার মামা বলিল—কি হয়েছে খুকু, রদ্দুর বড্ড বেশীরে, আর বেশী নেই চল…

বন্ধুর বাড়ী পৌঁছিবার পূর্ব্বেই উমা বলিল—মামা আমার শীত লাগছে…

—শীত কি রে? ভাদ্রমাসে এই গরমে শীত? ও কিছু না, চল ..

খুকী আর কিছু না বলিয়া বেশ চলিল বটে, কিন্তু খানিক দূর গিয়া তাহার মনে হইল শীত একটু বেশী বেশীই করিতেছে। শুধু শীত নয়, তৃষ্ণাও পাইয়াছে। সে সাহসে ভর করিয়া বলিল—মামা, আমি জল খাব…

—বড় বিপদ দেখছি তো, আচ্ছা আগে চল গিয়ে পৌঁছুই—খেও এখন জল…

গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়া উমার মামা তাহার কথা ভুলিয়াই গেল। অনেকদিন পরে পুরাতন বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ, গল্পগুজব ও হাসিঠাট্টায় মসগুল হইয়া উমার সুখদুঃখের দিকে চাহিবার অবকাশ পাইল না। উমা দু'একবার কি বলিল, আলাপের গোলমালে সে কথা কেহ কানে তুলিল না।

খানিকক্ষণ পরে তাহার মামা ফিরিয়া দেখিল সে গুটিসুটি হইয়া রৌদ্রে বসিয়া আছে, মামার প্রশ্নের উত্তরে বলিল—জল খাবো মামা, জল-তেষ্টা পেয়েছে…

—দেখি? তাই তো রে, গা যে বড গবম—উঃ, খুব জ্বর হয়েছে—যে ম্যালেরিয়ার জায়গা! আয়, চল্ ওদের ঘরে শুইয়ে রাখিগে ওঠ্ ·

খুকীকে জল খাওয়াইয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া মামা পুনরায় পাড়াব দিকে বাহির হইল স্নানাহাব বন্ধুদের বাড়িতেই সম্পন্ন হইল; ক্রমে দুপুর গড়াইয়া গেল, মুখুয্যে পাড়ার হাফ-আখড়াই-এর ঘরে গ্রামের নিষ্কর্ম্মা ছোকরার দল একে একে আসিয়া পৌঁছিল, প্রকাণ্ড কেটলিতে চায়ের জল চড়িল, গল্পে গল্পে বেলা একেবারেই গেল পড়িয়া।

এতক্ষণে হঠাৎ খুকীর কথা মনে পড়িয়া গেল তাহার মামার। সে বলিল—ওই যাঃ, তোমরা বসো ভাই, খুকীটার অসুখ হয়েছে ব'লে ভোম্বলদের বাইরের ঘরে শুইয়ে রেখে এসেছি অনেকক্ষণ, দেখে আসি দাঁড়াও…

ভোম্বলদের বাড়ির বাইরের উঠানে গোয়ালের কাছে আসিতে ভোম্বলের বড় ছেলে টোনা বলিল—খুকু কোথায় কাকা?

খুকীর মামা বিস্ময়ের সুরে বলিল—কেন, সে তোদের বাইরের ঘরে শুয়ে নেই?

—না কাকা, সে তো অনেকক্ষণ আপনার কাছে যাবে ব'লে বেরিয়েছে, তখন খুব রোদ্দুর, উঠে কাঁদতে লাগল, বললে মামার কাছে যাবো—শুনলে না, তখুনি রোদ্দুরে আপনাকে খুঁজতে বেরুলো ··

—সে কি রে! আমি কোথায় আছি তা সে জানবে কেমন ক'রে? আর তোরা বা ছেলেমানুষকে ছেড়ে দিলি কি ব'লে?···বেশ লোক তো!··· আর এ মেয়ে নিয়েও হয়েছে—

মামা অত্যন্ত ব্যস্ত ও উদ্বিগ্নভাবে পুনরায় পাড়ার দিকে ফিরিল। পরিচিত স্থানগুলাতে খোঁজা শেষ হইল, কোথাও সে নাই, কোন্ পথ দিয়া কখন চলিয়া গিয়াছিল কাহারও চোখে পড়ে নাই, কেবল মতি মুখুয্যের ছেলে বলিল, অনেকক্ষণ আগে একটি অপরিচিত ছোট খুকীকে চড়চড়ে রৌদ্রে টলিতে টলিতে ভোম্বলদের বাড়ার উঠানের আগল পার হইয়া আসিতে দেখিয়াছিল বটে, খুকীকে সে চেনে না, ভাবিয়াছিল ভোম্বলদের বাড়ীতে কোনো কুটুম্ব হয়ত আসিয়া থাকিবে, তাহাদের মেয়ে।

অবশেষে তাহাকে পাওয়া গেল গ্রামের বাহিরের পথে। মামাকে খুঁজিতে বাহির হইয়া পথ হারাইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে নিরুপায় অবস্থায় পথের উপর বসিয়া কাঁদিতেছিল, বৃদ্ধ হারাণ সরকার দেখিতে পাইয়া লইয়া আসেন।

জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল, সে সারাদিন কিছুই খায় নাই—খাইবার মধ্যে দুপুরবেলা ভোম্বলদের বাড়ীর কোন্ ছেলে এক টুকরা আমসত্ত্ব হাতে দিয়াছিল, জ্বরের ঘোরে সেটুকু শুধু চুষিয়াছে শুইয়া শুইয়া। তাহার মামাকে সকলে বকিতে লাগিল। সরকার মশায় বলিলেন—তোমারও বাপু আক্কেলটা কি—ছোট মেয়েটাকে নিয়ে দুপুর রোদে এক কোশ হাঁটিয়ে আনলে, পথে এল তার জ্বর, দেখলেও না শুনলেও না, ওদের চণ্ডীমণ্ডপে কাৎ

ক'রে ফেলে রেখে তুমি বেঙ্গলে আড্ডা দিতে—না একটু দুধ, না কিছু—ছিঃ....

তাহার মামা অপ্রতিভ হইয়া বলিল—তা আমি কি আনতে গেছলাম, আমি বেরুবার সময় ছাড়ে না কোনো রকমেই—তোমার সঙ্গে যাবো মামা, তোমার সঙ্গে যাবো ম'মা—আমি কি করবো ?

—বেশ, খুব আদর করেছ ভাগ্নীকে—এখন চল আমার বাড়ী, ওকে একটু দুধ খাইয়ে দি, কচি মেয়েটাকে সারাদিন—ছি···

খুকীর মামা একটু দমিয়া গিয়াছিল, বাড়ী ফিরিবার সময় খুকীকে বলিল—কিন্তু বাড়ী গিয়ে কিছু বোলো না যেন খুকু ? মার কাছে যেন বোলো না যে জ্বর হয়েছিল, কি হারিয়ে গিয়েছিলে, কেমন তো ? লক্ষ্মী মেয়ে, বললে আমি কলকাতা যাবো পরশু, সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবো না···

—আমি কলকাতা যাবো মামা....

—যদি আজ কিছু না বলো, পরশু ঠিক নিয়ে যাবো—বলবি নে তো ?

কিন্তু বাড়ী পৌছিয়া খুকী বুদ্ধির দোষে সব গোলমাল করিয়া ফেলিল। তাহার শুষ্ক মুখ ও চেহারায় তাহার মা ঠাওরাইয়া লইল একটা কিছু যেন ঘটিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল—কি খেলি রে খুকী সেখানে ?

খাওয়ার কথা মামা কিছু শিখাইয়া দেয় নাই, সুতরাং খুকী বলিল—আমসত্ব খুব ভাল—এত বড় আমসত্ব···

—আমসত্ব ? আর কিছু খাস নি সেখানে সারাদিনে ? হ্যাঁ রে ও যতীশ, খুকী সেখানে কিছু খায় নি ?

—খেয়েছে বৈকি, খেয়েছে বৈকি—তা, হ্যাঁ—জানোই তো ওকে কিছু খাওয়ানোই দায়···

মা একটু আড়ালে গেলে খুকী মুখ নীচু করিয়া হাসিমুখে মামার দিকে চাহিয়া হাত নাড়িয়া বলিল—মাকে কিছু বলিনি মামা—কাল আমায় কলকাতায় নিয়ে যাবে তো ?

—ছাই যাবো, না-খাওয়ার কথা বললি কেন ? বাঁদর মেয়ে কোথাকার···

মামার রাগের কারণ খুকী কিছু বুঝিতে পারিল না।

খাওয়ার কথা সম্বন্ধে মামা তো কিছু বলিয়া দেয় নাই, তবে সে কথা যদি বলিয়া থাকে তাহার দোষ কি ?

তাহার মামা একথা বুঝিল না। রাগিয়া বলিল—তোমার জন্যে যদি আর কখনো কিছু কিনে আনি খুকী, তবে দেখো ব'লে দিলাম—কখনো আনব না, কলকাতাতেও নিয়ে যাবো না।

তাহার প্রতি এই অবিচারে খুকীর কান্না আসিল। বা রে, তাহাকে যে কথা বলিয়া দেয় নাই, তাহা বলাতেও দোষ ? সে কি করিয়া অত শত বুঝিবে ?···

খুকী খুব অভিমানী, সে চীৎকার করিয়া হাত-পা ছুড়িয়া কাঁদিতে বসিল না, এককোণে দাঁড়াইয়া চুপ করিয়া নিঃশব্দে ঠোঁট ফুলাইয়া ফুলাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

পরদিন সকালে তাহার মামা কলিকাতায় রওনা হইল—যাইবার সময় তাহার সহিত কথাটিও কহিল না।

আবার দিন কাটিতে লাগিল। বর্ষা শেষ হইয়া গেল, শরৎ পড়িল—ক্রমে শরৎও শেষ হয় হয়। পূজা এবার দেরীতে, কার্ত্তিক মাসের প্রথমে, কিন্তু বাড়ী-বাড়ী সবাই জ্বরে পড়িয়া, পূজায় এবার আনন্দ নাই। প্রবীণ লোকেও বলিতে লাগিলেন, এরকম দুর্ব্বৎসর তাঁহারা অনেকদিন দেখেন নাই।

উমা সারা আশ্বিন ধরিয়া ভুগিয়া সারা হইয়াছে। একে কিছু না খাওয়ার দরুণ রোগা, তাহার উপর জ্বরে ভুগিয়া রোগা—তাহার শরীরে বিশেষ কিছু নাই। তবুও জ্বরটা একটু ছাড়িলেই কাঁথা ফেলিয়া উঠিয়া পড়ে···কারুর কথা শোনে না—তারপর গয়লা-পাড়া, সদ্‌গোপ পাড়া, কোথায় নবীন ধোপার তেঁতুলতলা—এই করিয়া বেড়ায়। বাড়ী ফিরিলেই দুম্ দুম্ কিল পড়ে পিঠে! মা বলে—দস্যি মেয়ে, মরেও না যে আপদ চুকে যায়, কবে যাবে বষ্ঠীর মাঠে। কবে তোমায় রেখে খুকী-খুকী ব'লে কাঁদতে কাঁদতে আসবো···

ওঘর হইতে বড়-জা বলিয়া ওঠে—আচ্ছা, ওসব কি কথা সকাল বেলা ছোট বৌ···বলি মেয়েটার ষষ্ঠীর মাঠে যাবার আর তো দেরী নেই, ওর শরীরে আর আছে কি?···তার ওপর রোগা মেয়েটাকে ওই রকম ক'রে মার?···ছি ছি, একটা পেটে ধ'রেই এত ব্যাজার তবুও যদি আর দু'একটা হ'ত! ··এস উমা, আমার' দাওয়ায় এসো তো মাণিক? এসো এদিকে?···

তাহার মা পাল্টা জবাব দিয়া বলে—বেশ করছি, আমি আমার মেয়েকে বলব তাতে পরের গা জ্বলে কেন? যাসনে ওখানে, যেতে হবে না। সৌখীন কথা সকলে বলতে পারে—যখন জ্বর হয়ে প'ড়ে থাকে, তখন যত্ন করতে তো কাউকে এগুতে দেখিনে—তখন তো রাত জাগতেও আমি, ডাক্তার ডাকতেও আমি, ওষুধ খাওয়াতেও আমি—মুখের ভালবাসা অমন সবাই বাসে···

দুই জায়ে তুমুল ঝগড়া বাধিবার কথা বটে এ অবস্থায়, কিন্তু বড় জা হরমোহিনী বড় ভাল মানুষ। সাতেপাঁচে থাকিতে ভালবাসে না, খুকীর ওপর একটা স্নেহও আছে, সে কিছু না বলিয়া নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া যায়।

পূজার সময় খুকীর মামা আবার আসিল। তাহারও বয়স এই কুড়ি একুশের বেশী নয়, এই দিদিটি ছাড়া সংসারে তাহার আর কেহ নাই। এতদিন কলিকাতায় চাকুরির চেষ্টায় ছিল, পূজার কিছুদিন মাত্র পূর্ব্বে কোন্ ছাপাখানায় মাসিক আঠারো টাকা বেতনে লিনোটাইপের শিক্ষানবিশী করিতে ঢুকিয়াছে।

অনেক খাবারদাবার, খুকীর জন্যে ভাল ভাল দু'তিনটা রঙিন জামা, ছোট ডুরে শাড়ী ও জাপানী রবারের জুতা আনিয়াছে। তাহার দিদি বকে—এসব বাপু কেন আনতে যাওয়া, সবে তো চাকরি হয়েছে, নিজের এখন কত খরচ রয়েছে, দু' পয়সা হাতে জমাও, ভাল খাও দাও—শরীর তো এবার দেখছি বড্ডই খারাপ—অসুখ-বিসুখ হয় নাকি?···

ছেলেটি হাসিয়া বলে—না দিদি অসুখ-বিসুখ তো নয়, বড্ড খাটুনি, সকাল ন'টা থেকে সারাদিন বিকেল ছটা অবধি—এক একদিন আবার রাত আটটাও বাজে—এক একদিন আবার রবিবারেও বেরুতে হয়, তবে তাতে

ওভার-টাইম পাওয়া যায় বারো আনা ক'রে—এবার গুড় উঠলে এক কলসী গুড় নিয়ে যাবই এখান থেকে, ভিজে ছোলা আর গুড় সকালে উঠে বেশ জলখাবার হবে…

তারপর সে চীনামাটির খেলনা বাহির করিয়া খুকীকে ডাকে—ও উমা, দেখে যা কেমন কাঁচের ঘোড়া সেপাই, এদিকে আয়…

খুকী নাচিতে নাচিতে ছুটিয়া আসিল, মামা আসাতে খুকীর খুব আহ্লাদ হইয়াছে, এসব ধরণের খাবার মামা না আসিলে তো পাওয়া যায় না!…পূজার কয়দিন খুকী মামার কাছেই সর্ব্বদা থাকিল। সকাল হইতে না হইতে খুকী চোখ মুছিয়া আসিয়া মামার কাছে বসে, মাঝে মাঝে বলে, এবার কলকাতায় নিয়ে যাবে না মামা?

পূজা ফুরাইয়া গেলে খুকীর মামা দিদির কাছে প্রস্তাবটা উঠায়, দিদি সহোদর বোন নয়, বৈমাত্রেয়, তবুও তাহাকে বেশ ভালবাসে, যত্ন করে। সেও ছুটি-ছাটা পাইলে এখানে আসে। স্বামী-স্ত্রীতে পরামর্শ করিয়া দিন-দশেকের জন্য আপাততঃ খুকীকে কলিকাতায় ঘুরাইয়া আনিবার সম্মতি দিল।

খুকীর মামা খুশি হইয়া বলে—আমি ওকে লেখাপড়া শেখাবো, সেখানে গিয়ে মহাকালী পাঠশালায় ভর্ত্তি ক'রে দেব—দেখতে পাই কেমন গাড়ী আসে, বাড়ী থেকে ছেলে-মেয়েদের তুলে নিয়ে যায়—গাড়ীর গায়ে নাম লেখা আছে 'মহাকালী পাঠশালা'।

ভগ্নীপতি হরিশ মুখুজ্যে বলেন—পাগল আর কি! অতটুকু মেয়ে স্কুলে ভর্ত্তি আবার কি হবে?…হুজুগে পড়ে যেতে চাচ্ছে—ছেলেমানুষ, ও কি আর গিয়ে টিকতে পারে? যাও নিয়ে দু'দিন—এখানে তো ম্যালেরিয়ায় ম্যালেরিয়ায় হাড় সার ক'রে তুলেছে—যদি দু'দিন হাওয়া বদলাতে পারলে সেরে যায়…

ট্রেনে কলিকাতা আসিবার পথে উমা খুব খুশি। প্রথমটা তার ভয় হইয়াছিল, রেলগাড়ীর জানালার ধারে মামা বসাইয়া দিয়াছে, গাড়ীটা

চলিতেই খুকীর মনে হইল তাহার পায়ের তলা হইতে মাটিটা সরিয়া যাইতেছে, ভয়ে তাহার চোখ বড় বড় হইল—আতঙ্কে মামাকে জড়াইয়া ধরিতে যাইতেই তাহার মামা হাসিয়া বলিল—ভয় কি, ভয় কি খুকু? এ যে রেলের গাড়ী—দেখ আরও কত জোরে যাবে এখন···

রেলগাড়ী চড়িবার আনন্দকে যে বয়সে বুদ্ধি দিয়া উপভোগ করা যায়, উমার সে বয়স হয় নাই। সে শুধু চুপ করিয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া বসিয়া থাকে। মাঝে মাঝে তাহার মামা উৎসাহের সুরে বলে—কেমন রে খুকী, সব কেমন বল্ তো? কেমন লাগছে রেলগাড়ী?···

খুকী বলে—খুব ভাল···

কিন্তু খানিকক্ষণ পরে তাহার মামা দুঃখের সহিত লক্ষ্য করে যে খুকী বসিয়া বসিয়া ঢুলিতেছে, দেখিতে দেখিতে সে ঘুমাইয়া পড়ে।

গাড়ী কলিকাতায় পৌঁছিলে একখানা রিক্সা ভাড়া করিয়া তাহার মামা তাহাকে বাসায় আনিল। অখিল মিস্ত্রির লেনে একটা ছোট মেসে বাসা, অফিসের বাবুদের মেস, সকলেই বয়সে প্রবীণ, সেই কেবল অল্পবয়স্ক। খুকীর আকস্মিক আবির্ভাবে সকলেরই আনন্দ হইল। বাড়ীতে ছেলেমেয়ে সকলেরই আছে, কিন্তু চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা মাস-মাহিনার বেড়াজালে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়াইয়া পড়িবার দরুণ মাসে একবার কি দুইবার ভিন্ন বাড়ী যাওয়া ঘটে না, ছেলেমেয়ের মুখ দেখিতে পাওয়া যায় না। খুকীকে পাইয়া একটা অভাব দূর হইল। চার পাঁচ বছরের ছোট ফুটফুটে মেয়ে চাঁদের মত মুখখানি, কোঁকড়া কোঁকড়া কালো চুল, কালো চোখের তারা—আপিসের ছুটির পর তাহাকে লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়। এ ডাকে উহার ঘরে, ও ডাকে তাহার ঘরে।

কিন্তু তাহার মামার বড় দুঃখ, খুকীর বেশভূষা একেবারে খাঁটি পাড়াগেঁয়ে। মাথায় বিনুনী, কপালে কাঁচপোকার টীপ, অতটুকু মেয়ের পায়ে আবার আল্‌তা, ছোট চুমুরী শাড়ী পরণে, ওসব সেকেলে কাণ্ড আজকাল শহর বাজারে কি আর চলে? দিদি পাড়াগাঁয়ে পড়িয়া থাকে, শহরের রীতিনীতি বেশভূষার কি ধার ধারিবে? এখানকার ভদ্রঘরের ছেলে-

মেয়েদের কেমন সুন্দর চুলের বিন্যাস, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ফিটফাট সাজানো, দেখিতে যেন কাঁচের পুতুল। খুকীকে ঐ রকম সাজানো যায় না?

ভাবিয়া ভাবিয়া সে খুকীকে সঙ্গে করিয়া ট্রামে ধর্ম্মতলার এক চুল-ছাটাই দোকানে লইয়া গেল। নাপিতকে বলিল—ঠিক সায়েবদের ছেলে-মেয়েদের মত যদি চুল কাটতে পার তবে কাঁচি ধর, নইলে অমন ঘন কালো চুল নষ্ট কোরো না যেন।

মেস হইতে সে খুকীর মাথার বিনুনী খুলিয়া আনিয়াছিল।

চুল ছাঁটিতে উমার বেশ ভাল লাগিতেছিল। সামনে একখানা প্রকাণ্ড আয়না, চার পাঁচটা বড় বড় আলো জ্বলিতেছে, নাপিত মাঝে মাঝে আবার ময়দার মত কি একটা গুঁড়া তাহার ঘাড়ের চুলে মাখাইতেছিল···এমন সুড়সুড়ি লাগে।···

তাহাকে সাজাইতে খুকীর মামা পাঁচ ছয় টাকা খরচ করিয়া ফেলিল। মেসের নিয়োগী মশায় একে একে কয়েকটি পুত্র কন্যাকে উপরি উপরি চার পাঁচ বৎসরের মধ্যে হারাইয়াছেন, উমাকে পাইয়া আর ছাড়িতে চাহিতেন না। সন্ধ্যার পর রঙিন ফ্রক পরা, বব্‌ড্‌ চুল, মুখে পাউডার পায়ে জরির জুতা, আর এক উমা যখন তাহার ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহাকে দেখিয়া তো নিয়োগী মশায় বিষম খাইবার উপক্রম করিলেন।

তাহার মামা হাসিয়া বলে—গেলই না হয় কিছু খরচ হয়ে, এমন সুন্দর মেয়ে কি ক'রে ভূত সাজিয়ে রেখেছিল বলুন দিকি?···ও কুণ্ডু মশায়, চেয়ে দেখুন, পছন্দ হয়?

কি করিয়া খুকীর শীর্ণতা দূর করা যাইতে পারে, এ সম্বন্ধে নানা পরামর্শ চলিল। গলির মোড়ের একজন ডাক্তার কড্‌লিভার অয়েল ও কেপ্‌লারের মল্‌ট্‌ এক্সট্রাক্টের ব্যবস্থা দিলেন, তাহা ছাড়া বলিলেন—খাওয়া চাই, না খেয়ে খেয়ে এমন হয়েছে—পুষ্টির অভাব, এ বয়সে এদের খুব পুষ্টিকর জিনিষ খাওয়ানো চাই কিনা? সকালে কোয়েকার ওট্‌স্ খাওয়াবেন দিন পনেরো, দেখুন কেমন থাকে।

কিন্তু চতুর্থ দিনে খুকীর কম্প দিয়া জ্বর আসিল। খুকীর মামার

লিনোটাইপের কাজে যাওয়া হইল না, সারাদিনই খুকীর কাছে বসিয়া রহিল। অন্য দিন বৃদ্ধ নিয়োগী মহাশয়ের তত্বাবধানে রাখিয়া ছাপাখানায় যাওয়া চলিত, আজ আর তাহা হইল না।···সন্ধ্যার পূর্ব্বে জ্বর ছাড়িয়া গেল, খুকী উঠিয়া বসিয়া এক টুকরা মিছরি চুষিতে লাগিল। আপিসফেরতা ফণিবাবু একটা বেদনা ও গোটাকতক কমলালেবু খুকীর জন্য আনিয়াছেন, সতীশবাবু পোয়াটাক ছোট আঙুর ও পুনরায় গোটাতিনেক কমলালেবু, আরও দু'তিন জনের প্রত্যেকেই কিছু-না-কিছু কিনিয়া আনিয়াছেন।··· সকলে চলিয়া গেলে খুকী মামার দিকে একবার চাহিল, পরে ঠোঁট ফুলাইয়া মাথা নীচু করিল। মামা বিস্মিত হইয়া বলিল—কি রে খুকী? কি হয়েছে?···

খুকী দুঃখের চাপা কান্নার মধ্যে বলিল—বাড়ী যাব মামা···মার কাছে যাবো···

—আচ্ছা, কেঁদো না খুকু—জ্বর সারুক, নিয়ে যাবো এখন।

দু'তিন দিন গেল। জ্বর সারিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু রাত্রে মাঝে মাঝে সে ঘুমের ঘোরে মায়ের জন্য কাঁদিয়া ওঠে।·· ভুলাইবার জন্য তাহাকে একদিন হগ সাহেবের বাজারের খেলনার দোকানে লইয়া যাওয়া হইল, সেখানে একটা খুব বড় মোমের খোকা পুতুল তাহার খুব পছন্দ হইল, কিন্তু দামটা বড় বেশী, সাড়ে চার টাকা—খুকীর মামার একমাসের মাহিনার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। মামা বলিল—অন্য একটা পুতুল পছন্দ কর খুকু, ওটা ভাল না, কেমন ছোট ছোট এই সব কুকুর, হাতী, কেমন না?

খুকী দ্বিরুক্তি না করিয়া ঘাড় নাড়িল বটে, কিন্তু পুতুলটা ফিরাইয়া দিবার সময় (সে পূর্ব্ব হইতেই পুতুলটাকে দখল করিয়া বসিয়াছিল) তাহার ডাগর চোখ দুটি ছল্ ছল্ করিয়া আসিল।

দোকানদার বলিল—বাবু, খুকীর মনে কষ্ট হয়েছে, আপনি বড় পুতুলটাই নিন্, কিছু কমিশন বাদ দিয়ে দিচ্ছি···

তাহার মামা বলিল—আচ্ছা, আচ্ছা খুকু, তুমি বড় খোকা-পুতুলটাই নাও—কুকুরের দরকার নেই—ধর বেশ ক'রে যেন ভাঙে না দেখো···

প্রায় এক সপ্তাহ কাটিয়াছে। সেদিন রবিবার, খুকীর মামা বিশেষ কারণে চেতলার হাটে এক বন্ধুর সহিত দেখা করিতে গিয়াছে। এখনি আসিবার কথা, কিছু টাকা পাওনা আছে, তাহারই আদায়ের চেষ্টার যাওয়া, ততক্ষণ অন্যান্য দিনের মত নিয়োগী মহাশয়ের তত্ত্বাবধানেই খুকীর থাকিবার কথা।...খানিকক্ষণ খুকীর সহিত গল্পগুজব করিবার পরে বৃদ্ধ নিয়োগী মশায়ের মাধ্যাহ্নিক নিদ্রাকর্ষণ হইল। কথা বলিতে বলিতে খুকী দেখিল তিনি আর কথা বলিতেছেন না, অল্প পরেই তাঁহার নাসিকা গর্জ্জন সুরু হইল। মেসে কোন ঘরে কেহ নাই, উমার ভয় ভয় করিতে লাগিল। একবার সে জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া চাহিয়া দেখিল, গলির মোড়ে দুজন কাবুলীওয়ালা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গল্প করিতেছে, তাহাদের ঝোলাঝুলি, লম্বা চেহারায় ভয় পাইয়া সে জানালা হইতে মুখ সরাইয়া লইল।

মামা কোথায় গেল ?...মামা আসে না কেন ?

সে ভয় পাইয়া ডাকিল—ও জ্যাতাবাবু, জ্যাতাবাবু ?...

তাহার মামা তাহাকে শিখাইয়া দিয়াছে নিয়োগী মহাশয়কে জ্যাঠাবাবু বলিয়া ডাকিতে।

সাড়া না পাইয়া সে আর একবার ডাকিল—আমার মামা কোথায় ও জ্যাতাবাবু ?·

নিয়োগী মহাশয় জড়িতস্বরে ঘুমের ঘোরে বলিলেন—হুঁ...আচ্ছা, আচ্ছা...

তিনি স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, দেশের বাটিতে রাত্রিতে শুইয়া আছেন, মালপাড়ার কেতু মাল চৌকীদার লাঠি ঘাড়ে রোঁদে বাহির হইয়া তাঁহার নাম ধরিয়া হাঁক দিতেছে।

খুকী এদিক-ওদিক চাহিয়া উঠিয়া পড়িল—সিঁড়ির দরজা খোলা ছিল, সে নামিয়া নীচে আসিল। ঝি চাকর রান্নাঘরে তালা বন্ধ করিয়া অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে, একটা কালো বিড়াল চৌবাচ্চার উপর বসিয়া মাছের কাঁটা চিবাইতেছে।

বাহির হইয়াই রাস্তা। খুকীর একটা অস্পষ্ট ধারণা আছে যে, এই

লিনোটাইপের কাজে যাওয়া হইল না, সারাদিনই খুকীর কাছে বসিয়া রহিল। অন্য দিন বৃদ্ধ নিয়োগী মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া ছাপাখানায় যাওয়া চলিত, আজ আর তাহা হইল না।···সন্ধ্যার পূর্ব্বে জ্বর ছাড়িয়া গেল, খুকী উঠিয়া বসিয়া এক টুকরা মিছরি চুষিতে লাগিল। আপিসফেরতা ফণিবাবু একটা বেদনা ও গোটাকতক কমলালেবু খুকীর জন্য আনিয়াছেন, সতীশবাবু পোয়াটাক ছোট আঙুর ও পুনরায় গোটাতিনেক কমলালেবু, আরও দু'তিন জনের প্রত্যেকেই কিছু-না-কিছু কিনিয়া আনিয়াছেন।··· সকলে চলিয়া গেলে খুকী মামার দিকে একবার চাহিল, পরে ঠোঁট ফুলাইয়া মাথা নীচু করিল। মামা বিস্মিত হইয়া বলিল—কি রে খুকী? কি হয়েছে?···

খুকী দুঃখের চাপা কান্নার মধ্যে বলিল—বাড়ী যাব মামা···মার কাছে যাবো···

—আচ্ছা, কেঁদো না খুকু—জ্বর সারুক, নিয়ে যাবো এখন।

দু'তিন দিন গেল। জ্বর সারিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু রাত্রে মাঝে মাঝে সে ঘুমের ঘোরে মায়ের জন্য কাঁদিয়া ওঠে।··ভুলাইবার জন্য তাহাকে একদিন হগ সাহেবের বাজারের খেলনার দোকানে লইয়া যাওয়া হইল, সেখানে একটা খুব বড় মোমের খোকা পুতুল তাহার খুব পছন্দ হইল, কিন্তু দামটা বড় বেশী, সাড়ে চার টাকা—খুকীর মামার একমাসের মাহিনার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। মামা বলিল—অন্য একটা পুতুল পছন্দ কর খুকু, ওটা ভাল না, কেমন ছোট ছোট এই সব কুকুর, হাতী, কেমন না?

খুকী দ্বিরুক্তি না করিয়া ঘাড় নাড়িল বটে, কিন্তু পুতুলটা ফিরাইয়া দিবার সময় (সে পূর্ব্ব হইতেই পুতুলটাকে দখল করিয়া বসিয়াছিল) তাহার ডাগর চোখ দুটি ছল্ ছল্ করিয়া আসিল।

দোকানদার বলিল—বাবু, খুকীর মনে কষ্ট হয়েছে, আপনি বড় পুতুলটাই নিন্, কিছু কমিশন বাদ দিয়ে দিচ্ছি···

তাহার মামা বলিল—আচ্ছা, আচ্ছা খুকু, তুমি বড় খোকা-পুতুলটাই নাও—কুকুরের দরকার নেই—ধর বেশ ক'রে যেন ভাঙে না দেখো···

প্রায় এক সপ্তাহ কাটিয়াছে। সেদিন রবিবার, খুকীর মামা বিশেষ কারণে চেতলার হাটে এক বন্ধুর সহিত দেখা করিতে গিয়াছে। এখনি আসিবার কথা, কিছু টাকা পাওনা আছে, তাহারই আদায়ের চেষ্টায় যাওয়া, ততক্ষণ অন্যান্য দিনের মত নিয়োগী মহাশয়ের তত্ত্বাবধানেই খুকীর থাকিবার কথা।...খানিকক্ষণ খুকীর সহিত গল্পগুজব করিবার পরে বৃদ্ধ নিয়োগী মশায়ের মাধ্যাহ্নিক নিদ্রাকর্ষণ হইল। কথা বলিতে বলিতে খুকী দেখিল তিনি আর কথা বলিতেছেন না, অল্প পরেই তাঁহার নাসিকা গর্জ্জন সুরু হইল। মেসে কোন ঘরে কেহ নাই, উমার ভয় ভয় করিতে লাগিল। একবার সে জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া চাহিয়া দেখিল, গলির মোড়ে দুজন কাবুলীওয়ালা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গল্প করিতেছে, তাহাদের ঝোলাঝুলি, লম্বা চেহারায় ভয় পাইয়া সে জানালা হইতে মুখ সরাইয়া লইল।

মামা কোথায় গেল ?...মামা আসে না কেন ?

সে ভয় পাইয়া ডাকিল—ও জ্যাতাবাবু, জ্যাতাবাবু ?...

তাহার মামা তাহাকে শিখাইয়া দিয়াছে নিয়োগী মহাশয়কে জ্যাঠাবাবু বলিয়া ডাকিতে।

সাড়া না পাইয়া সে আর একবার ডাকিল—আমার মামা কোথায় ও জ্যাতাবাবু ?...

নিয়োগী মহাশয় জড়িতস্বরে ঘুমের ঘোরে বলিলেন—হুঁ...আচ্ছা, আচ্ছা...

তিনি স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, দেশের বাটিতে রাত্রিতে শুইয়া আছেন, মালপাড়ার কেতু মাল চৌকীদার লাঠি ঘাড়ে রোঁদে বাহির হইয়া তাঁহার নাম ধরিয়া হাঁক দিতেছে।

খুকী এদিক-ওদিক চাহিয়া উঠিয়া পড়িল—সিঁড়ির দরজা খোলা ছিল, সে নামিয়া নীচে আসিল। ঝি চাকর রান্নাঘরে তালা বন্ধ করিয়া অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে, একটা কালো বিড়াল চৌবাচ্চার উপর বসিয়া মাছের কাঁটা চিবাইতেছে।

বাহির হইয়াই রাস্তা। খুকীর একটা অস্পষ্ট ধারণা আছে যে, এই

রাস্তাটা পার হইলেই তাহার মামার কাছে পৌঁছানো যাইবে, এই পথের যেখানটাতে শেষ, সেখান হইতেই পরিচিত গণ্ডীর আরম্ভ।

ঘুরিতে ঘুরিতে সে পথ হারাইয়া ফেলিল, গলি পার হইয়া আর একটা বড় গলি, তাহার পর একটা লোহার বেড়া-ঘেরা মাঠ-মত, সেটার পাশ কাটাইয়া আর একটা গলি। ক্রমে খুকীর সব গোলমাল হইয়া গেল, এ পর্য্যন্ত সে একবারও পিছনের দিকে চাহে নাই, এবার পিছনের দিকে চাহিয়া তাহার মনে হইল সে দিকটাও সে চেনে না।···সামনের পিছনের দুই জগতই তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত, কোথাও একটা এমন জিনিষ নাই যাহা সে পূর্ব্বে কখন দেখিয়াছে।···

সে ভয় পাইয়া কাঁদিতে লাগিল। ঠিক দুপুর বেলা, পথে লোকজনও কম, বিশেষতঃ এই সব গলির মধ্যে। আরও খানিকদূর গিয়া একটা লাল রঙের বাড়ীর সামনে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে, তাহাদের বাড়ীর মতিঝিয়ের মত দেখিতে একজন স্ত্রীলোক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—কি হয়েছে খুকী, কাঁদছ কেন?···তোমাদের কোন্ বাড়ীটা, এইটে?···

খুকী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—আমি মামার কাছে যাবো···

—তোমাদের ঘর কোথা গো?

খুকী আঙুল তুলিয়া একটা দিক দেখাইয়া বলিল—ওই দিকে···

—তোমার বাপের নাম কি?

বাপের নাম···কই তাহা তো সে জানে না! বাপের নাম 'বাবা' তা ছাড়া আবার কি?···সে চোখ তুলিয়া ঝিয়ের মুখের দিকে চাহিল।

স্ত্রীলোকটি একবার গলির দুই দিকে চাহিয়া দেখিল, পরে বলিল—আচ্ছা, এস, এস খুকী, আমার সঙ্গে এস, আমি তোমার মামার কাছে নিয়ে যাচ্ছি, এস···

এ গলি, ও গলি ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে একটা ছোট্ট খোলার বাড়ী। ···ঝি কাহাকে ডাকিয়া কি একটা কথা নীচুস্বরে বলিল, তারপর দুইজনেই খানিকক্ষণ কি বলাবলি করিল, নবাগতা স্ত্রীলোকটি হাত দিয়া কি একটা দেখাইল, খুকী সে সব বুঝিতে পারিল না। পরে তাহারা খুকীকে একটা

অন্ধকার ঘরের মধ্যে লইয়া গেল⋯ ছোট ঘুলঘুলির কাছে একটা প্রকাণ্ড মাটির জালা ও তাহার চারিপাশে একরাশ অন্ধকার।⋯খুকীর কেমন ভয় ভয় করিতে লাগিল—যক্ষিবুড়ীর যে জালাতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের লুকাইয়া পুরিয়া রাখিবার গল্প শুনিয়াছে যেন সেই ধরণের জালা। সে কাঁদো কাঁদো স্বরে বলিল—আমার মামা কোথায়?⋯

নবাগতা স্ত্রীলোকটি বলিল—কেউ দেখেনি তো আনবার সময়ে? আমার বাপু ভয় করে। এই সে দিন সৈরভির বাড়ীতে পুলিশ এসে কি তম্বি, আমি থালা ফেরৎ দিতে গেনু তাই⋯

খুকীদের বাড়ীর মতি-ঝিয়ের মত দেখিতে যে স্ত্রীলোকটি সে বিদ্রূপ করিয়া বলিল – নেকু!⋅ যাও, সামনের দরজাটা খুলে ঢাক ক'রে রেখে এলে কেনে?⋯নেকু, জানে না যেন কিছু!⋯

সে খুকীকে চৌকীর উপর বসাইয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া অনেক আদরের কথা বলিল, তাহাকে একটা রসগোল্লা খাইতে দিল। পরে খুকীর হাতের সোনার বালা দু'গাছা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বলিল—এখন তুলে রেখে দি খুকী?⋯বেশ নক্ষি মেয়ে,—দেখি⋯

খুকী ভয়ে ভয়ে বলিল—বালা খুলো না⋯আমার মামাকে ডেকে দাও⋯

কিন্তু ততক্ষণ ঝি তাহার হাত হইতে বালা দু'গাছা অনেকটা খুলিয়াছে, দেখিয়া খুকী কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল—আমার বালা নিও না, মামাকে ব'লে দেবো—আমার বালা খুলো না⋯

মতি-ঝিয়ের ইঙ্গিতে নবাগতা স্ত্রীলোকটি তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল। কিন্তু একটা বিষয়ে দুজনেই বড় ভুল করিয়াছিল, উমার কাটি কাটি হাত পা দেখিয়া তাহার লড়াই করিবার ক্ষমতা সম্বন্ধে সাধারণের হয় তো সন্দেহ হইতে পারে, কিন্তু এ ধারণা যে কতদূর অসত্য, তাহা গত মাসে দুগ্ধপানের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের সময় উমার মা ভালরূপই জানিত। ইহারা সে সব খবর জানিবে কোথা হইতে? বেচারীদের ভুল ভাঙ্গিতে কিন্তু বেশী বিলম্ব হইল না, ধ্বস্তাধ্বস্তিতে বিছানা ওলটপালট হইয়া গেল, উমার আঁচড় কামড়ে মতি-ঝি তো বিব্রত হইয়া উঠিল। গোলমালে একগাছা বালা

হাত হইতে খুলিয়া কোথায় চৌকীর নীচের দিকে গড়াইয়া গেল। পিছন হইতে তাহার হাত মুখ চাপিয়া ধরিয়া অস্তগাছা নবাগত স্ত্রীলোকটি ছিনাইয়া খুলিয়া লইল।

মতি-ঝি বলিল—ছেড়ে দে, ছেড়ে দে—হাঁপিয়ে মরে যাবে—দেখি ও আপদ্ রাস্তার ওপর রেখে আসি—বাপ্ রে কি দস্যি!....

—এখন কোথায় রাখতে যাবি লো?···খ্যান্তমণিকে একটা খবর দিবি নে?

—না বাপু, তাতে আর দরকার নেই, ওকে রেখে আসি—কেউ টের পাবে না, দেখ্ না ব'সে ব'সে···

তুমুল গোলমাল খোঁজাখুজি, হৈচৈ-এর পরে সন্ধ্যার সময় উমাকে পাওয়া গেল নেবুতলার সেণ্টজেম্স্ পার্কের কোণে। কেবিন-ছাঁটাই বব্ড চুল ছেঁড়াখোঁড়া, কপালে ও গালে আঁচড়ের দাগ, হাত শুধু, ফ্রকের কোমরবন্ধ ছিঁড়িয়া ঝুলিতেছে···'মামা', 'মামা' বলিয়া কাঁদিতেছিল, অনেক লোক চারিধারে ঘিরিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছে, একজন গিয়া একটা পাহারা-ওয়ালাও ডাকিয়া আনিয়াছে—ঠিক সেই সময় নিয়োগী-মশায়, কুণ্ডুমশায়, সতীশবাবু, অখিলবাবু, খুকীর মামা সবাই গিয়া উপস্থিত হইলেন।

যথারীতি থানায় ডায়েরী ইত্যাদি হইল। কে তাহার বালা খুলিয়া লইয়াছে এ সম্বন্ধে খুকী বিশেষ কোনো খবর দিতে পারিল না। খুকীর মামাকে সকলে যথেষ্ট ভৎ'সনা করিল। খবরদারী করিবার যখন সময় নাই, তখন পরের মেয়ে আনা কেন ইত্যাদি। সবাই বলিল—যাও ওকে কালই বাড়ী রেখে এস, ছিঃ, ওই রকম ক'রে কি কখনো···মেসের সকলে চাঁদা তুলিয়া খুকীকে দু'গাছা পালিশ-করা বিলাতী সোনার বালা কিনিয়া দিল।

গাড়ীতে যাইবার সময় তাহার মামা বলিল—খুকু, বাড়ীতে গিয়ে যেন এসব কথা কিছু বোলো না!···কেমন তো?···কক্ষনো বলো না যেন?··· হ্যাঁ, লক্ষীমেয়ে—তা হলে আর কলকাতায় নিয়ে আসব না···

খুকী ঘাড় নাড়িয়া রাজী হইল। বলিল—আমায় তখন একটা পুতুল কিনে দিও মামা···আর একটা মেম-পুতুল···

ঠেলাগাড়ী

সবে বিছানা ছেড়ে উঠেছি রোদ তখনও ভাল রকম ওঠেনি—খিড়কি দোরের জগডুমুর গাছটার মাথায় গোটাকতক শালিখ পাখিতে কিচ্‌কিচ্‌ ও ঝটাপটি বাধিয়েছে—আমি উঠে মনে মনে তোলাপাড়া করছি যে কাল রাত্রের বাসি কলার বড়া যা আমাদের জন্যে রান্নাঘরের ঝুলন্ত শিকায় বড় জাম বাটীতে টাঙানো আছে—তা কোন্ অছিলায় মার কাছে চাওয়া যায়, বা মুখ ধোবার পূর্ব্বে তা চাইতে গেলে সেটা শোভনীয়ই বা কতদূর হবে—এমন সময় আমাদের বাহির দরজার কাছে একটা ঠেলাগাড়ীর ঘড়ঘড় শব্দ উঠল, সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টি রিন্‌রিনে গলায় ডাক শোনা গেল—

—টুনি-ই-ই দা-আ-আ—ও টুনি···

অমনি আমার বৃদ্ধা জেঠাইমা মারমুখি হয়ে কি একটা হাতে উঁচিয়ে ছুটে গেলেন—সকাল বেলা জুটলে এসে? এখনো কাগ পক্ষীর ঘুম ভাঙেনি অমনি এলে ছেলেটাকে টুইয়ে বার ক'রে নিয়ে যেতে? সকাল নেই, সন্ধে নেই, দুপুর নেই সব সময় ঘড়-ঘড়-ঘড়-ঘড় শব্দ—যাই দিকি একবার হর গাঙ্গুলীর কাছে, বলি, ছেলেটাকে যে দিন নেই রাত নেই গাড়ী ঘড় ঘড় ক'রে বেড়াতে দিচ্ছ ওর পরকালটা যে ঝর্‌ঝরে হয়ে গেল—যা এখন যা, টুনি এখন যাবে না। গাড়ীর ঘড় ঘড় সহ্যি হয় না বাপু সব সময়—যা ওসব নিয়ে যা···

আমি নিরীহ মুখে পূজনীয়া জেঠাইমার পিছনে এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে গাড়ীর শব্দটা আমাদের ঘাটের পথ দিয়ে দূর থেকে দূরে অস্পষ্ট হয়ে গেল, তারপর হাত মুখ ধুতে গিয়ে খিড়কী দোরের কাছে মৃদু শব্দ কানে এল—ও টুনি-দা?···আমি একবার পিছন ফিরে জেঠাইমার অবস্থিতি-স্থান ও তাঁর দৃষ্টির গতির দিক নির্ণয় ক'রে নিয়েই ঝট্ করে খিড়কী দোরটা খুলে বার হয়ে এলুম। সকালের পদ্মের মত নির্ম্মল, প্রফুল্ল, তরুণ নম্র হাসিভরা ভাগর চোখে দাঁড়িয়ে আছে।

—আসবি নে টুনি দা ?

—এই উঠলাম যে, এখনও মুখ ধুইনি, খাবারও খাইনি—বাড়ীর মধ্যে আয় না ?

নরু চোখের ইসারায় দেখিয়ে দিয়ে বললে—কোথায় ?

—কিছু বলবে না জেঠাইমা, আয় তুই···

উত্থাপিত প্রস্তাবে সে মনে প্রাণে যোগ দিতে সক্ষম হল না।

—তুই আয় মুখ ধুয়ে টুনি দা—আমি চাল্‌তে তলায় আছি গাড়ী নিয়ে, চড়বি তো টুনি দা ?

দুজনে মিলে পাড়ায় বেরিয়ে গেলুম। তেঁতুল তলায় খেলার জায়গায় খুব ভিড়—মুখুয্যে পাড়ার কোনো ছেলে আর বাকী নেই। নরু হাসি মুখে বললে—আয় পটুদা, নিতাই দা—আমি গাড়ী এনেছি—দেখ্‌ ঠিক সময়টা আসিনি ? আয় চড়্‌···গাড়ী একা নরুই টানতে লাগল। চড়ল সকলেই। পটু বললে—দুপুর বেলা আমাদের বাড়ী যাবি নরু ?

নরু ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানালে।

পটু বললে—যাস তুই—সেদিন যে একেবারে কাকার সামনে গিয়ে পড়েছিলি, তা কি হবে ?

নরু বললে—আমি আর যাচ্ছি নে তোমাদের বাড়ী পটুদা। তোমার কাকা সেদিন একেবারে মারতে···বললে রোজ রোজ গাড়ী ঠেলে বেড়ানো বার করছি। আমি না পালালে সেদিন মার খেতুম ঠিক। যদি এর পর গাড়ী কেড়ে রাখে ?

সেখান থেকে দুজনে গিয়ে পথের ধারে বড় জামতলার ছায়ায় ব'সে গল্প করলুম। রোজই কত গল্প হত। এর পরে কে কি হবে তাই নিয়ে গল্প।

খোকার অত ভবিষ্যৎ ভেবে দেখবার বয়স হয়নি। সে এর পরে কি হবে অত গুছিয়ে বলতে পারে না—খাপছাড়া ভাবে উত্তর দেয়, বলে—সে নৌকোর মাঝির সর্দ্দার হবে, রেল গাড়ীর ইঞ্জিন চালাবে, ইষ্টীমার যারা চালায়, তাদের কি বলে—তা ও হতে চায়। আমি আমার সমবয়সী

ছেলেদের তুলনায় একটু অকালপক্ব, বলতাম—আমি ভাই সায়েব ডাক্তার হব। মহকুমার হাকিম হব।…

অনেক বেলায় সে রৌদ্রে ঘুরে রাঙামুখে বাড়ী ফিরত। বাবা যেদিকে বসে, সেদিকে না গিয়ে চুপি চুপি অন্য দিক দিয়ে বাড়ী ঢোকে। মা বলত—ওরে দুষ্টু, তুমি সেই বেরিয়েছ কোন্ সকালে, আর এই দুপুর ঘুরে গেল এখন তুমি…। খোকা বলে—চুপ চুপ—না, আমি তো ওই ওদের বাড়ীর জামতলায় চুপটি ক'রে ব'সে ব'সে খেলা কচ্ছিলাম, আমি আর টুনি-দা—কোথাও তো যাইনি মা? সত্যি…

কি জানি কেন ওকে বড় ভালবাসতুম। গ্রামের সকল ছেলের চেয়ে এর মুখে চোখে, কথায় কি মোহ যে ছিল—সারাদিনটির মধ্যে একবার অন্ততঃ ওর সঙ্গে না দেখা ক'রে পারতুম না। খোকাও আমার বাড়ী না হয়ে পাড়ার অন্য কোথাও বেরুত না।

এক এক দিন আমাদের বাড়ীর সামনের জামতলা দিয়ে সে গাড়ী ঠেলে নিয়ে বাড়ী ফিরে যায় দুপুরের আগে। আমার দিকে চেয়ে বলে—এমন দুষ্টু এই নিতাইটা, এত ক'রে বললুম, চড় চড় গাড়ীতে আয় তোকে ঠেলে গয়লাপাড়া ঘুরিয়ে আনি…তা কিছুতে চড়লো না, বললে, মা বকবে, তেল আনতে যাচ্ছি—আয় চড়বি টুনি-দা?

—তোর বুঝি আজ আর কেউ চড়ার লোক হয়নি খোকা?

আমাদের পাড়ায় কেউ চড়লে না, কখন থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছি—সব যা দুষ্টু। আসবি টুনি-দা?

খোকার চোখের মিনতি-ভরা দৃষ্টি তখনকার দিনে আমার এড়াবার সাধ্য হ'ত না কোনো মতেই। আমি চড়তুম। মহা খুশির সঙ্গে খোকা চৈত্র-বৈশাখের মধ্যাহ্ন সূর্য্যকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা ক'রে গাড়ী ঠেলে নিয়ে বেড়াত…সূর্য্যও প্রতিশোধ নিতে গিয়ে ওর কচিমুখ রাঙিয়ে দিতেন…ঘামে কাপড় ভিজিয়ে দিয়ে ছাড়তেন।

তার বয়স অল্প ও দেহ অত্যন্ত ক্ষীণ মেয়েলি ধরণের ছিল ব'লে পাড়ার কোনো ছেলের সঙ্গে বলে সে পেরে উঠত না…সকলের কাছে তাকে

অবিচার সহ্য করতে হত। দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অধিকার তার ওপর নির্ব্বিবাদে জারী করত সকলেই।

সেদিনটা ছিল ভারি গরম। চৈত্র-বৈশাখের দিন গ্রামের পথের ধূলো তেতে আগুন হয়েছে—পঞ্চানন তলায় বারোয়ারীর আসর সাজানো, বাঁশের মাচা বাঁধা—সবাই কাজে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খাটছে।

বড় পিটুলি গাছতলাটায় তার ঠেলাগাড়ীর ঘড় ঘড় আওয়াজ উঠল। অনু বললে—ওই নরু আসছে। পিছনে পরমসঙ্গী কেরোসিনের ঠেলাগাড়ীটা টেনে নরু হাজির। বাঁধা আসরের দিকে এসে আঙুল দেখিয়ে বলে—যাত্রা কবে বস্‌বে রে টুনি-দা?

সংবাদ সংগ্রহের পর সে সন্তোষের হাসি হাসল। আঙুল দিয়ে গাড়ীটার দিকে দেখিয়ে বললে—চড়বি পটুদা? পটু ঘাড় নেড়ে বললে—চড়ব, টানবে কে?

খোকা খুব খুশি হয়ে বললে—কেন আমি?

আসন্ন আমোদের প্রত্যাশায় তার চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে!

পটু বললে, দূর, তুই বুঝি আমায় টানতে পারিস? টান দিকি কেমন—হয় না আর আমাকে···

—বসো না? টানতে কেমন পারিনে?

পটুর পালা শেষ হয়ে গেলে ক্রমে ক্রমে অনু, বীরু, হরু উপস্থিত সব ছেলেই উঠল গাড়ীতে। এদের মধ্যে বড় ছোট সব রকমই আছে, টানতে টানতে খোকা হয়রান হয়ে পড়লেও সে উৎসাহের সঙ্গে শেষ পর্য্যন্ত ঠিক টেনে নিয়ে বেড়াল সকলকে। সকলের শেষ হয়ে গেলে সে হেসে সকলের মুখের দিকে চেয়ে বলল—আমায় একটু এইবার টান?

সকলে মুখ চাওয়া চাওয়ি সুরু করলে। ভাবে বোঝা গেল তাকে কেউ টানতে রাজী নয়। তার প্রতি কৃপা ক'রে তার গাড়ীতে চ'ড়ে তাকে দিয়ে টানিয়ে তাকে কৃতার্থ করা হয়েছে এতে আবার তার পরকে দিয়ে টানাবার কোন্ দাবী আছে? সকলে মিলে এই ভাবটা দেখালে।

—বাঃ, সকলকে চড়িয়ে দিলাম আর আমার বেলায় বুঝি কেউ···

আমার ইচ্ছে হ'ল তাকে গাড়ীতে চড়িয়ে টানি। কিন্তু সমবয়সী ছেলেদের কাছে উপহাসের ভয়েই হোক বা তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস না থাকার দরুণই হোক—যেতে পারলুম না। সে গাড়ী টেনে নিয়ে চ'লে গেল। এদের মধ্যে পূর্ব্বে কি পরামর্শ হয়েছিল আমার জানা নেই—গাড়ীখানা খানিক দূর যেতে না যেতেই দলের একজন একটা বড় ঝামা ইট নিয়ে গাড়ীতে ছুঁড়ে মেরে বসল।

গাড়ীখানার তলা তখনি মচ্ ক'রে দেশলাইয়ের বাক্সের মত ভেঙে গেল। খোকা পিছন ফিরে চেয়ে দেখে কেমন অবাক হয়ে গেল—পরে তাড়াতাড়ি গাড়ীর ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করবার জন্যে এসে গাড়ীর অবস্থা দেখেই আর একবার বিস্ময়ের দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চাইলে। তারপর সে চাইলে আমার দিকে—তার চোখের সে ব্যথা-ভরা বিস্ময়ের অপ্রত্যাশিত না-বুঝতে-পারা দৃষ্টি আমার বুকে তীরের মত বিঁধল। ভাবটা এই রকম যে, তুইও টুনি-দা এর মধ্যে ?

কিন্তু সে কোনো কথা কাউকে না বলে ভাঙা গাড়ীটার পাশে ব'সে প'ড়ে দেখতে লাগল। এর আগেই আমাদের দল সেখান থেকে স'রে পড়েছিল!

তারপর অনেকক্ষণ সে ব'সে ব'সে নেড়ে চেড়ে দেখলে গাড়ীখানার ভাঙা তলাটা কি ক'রে সারানো যায়।···পাশে একটা ছোট বাকস্ ফুলের গাছের সাদা ডালে থোলা থোলা বাকস্ ফুল ফুলছিল—তারই পাশে গাব্ ভেরেণ্ডার ঝোপের ধারে সে গাড়ীখানা রেখে খানিক ব'সে ব'সে পরে ঠেলে নিয়ে গেল।

সারারাত ভাল ঘুম হ'ল না। সকালে ওদের বাড়ী ছুটে গিয়ে যদি ভাব ক'রে ফেলতুম তো বেশ হত, কিন্তু কেমন বাধো বাধো ঠেকতে লাগল। খোকা রোজ সকালে আসে, সেদিন এল না, অভিমানে ভুল বুঝেছে।

দু'তিন দিন ক'রে সপ্তাহ খানেক কেটে গেল।

অল্পদিন পরেই আমি বাড়ীর সকলের সঙ্গে মামার বাড়ী চ'লে গেলুম ছোট মাসীমার বিয়েতে। ফিরতে হয়ে গেল আট দশ মাস।···

খোকাকে ফিরে এসে আর দেখিনি। আগের পৌষ মাসে সে হুপিং-কাশিতে মারা গিয়েছে। ফেরবার দিন দশেক পরে একদিন ওদের বাড়ী গিয়েছিলুম। খোকার মা উঠানে কুল রৌদ্রে দিয়েছিল, তখন তুলছে, আমায় দেখে বললে—টুনি, তোরা দেশে এলি?...আমি কোনো কথা বলবার আগেই তার মা হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠল—তবুও এসেছিস তুই টুনি—আর কি কেউ আসবে এ বাড়ী বেড়াতে? খোকা যে আমায় ফাঁকি দিয়ে চ'লে গিয়েছে রে!....বোস্ বোস্, বাতাবী নেবু পাকা ঘরে আছে, কেটে দেব, খাবি নুন দিয়ে? ওই পেকে পেকে থাকে কেউ খায় না—খোকা কত খেত—খা না ব'সে ব'সে।

শরতের অপরাহ্ণ। নির্মেঘ নীল আকাশের তলায় অবসন্ন বৈকালের রৌদ্রে ডানা মেলে কি পাখি উড়ে চলেছে।...কার্নিস ভাঙা ছাদের ফাটলে কোথায় ঘুঘুর ডাক.. উঠানের ছায়া-স্নিগ্ধ বাতাস শুকনো কুলের গন্ধে ভরপুর।..

খোকার সেই ঠেলাগাড়ীখানা দেখলুম কাঠের মাচার নীচে তোলা আছে। দড়িটা পর্য্যন্ত। অনেকদিন গাড়ীটাতে কেউ হাতও দেয় নি।...

বহুকালের কথা হলেও আমি কিন্তু চোখ বুজে ভাবলেই দেখতে পাই—কতকাল আগেকার আট বৎসরের সে ছোট্ট খোকাটি ঠেলাগাড়ীটা টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছে।...নির্জ্জন দুপুরে ঘুঘুর ডাকের মধ্যে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পালেদের জামরুল বাগানের ছায়ায়..আমাদের বড় মাদার গাছটার তলাকার পথ দিয়ে, রাঙা মুখে আশা ও আনন্দ-ভরা উজ্জ্বল চোখে সে তার কেরোসিন কাঠের গাড়ীখানা টেনে টেনে নিয়ে আসছে...নারিকেল তলা বেয়ে...পটুদের বড় দো-ফলা আম গাছটার তলা বেয়ে...যেতে যেতে ক্রমে তার মূর্ত্তি মাইতি-পুকুরের মোড়ের পথে সুপারি গাছের সারির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়।...

পুঁই মাচা

সহায়হরি চাটুয্যে উঠানে পা দিয়াই স্ত্রীকে বলিলেন—একটা বড় বাটি কি ঘটি যা হয় কিছু দাও তো, তারক খুড়ো গাছ কেটেছে, একটু ভাল রস আনি।

স্ত্রী অন্নপূর্ণা খড়ের রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া শীতকালের সকাল বেলা নারিকেল তেলের বোতলে ঝাঁটার কাটি পুরিয়া তুই আঙুলের সাহায্যে ঝাঁটার কাটিলগ্ন জমানো তৈলটুকু সংগ্রহ করিয়া চুলে মাখাইতে ছিলেন। স্বামীকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি গায়ের কাপড় একটু টানিয়া দিলেন মাত্র, কিন্তু বাটি কি ঘটি বাহির করিয়া দিবার জন্য বিন্দুমাত্র আগ্রহ তো দেখাইলেনই না, এমন কি বিশেষ কোনো কথাও বলিলেন না।

সহায়হরি অগ্রবর্ত্তী হইয়া বলিলেন—কি হয়েছে, ব'সে রইলে যে?··· দাও না একটা ঘটি? আঃ, ক্ষেন্তি-টেন্তি সব কোথায় গেল এরা? তুমি তেল মেখে বুঝি ছোঁবে না?

অন্নপূর্ণা তেলের বোতলটি সরাইয়া স্বামীর দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, পরে অত্যন্ত শান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি মনে মনে কি ঠাউরেছ বলতে পার?

স্ত্রীর অতিরিক্ত রকমের শান্ত স্বরে সহায়হরির মনে ভীতির সঞ্চার হইল —ইহা যে ঝড়ের অব্যবহিত পূর্ব্বের আকাশের স্থিরভাব মাত্র, তাহা বুঝিয়া তিনি মরীয়া হইয়া ঝড়ের প্রতীক্ষায় রহিলেন। একটু আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া কহিলেন—কেন···কি আবার···কি···

অন্নপূর্ণা পূর্ব্বাপেক্ষাও শান্তস্বরে বলিলেন—দেখ, রঙ্গ কোরো না বলছি —ন্যাকামি করতে হয় অন্য সময় কোরো। তুমি কিছু জানো না, না কি খোঁজ রাখ না? অত বড় মেয়ে যার ঘরে সে মাছ ধ'রে আর রস খেয়ে দিন কাটায় কি ক'রে তা বলতে পারো? গাঁয়ে কি গুজব রটেছে জানো?

সহায়হরি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কেন?···কি গুজব?

—কি গুজব জিজ্ঞাসা করো গিয়ে চৌধুরীদের বাড়ী। কেবল বাগ্দী দুলে-পাড়ায় ঘুরে ঘুরে জন্ম কাটালে ভদ্দরলোকের গাঁয়ে বাস করা যায় না।—সমাজে থাকতে হ'লে সেই রকম মেনে চলতে হয়।

সহায়হরি বিস্মিত হইয়া কি বলিতে যাইতেছিলেন, অন্নপূর্ণা পূর্ব্ববৎ স্বরেই পুনর্ব্বার বলিয়া উঠিলেন—একঘরে করবে গো তোমাকে একঘরে করবে, কাল চৌধুরীদের চণ্ডীমণ্ডপে এসব কথা হয়েছে। আমাদের হাতে ছোঁয়া জল আর কেউ খাবে না। আশীর্ব্বাদ হয়ে মেয়ের বিয়ে হ'ল না—ও নাকি উচ্ছুগ্‌গু করা মেয়ে—গাঁয়ের কোন কাজে তোমাকে আর কেউ যেতে বলবে না—যাও, ভালই হয়েছে তোমার। এখন গিয়ে দুলে-বাড়ী, বাগ্দী-বাড়ী উঠে ব'সে দিন কাটাও।

সহায়হরি তাচ্ছিল্যের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন—এই! আমি বলি, না জানি কি ব্যাপার। একঘরে! সবাই একঘরে করেছেন এবার বাকী আছেন কালীময় ঠাকুর!—ওঃ!···

অন্নপূর্ণা তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন—কেন, তোমাকে একঘরে করতে বেশী কিছু লাগে নাকি? তুমি কি সমাজের মাথা না একজন মাতব্বর লোক? চাল নেই চুলো নেই, এক কড়ার মুরোদ নেই, চৌধুরীরা তোমায় একঘরে করবে তা আর এমন কঠিন কথা কি?—আর সত্যিই তো এদিকে ধাড়ী মেয়ে হয়ে উঠল।···হঠাৎ স্বর নামাইয়া বলিলেন—হ'ল যে পনেরো বছরের, বাইরে কমিয়ে ব'লে বেড়ালে কি হবে, লোকের চোখ নেই?···পুনরায় গলা উঠাইয়া বলিলেন—না বিয়ে দেবার গা, না কিছু। আমি কি যাব পাত্তর ঠিক করতে?···

সশরীরে যতক্ষণ স্ত্রীর সম্মুখে বর্ত্তমান থাকিবেন, স্ত্রীর গলার স্বর ততক্ষণ কমিবার কোনো সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া সহায়হরি দাওয়া হইতে তাড়াতাড়ি একটি কাঁসার বাটি উঠাইয়া লইয়া খিড়কী-দুয়ার লক্ষ্য করিয়া যাত্রা করিলেন—কিন্তু খিড়কী-দুয়ারের একটু এদিকে কি দেখিয়া হঠাৎ থামিয়া গেলেন এবং আনন্দপূর্ণস্বরে বলিয়া উঠিলেন—এসব কি রে? ক্ষেন্তি মা, এসব কোথা থেকে আনলি? ওঃ! এযে···

চোদ্দ পনেরো বছরের একটি মেয়ে আর-তুটি ছোট ছোট মেয়ে পিছনে লইয়া বাড়ী ঢুকিল। তাহার হাতে এক বোঝা পুঁই শাক, ডাঁটাগুলি মোটা ও হল্‌দে হল্‌দে চেহারা দেখিয়া মনে হয় কাহারা পাকা পুঁই গাছ উপড়াইয়া ফেলিয়া উঠানের জঙ্গল তুলিয়া দিতেছিল; মেয়েটি তাহাদের উঠানের জঞ্জাল প্রাণপণে তুলিয়া আনিয়াছে—ছোট মেয়ে তু'টির মধ্যে একজনের হাত খালি, অপরটির হাতে গোটা তুই তিন পাকা পুঁইপাতা জড়ানো কোনো দ্রব্য।

বড় মেয়েটি খুব লম্বা, গোলগাল চেহারা, মাথার চুলগুলো রুক্ষ ও অগোছালো—বাতাসে উড়িতেছে, মুখখানা খুব বড়, চোখ তু'টা ডাগর ডাগর ও শান্ত। সরু সরু কাঁচের চুড়িগুলা তু'পয়সা ডজনের একটি সেফটিপিন দিয়া একত্র করিয়া আটকানো। পিনটার বয়স খুঁজিতে যাইলে প্রাগৈতিহাসিক যুগে গিয়া পড়িতে হয়। এই বড় মেয়েটির নামই বোধ হয় ক্ষেন্তি, কারণ সে তাড়াতাড়ি পিছন ফিরিয়া তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তিনীর হাত হইতে পুঁই পাতা জড়ানো দ্রব্যটি লইয়া মেলিয়া ধরিয়া বলিল—চিংড়ি মাছ, বাবা। গয়া খুড়ীর কাছ থেকে রাস্তায় নিলাম, দিতে চায় না, বলে—তোমার বাবার কাছে আর দিনকার দরুণ তু টো পয়সা বাকী আছে, আমি বললাম—দাও গয়া পিসী, আমার বাবা কি তোমার তু'টো পয়সা নিয়ে পালিয়ে যাবে—আর এই পুঁই শাকগুলো ঘাটের ধারে রায় কাকা বললে, নিয়ে যা.. কেমন মোটা মোটা···

অন্নপূর্ণা দাওয়া হইতেই অত্যন্ত ঝাঁজের সহিত চীৎকার করিয়া উঠিলেন—নিয়ে যা, আহা কি অমর্ত্তই তোমাকে তারা দিয়েছে···পাকা পুঁইডাঁটা কাঠ হয়ে গিয়েছে, তু'দিন পরে ফেলে দিত···নিয়ে যা আর উনি তাদের আগাছা উঠিয়ে নিয়ে এসেছেন—ভালোই হয়েছে, তাদের আর নিজেদের কষ্ট ক'রে কাটিতে হ'ল না···যত পাথুরে বোকা সব মরতে আসে আমার ঘাড়ে···ধাড়ী মেয়ে, ব'লে দিয়েছি না তোমায় বাড়ীর বাইরে কোথাও পা দিও না? লজ্জা করে না, এ পাড়া সে পাড়া ক'রে বেড়াতে! বিয়ে হলে যে চার ছেলের মা হতে? খাওয়ার নামে আর জ্ঞান থাকে না, না?···

কোথায় শাক কোথায় বেগুন, আর একজন বেড়াচ্ছেন কোথায় রস, কোথায় ছাই, কোথায় পাঁশ—ফেল্ বলছি ওসব···ফেল্।···

মেয়েটি শান্ত অথচ ভয়-মিশ্রিত দৃষ্টিতে মা'র দিকে চাহিয়া হাতের বাঁধন আগলা করিয়া দিল, পুঁই শাকের বোঝা মাটিতে পড়িয়া গেল। অন্নপূর্ণা বকিয়া চলিলেন—যা তো রাধী, ও আপদগুলো টেনে খিড়কীর পুকুরের ধারে ফেলে দিয়ে আয় তো—যা, ফের যদি বাড়ীর বার হতে দেখেছি, তবে ঠ্যাং যদি খোঁড়া না করি তো···

বোঝা মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল। ছোট মেয়েটি কলের পুতুলের মতন সেগুলি তুলিয়া লইয়া খিড়কী অভিমুখে চলিল, কিন্তু ছোট মেয়ে অত বড বোঝা আকড়াইতে পারিল না, অনেকগুলি ডাঁটা এদিকে ওদিকে ঝুলিতে ঝুলিতে চলিল।···সহায়হরির ছেলেমেয়েরা তাহাদের মাকে অত্যন্ত ভয় করিত।

সহায়হরি আমতা আমতা করিয়া বলিতে গেলেন—তা এনেছে ছেলেমানুষ খাবে ব'লে···তুমি আবার···বরং···

পুঁইশাকের বোঝা লইয়া যাইতে যাইতে ছোট মেয়েটি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মার মুখের দিকে চাহিল। অন্নপূর্ণা তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—না না, নিয়ে যা, খেতে হবে না—মেয়ে মানুষের আবার অত নোলা কিসের? একপাড়া থেকে আর একপাড়ায় নিয়ে আসবে দুটো পাকা পুঁই শাক ভিক্ষে ক'রে! যা, যা····তুই যা, দূর ক'রে বনে দিয়ে আয়···

সহায়হরি বড় মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন তাহার চোখ দু'টো জলে ভরিয়া আসিয়াছে। তাঁর মনে বড় কষ্ট হইল। কিন্তু মেয়ের যতই সাধের জিনিস হোক, পুঁই শাকের পক্ষাবলম্বন করিয়া দুপুর বেলা স্ত্রীকে চটাইতে তিনি আদৌ সাহসী হইলেন না।—নিঃশব্দে খিড়কী-দোর দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।···

বসিয়া রাঁধিতে রাঁধিতে বড় মেয়ের মুখের কাতর দৃষ্টি স্মরণে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে অন্নপূর্ণার মনে পড়িল—গত অরন্ধনের পূর্ব্বদিন বাড়ীতে পুঁইশাক

রান্নার সময় ক্ষেন্তি আবদার করিয়া বলিয়াছিল—মা অর্দ্ধেকগুলো কিন্তু একা আমার, অর্দ্ধেক সব মিলে তোমাদের ?···

বাড়ীতে কেহ ছিল না, তিনি নিজে গিয়া উঠানের ও খিড়কী-দোরের আশে পাশে যে ডাঁটা পড়িয়াছিল, সেগুলি কুড়াইয়া লইয়া আসিলেন—বাকীগুলা কুড়ানো যায় না, ডোবার ধারের ছাই-গাদায় ফেলিয়া দিয়াছে। কুচো চিংড়ি দিয়া এইরূপে চুপিচুপিই পুঁইশাকের তরকারী রাঁধিলেন।

দুপুরবেলা ক্ষেন্তি পাতে পুঁইশাকের চচ্চড়ি দেখিয়া বিস্ময় ও আনন্দপূর্ণ ডাগর চোখে মায়ের দিকে ভয়ে ভয়ে চাহিল। দু'এক বার এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া আসিতেই অন্নপূর্ণা দেখিলেন উক্ত পুঁই শাকের একটুকরাও তাহার পাতে পড়িয়া নাই। পুঁই শাকের উপর তাঁহার এই মেয়েটির কিরূপ লোভ তাহা তিনি জানিতেন, জিজ্ঞাসা করিলেন—কিরে ক্ষেন্তি, আর একটু চচ্চড়ি দিই ? ক্ষেন্তি তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়িয়া এ আনন্দজনক প্রস্তাব সমর্থন করিল। কি ভাবিয়া অন্নপূর্ণার চোখে জল আসিল, চাপিতে গিয়া তিনি চোখ উঁচু করিয়া চালের বাতায় গোঁজা ডালা হইতে শুকনা লঙ্কা পাড়িতে লাগিলেন।

কালীময়ের চণ্ডীমণ্ডপে সেদিন বৈকাল বেলা সহায়হরির ডাক পড়িল। সংক্ষিপ্ত ভূমিকা ফাঁদিবার পর কালীময় উত্তেজিত স্বরে বলিলেন—সে সব দিন কি আর আছে ভায়া ? এই ধর, কেষ্ট মুখুয্যে····স্বভাব নৈলে পাত্র দেবো না, স্বভাব নৈলে পাত্র দেবো না ক'রে কি কাণ্ডটাই করলে—অবশেষে কিনা হরির ছেলেটাকে ধ'রে প'ড়ে মেয়ের বিয়ে দেয় তবে রক্ষে! তারা কি স্বভাব ? রাম বল, ছ'সাত পুরুষে ভঙ্গ, পচা শ্রোত্রিয় ! পরে স্বর নরম করিয়া বলিলেন, তা সমাজের সে সব শাসনের দিন কি আর আছে ? দিন দিন চ'লে যাচ্ছে। বেশী দূর যাই কেন এই যে তোমার মেয়েটি তেরো বছরের····

সহায়হরি বাধা দিয়া বলিতে গেলেন—এই শ্রাবণে তেরোয় ··

—আহা-হা, তেরোয় আর ষোলোয় তফাৎ কিসের শুনি ? তেরোয় আর ষোলোয় তফাৎটা কিসের ? আর সে তেরোই হোক, চাই ষোলোই হোক, চাই পঞ্চাশই হোক তাতে আমাদের দরকার নেই, সে তোমার

হিসেব তোমার কাছে। কিন্তু পাত্তুর আশীর্ব্বাদ হয়ে গেল, তুমি বেঁকে বসলে কি জন্যে শুনি? ও তো একরকম উচ্ছুগ্‌গু করা মেয়ে! আশীর্ব্বাদ হওয়াও যা বিয়ে হওয়াও তা, সাত-পাকের যা বাকী, এই তো?·· সমাজে ব'সে এ সব কাজগুলো তুমি যে করবে আর আমরা ব'সে ব'সে দেখব এ তুমি মনে ভেব না। সমাজের বামুনদের যদি জাত মারবার ইচ্ছে না থাকে, মেয়ের বিয়ের বন্দোবস্ত ক'রে ফেল।···পাত্তর পাত্তর, রাজপুত্তুর না হলে কি পাত্তর মেলে না?···গরীব মানুষ, দিতে-থুতে পারবে না ব'লেই শ্রীমন্ত মজুমদারের ছেলেকে ঠিক ক'রে দিলাম। লেখাপড়া নাই বা জানলে? জজ মেজেষ্টার না হলে কি মানুষ হয় না? দিব্যি বাড়ী বাগান পুকুর শুনলাম এবার নাকি কুঁড়ির জমিতে চাট্টি আমন ধানও করেছে, ব্যস্—রাজার হাল। দুই ভাইয়ের অভাব কি?···

ইতিহাসটা হইতেছে এই যে, মণিগাঁয়ের উক্ত মজুমদার মহাশয়ের পুত্রটি কালীময়ই ঠিক করিয়া দেন। কেন কালীময় মাথা ব্যথা করিয়া সহায়হরির মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ মজুমদার মহাশয়ের ছেলের সঙ্গে ঠিক করিতে গেলেন তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া কেহ কেহ বলেন যে, কালীময় নাকি মজুমদার মহাশয়ের কাছে অনেক টাকা ধারেন, অনেকদিনের সুদ পর্য্যন্ত বাকী—শীঘ্র নালিশ হইবে, ইত্যাদি। এ গুজব যে শুধু অবান্তর তাহাই নহে, ইহার কোন ভিত্তি আছে বলিয়াও মনে হয় না। ইহা দুষ্ট পক্ষের রটনা মাত্র। যাহাই হউক, পাত্রপক্ষ আশীর্ব্বাদ করিয়া যাওয়ার দিন কতক পরে সহায়হরি টের পান পাত্রটি কয়েক মাস পূর্ব্বে নিজের গ্রামে কি একটা করিবার ফলে গ্রামের এক কুম্ভকার-বধূর আত্মীয়-স্বজনের হাতে বেদম প্রহার খাইয়া কিছুদিন নাকি শয্যাগত ছিল। এ রকম পাত্রে মেয়ে দিবার প্রস্তাব মনঃপূত না হওয়ায় সহায়হরি সে সম্বন্ধ ভাঙিয়া দেন।

দিন দুই পরের কথা। সকালে উঠিয়া সহায়হরি উঠানে বাতাবীলেবু গাছের ফাঁক দিয়া যেটুকু নিতান্ত কচি রাঙা রৌদ্র আসিয়াছিল, তাহারই আতপে বসিয়া আপন মনে তামাক টানিতেছেন। বড় মেয়ে ক্ষেন্তি আসিয়া চুপি চুপি বলিল—বাবা, যাবে না? মা ঘাটে গেল···

সহায়হরি একবার বাড়ীর পাশে ঘাটের পথের দিকে কি জানি কেন চাহিয়া দেখিলেন, পরে নিম্নস্বরে বলিলেন, যা শীগগির সাবলখানা নিয়ে আয় দিকি ? কথা শেষ করিয়া তিনি উৎকণ্ঠার সহিত জোরে জোরে তামাক টানিতে লাগিলেন এবং পুনরায় একবার কি জানি কেন খিড়কীর দিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ইতিমধ্যে প্রকাণ্ড ভারী একটা লোহার সাবল দুই হাত দিয়া আকড়াইয়া ধরিয়া ক্ষেন্তি আসিয়া পড়িল—তৎপরে পিতা-পুত্রীতে সন্তর্পণে সম্মুখের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল—ইহাদের ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল ইহারা কাহারো ঘরে সিঁদ দিবার উদ্দেশ্যে চলিয়াছে।

অন্নপূর্ণা স্নান করিয়া সবে কাপড় ছাড়িয়া উনুন ধরাইবার জোগাড় করিতেছেন, মুখুয্যে-বাড়ীর ছোট খুকী দুর্গা আসিয়া বলিল, খুড়ীমা, মা ব'লে দিলে খুড়ীমাকে গিয়ে বল্, মা ছোঁবে না তুমি আমাদের নবান্নটা মেখে আর ইতুর ঘটগুলো বার ক'রে দিয়ে আসবে ?

মুখুয্যে-বাড়ী ও পাড়ায়—যাইবার পথের বাঁ ধারে এক জায়গায় শেওড়া, বনভাঁট, রাংচিতা, বনচাল্‌তা গাছের ঘন বন। শীতের সকালে এক প্রকার লতাপাতার ঘন গন্ধ বন হইতে বাহির হইতেছিল। একটা লেজ ঝোলা হল্‌দে পাখী আমড়া গাছের এ ডাল হইতে ও ডালে যাইতেছে।

দুর্গা আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল, খুড়ীমা খুড়ীমা, ঐ যে কেমন পাখিটা! —পাখী দেখিতে গিয়া অন্নপূর্ণা কিন্তু আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করিলেন। ঘন বনটার মধ্যে কোথায় এতক্ষণ খুপ্‌ খুপ্‌ করিয়া একটা আওয়াজ হইতেছিল…কে যেন কি খুঁড়িতেছে…দুর্গার কথার পরেই হঠাৎ সেটা বন্ধ হইয়া গেল। অন্নপূর্ণা সেখানে খানিকক্ষণ থমকিয়া দাঁড়াইলেন, পরে চলিতে আরম্ভ করিলেন, তাহারা খানিকদূর যাইতে না যাইতে বনের মধ্যে পুনরায় খুপ্‌ খুপ্‌ শব্দ আরম্ভ হইল।

কাজ করিয়া ফিরিতে অন্নপূর্ণার কিছু বিলম্ব হইল। বাড়ী ফিরিয়া দেখিলেন, ক্ষেন্তি উঠানের রৌদ্রে বসিয়া তেলের বাটি সম্মুখে লইয়া খোঁপা খুলিতেছে। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে চাহিয়া দেখিয়া রান্নাঘরে

গিয়া উনুন ধরাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। মেয়েকে বলিলেন—এখনও নাইতে যাসনি যে, কোথায় ছিলি এতক্ষণ ?

ক্ষেন্তি তাড়াতাড়ি উত্তর দিল—এই যে যাই, মা, এক্ষণি যাব আর আসব।

ক্ষেন্তি স্নান করিতে যাইবার একটুখানি পরেই সহায়হরি সোৎসাহে পনেরো ষোল সের ভারী একটা মেটে আলু ঘাড়ে করিয়া কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সম্মুখে স্ত্রীকে দেখিয়া কৈফিয়তের দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়াই বলিয়া উঠিলেন—ওই ও পাড়ার ময়শা চৌকীদার রোজই বলে—কর্ত্তা-ঠাকুর, তোমার বাপ থাকতে তবু মাসে মাসে এদিক তোমাদের পায়ের ধূলো পড়ত, তা আজকাল তো তোমরা আর আস না, এই বেড়ার গায়ে মেটে আলু ক'রে রেখেছি তা দাদাঠাকুর বরং···

অন্নপূর্ণা স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—বরোজপোতার বনের মধ্যে ব'সে খানিক আগে কি করছিলে শুনি ?

সহায়হরি অবাক হইয়া বলিলেন—আমি ! না আমি কখন্ ? কক্ষনো না, এই ত আমি···সহায়হরির ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল তিনি এইমাত্র আকাশ হইতে পড়িয়াছেন।

অন্নপূর্ণা পূর্ব্বের মতনই স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—চুরি তো করবেই, তিন কাল গিয়েছে এক কাল আছে, মিথ্যা কথাগুলো আর এখন বোলো না।···আমি সব জানি। মনে ভেবেছিলে আপদ ঘাটে গিয়েছে আর কি···দুর্গার মা ডেকে পাঠিয়েছিল, ও পাড়ায় যাচ্ছি শুনলাম বরোজ-পোতার বনের মধ্যে কি সব খুপ্ খুপ্ শব্দ···তখনি আমি বুঝতে পেরেছি, সাড়া পেয়ে শব্দ বন্ধ হয়ে গেল, যেই আবার খানিকদূর গেলাম আবার দেখি শব্দ···তোমার তো ইহকালও নেই পরকালও নেই, চুরি করতে, ডাকাতি করতে যা ইচ্ছে কর কিন্তু মেয়েটাকে আবার এর মধ্যে নিয়ে গিয়ে ওর মাথা খাওয়া কিসের জন্যে ?

সহায়হরি হাত নাড়িয়া, বরোজপোতায় তাঁহার উপস্থিত থাকার বিরুদ্ধে কতকগুলি প্রমাণ উত্থাপন করিবার চেষ্টা করিতে গেলেন ; কিন্তু স্ত্রীর

চোখের দৃষ্টির সামনে তাঁহার বেশী কথাও জোগাইল না বা কথিত উক্তিগুলির মধ্যে কোন পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।...

আধ ঘণ্টা পরে ক্ষেন্তি স্নান সারিয়া বাড়ী ঢুকিল। সম্মুখস্থ মেটে আলুর দিকে একবার আড়চোখে চাহিয়াই নিরীহমুখে উঠানের আলনায় অত্যন্ত মনোযোগের সহিত কাপড় মেলিয়া দিতেছিল।

অন্নপূর্ণা ডাকিলেন—ক্ষেন্তি এদিকে একবার আয় তো, শুনে যা...

মায়ের ডাক শুনিয়া ক্ষেন্তির মুখ শুকাইয়া গেল—সে ইতস্তত করিতে করিতে মা'র নিকটে আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—এই মেটে আলুটা দু জনে মিলে তুলে এনেছিস না?

ক্ষেন্তি মা'র মুখের দিকে একটুখানি চাহিয়া থাকিয়া একবার ভূপতিত মেটে আলুটার দিকে চাহিল, পরে পুনরায় মা'র মুখের দিকে চাহিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্রদৃষ্টিতে একবার বাড়ীর সম্মুখস্থ বাঁশ ঝাড়ের মাথার দিকেও চাহিয়া লইল; তাহার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল, কিন্তু মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

অন্নপূর্ণা কড়া স্বরে বলিলেন—কথা বলছিস নে যে বড? এই মেটে আলু তুই এনেছিস কি না?

ক্ষেন্তি বিপন্ন চোখে মা'র মুখের দিকেই চাহিয়াছিল, উত্তব দিল, হঁা।

অন্নপূর্ণা তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, পাজী, আজ তোমার পিঠে আমি আস্ত কাঠের চেলা ভাঙব তবে ছাড়ব, বরোজপোতার বনে গিয়েছে মেটে আলু চুরি করতে? সোমত্ত মেয়ে, বিয়ের যুগ্যি হয়ে গেছে কোন্ কালে, সেই এক গলা বিজন বন, তার মধ্যে দিন দুপুরে বাঘ লুকিয়ে থাকে, তার মধ্যে থেকে পরের আলু নিয়ে এল তুলে? যদি গোঁসাইরা চৌকীদার ডেকে তোমায় ধরিয়ে দেয়? তোমার কোন্ শ্বশুর এসে তোমায় বাঁচাতো? আমার জোটে খাবো, না জোটে না খাবো তা ব'লে পরের জিনিসে হাত? এ মেয়ে নিয়ে আমি কি করব, মা?

দু'তিন দিন পরে একদিন বৈকালে, ধূলামাটি মাখা হাতে ক্ষেন্তি মাকে আসিয়া বলিল—মা মা, দেখবে এস…

অন্নপূর্ণা গিয়া দেখিলেন ভাঙা পাঁচিলের ধারে যে ছোট খোলা জমিতে কতকগুলা পাথরকুচি ও কন্টিকারীর জঙ্গল হইয়াছিল ক্ষেন্তি ছোট বোনটিকে লইয়া সেখানে মহা উৎসাহে তরকারীর আওলাত করিবার আয়োজন করিতেছে এবং ভবিষ্যসম্ভাবী নানাবিধ কাল্পনিক ফলমূলের অগ্রদূত-স্বরূপ বর্ত্তমানে কেবল একটিমাত্র শীর্ণকায় পুঁইশাকের চারা কাপড়ের ফালির গ্রন্থি-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া ফাঁসী হইয়া যাওয়া আসামীর মতন ঊর্দ্ধমুখে এক খণ্ড শুষ্ক কঞ্চির গায়ে ঝুলিয়া রহিয়াছে। ফলমূলাদির অবশিষ্টগুলি আপাততঃ তাঁর বড় মেয়ের মস্তিষ্কের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে, দিনের আলোয় এখনও বাহির হয় নাই।

অন্নপূর্ণা হাসিয়া বলিলেন, দূর পাগলী, এখন পুঁইডাঁটার চাবা পোঁতে কখনো? বর্ষাকালে পুঁততে হয়। এখন যে জল না পেয়ে ম'রে যাবে?:

ক্ষেন্তি বলিল—কেন, আমি রোজ জল ঢালব?

অন্নপূর্ণা বলিলেন—দেখ, হয়ত বেঁচে যেতেও পারে? আজকাল রাতে খুব শিশির হয়।

খুব শীত পড়িয়াছে। সকালে উঠিয়া সহায়হরি দেখিলেন, তাঁহার দুই ছোট মেয়ে দোলাই গায়ে বাঁধিয়া রোদ উঠিবার প্রত্যাশায় উঠানের কাঁঠালতলায় দাঁড়াইয়া আছে।…একটা ভাঙা ঝুড়ি করিয়া ক্ষেন্তি শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে মুখুয্যে বাড়ী হইতে গোবর কুড়াইয়া আনিল। সহায়-হরি বলিলেন—হাঁ মা ক্ষেন্তি, তা সকালে উঠে জামাটা গায় দিতে তোর কি হয়? দেখ দিকি, এই শীত!

—আচ্ছা দিচ্ছি বাবা, কই শীত, তেমন তো…

—হাঁ, দে মা, এক্ষুনি দে—অসুখ-বিসুখ পাঁচ রকম হতে পারে বুঝলি নে?—সহায়হরি বাহির হইয়া গেলেন, ভাবিতে ভাবিতে গেলেন, তিনি কি অনেক দিন মেয়ের মুখে ভাল করিয়া চাহেন নাই? ক্ষেন্তির মুখ এমন সুশ্রী হইয়া উঠিয়াছে?…

জামার ইতিহাস নিম্নলিখিতরূপ। বহু বৎসর অতীত হইল, হরিপুরের রাসের মেলা হইতে সহায়হরি কালো সার্জ্জের এই আড়াই টাকা মূল্যের জামাটি ক্রয় করিয়া আনেন। ছিঁড়িয়া যাইবার পর তাহাতে কতবার রিপু ইত্যাদি করা হইয়াছিল, সম্প্রতি গত বৎসর হইতে ক্ষেন্তির স্বাস্থ্যোন্নতি হওয়ার দরুণ জামাটি তাহার গায়ে হয় না। সংসারের এসব খোঁজ সহায়হরি কখনও রাখিতেন না। জামার বর্ত্তমান অবস্থা অন্নপূর্ণারও জানা ছিল না—ক্ষেন্তির নিজস্ব ভাঙা টিনের তোরঙ্গের মধ্যেই উহা থাকিত।

পৌষ সংক্রান্তি। সন্ধ্যাবেলা অন্নপূর্ণা একটা কাঁসিতে চালের গুঁড়া, ময়দা ও গুড় দিয়া চটকাইতে ছিলেন—একটা ছোট বাটিতে একবাটি তেল। ক্ষেন্তি কুরুনীর নীচে একটা কলার পাত পাড়িয়া এক থাল নারিকেল কুরিতেছে। অন্নপূর্ণা প্রথমে ক্ষেন্তির সাহায্য লইতে স্বীকৃত হন নাই, কারণ সে যেখানে সেখানে বসে, বনে বাদাড়ে ঘুরিয়া ফেরে, তাহার কাপড়-চোপড় শাস্ত্র-সম্মত ও শুচি নহে। অবশেষে ক্ষেন্তি নিতান্ত ধরিয়া পড়ায় হাত পা ধোয়াইয়া ও শুদ্ধ কাপড় পরাইয়া তাহাকে বর্ত্তমান পদে নিযুক্ত করিয়াছেন।

ময়দার গোলা মাখা শেষ হইলে অন্নপূর্ণা উনুনে খোলা চাপাইতে যাইতেছেন, ছোট মেয়ে রাধা হঠাৎ ডান হাতখানা পাতিয়া বলিল, মা, ঐ একটু···

অন্নপূর্ণা বড় গামলাটা হইতে একটুখানি গোলা তুলিয়া লইয়া হাতের আঙুল পাঁচটি দ্বারা একটি বিশেষ মুদ্রা রচনা করিয়া সেটুকু রাধার প্রসারিত হাতের উপর দিলেন। মেজো মেয়ে পুঁটি অমনি ডান হাত খানা কাপড়ে তাড়াতাড়ি মুছিয়া লইয়া, মা'র সামনে পাতিয়া বলিল—মা, আমায় একটু···

ক্ষেন্তি শুচিবস্ত্রে নারিকেল কুরিতে কুরিতে লুব্ধনেত্রে মধ্যে মধ্যে এদিকে চাহিতেছিল, এ সময় খাইতে চাওয়ায় মা পাছে বকে, সেই ভয়ে চুপ করিয়া রহিল।

অন্নপূর্ণা বলিলেন—দেখি, নিয়ে আয় ক্ষেন্তি ঐ নারকেল থালাটা, ওতে

তোর জন্যে একটু রাখি।···ক্ষেন্তি ক্ষিপ্র হস্তে নারিকেলের উপরের থালাখানা, যাহাতে ফুটা নাই, সেখানা সরাইয়া দিল, অন্নপূর্ণা তাহাতে একটু বেশী করিয়া গোলা ঢালিয়া দিলেন।

মেজো মেয়ে পুঁটি বলিল—জেঠাইমারা অনেকখানি দুধ নিয়েছে, রাঙাদিদি ক্ষীর তৈরী করছিল, ওদের অনেক রকম হবে।

ক্ষেন্তি মুখ তুলিয়া বলিল—এ বেলা আবার হবে নাকি? ওরা তো ওবেলা ব্রাহ্মণ নেমতন্ন করেছিল সুরেশ কাকাকে আর ও-পাড়ার তিনুর বাবাকে। ও বেলা ত পায়েস, ঝোল-পুলি, মুগতক্তি, এই সব হয়েছে।

পুঁটি জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁ মা, ক্ষীর নৈলে নাকি পাটিসাপটা হয় না? খেঁদী বলছিল, ক্ষীরের পুর না হলে কি আর পাটিসাপটা হয়? আমি বললাম, কেন আমার মা তো শুধু নারকেলের ছাঁই দিয়ে করে, সে তো কেমন লাগে!

অন্নপূর্ণা বেগুনের বোঁটায় একটুখানি তেল লইয়া খোলায় মাখাইতে মাখাইতে প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজিতে লাগিলেন।

ক্ষেন্তি বলিল—খেঁদির ওই সব কথা। খেঁদীর মা তো ভারি পিঠে করে কিনা? ক্ষীরের পুর দিয়ে ঘিয়ে ভাজলেই কি আর পিঠে হ'ল? সেদিন জামাই এলে ওদের বাড়ী দেখতে গেলুম কিনা, তাই খুড়ীমা দু'খানা পাটিসাপটা খেতে দিলে, ওমা কেমন একটা ধরা ধরা গন্ধ আর পিঠেতে কখনো কোনো গন্ধ পাওয়া যায়? পাটিসাপ্‌টায় ক্ষীর দিলে ছাই খেতে হয়!

বেপরোয়াভাবে উপরোক্ত উক্তি শেষ করিয়া ক্ষেন্তি মা'র চোখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—মা, নারকোল কোরা একটু নেব?

অন্নপূর্ণা বলিলেন—নে, কিন্তু এখানে বসে খাস নে। মুখ থেকে পড়বে না কি হবে, যা ঐ দিকে যা।

ক্ষেন্তি নারকেলের মালায় এক থাবা কোরা তুলিয়া লইয়া একটু দূরে গিয়া খাইতে লাগিল। মুখ যদি মনের দর্পণ স্বরূপ হয়, তবে ক্ষেন্তির মুখ দেখিয়া সন্দেহের কোনো কারণ থাকিতে পারিত না যে, সে অত্যন্ত মানসিক তৃপ্তি অনুভব করিতেছে।

ঘণ্টাখানেক পরে অন্নপূর্ণা বলিলেন—ওরে, তোরা সব এক এক টুকরো পাতা পেতে বোস তো দেখি? গরম গরম দিই। ক্ষেন্তি, জল দেওয়া ভাত আছে ও বেলার বার ক'রে নিয়ে আয়।

ক্ষেন্তির নিকট অন্নপূর্ণার এ প্রস্তাব যে খুব মনঃপূত হইল না, তাহা তার মুখ দেখিয়া বোঝা গেল। পুঁটি বলিল—মা, বড়দি পিঠেই খাক। ভালবাসে। ভাত বরং থাকুক, আমরা কাল সকালে খাব।

খানকয়েক খাইবার পরেই ছোট মেয়ে রাধা আর খাইতে চাহিল না। সে নাকি অধিক মিষ্ট খাইতে পারে না। সকলের খাওয়া শেষ হইয়া গেলেও ক্ষেন্তি তখনও খাইতেছে! সে মুখ বুজিয়া শান্তভাবে খায়, বড় একটা কথা কহে না। অন্নপূর্ণা দেখিলেন, সে কম করিয়াও আঠারো উনিশ খানা খাইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলেন—ক্ষেন্তি আর নিবি?....ক্ষেন্তি খাইতে খাইতে শান্ত ভাবে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল। অন্নপূর্ণা তাহাকে আরও খানকয়েক দিলেন। ক্ষেন্তির মুখ চোখ ঈষৎ উজ্জ্বল দেখাইল, হাসি-ভরা চোখে মা'র দিকে চাহিয়া বলিল—বেশ খেতে হয়েছে, মা। ঐ যে তুমি কেমন ফেনিয়ে নেও, ওতেই কিন্তু...সে পুনরায় খাইতে লাগিল।

অন্নপূর্ণা হাতা, খুন্তি, চুলী তুলিতে তুলিতে সস্নেহে তাঁর এই শান্ত নিরীহ একটু অধিক মাত্রায় ভোজনপটু মেয়েটির দিকে চাহিয়া রহিলেন। মনে মনে ভাবিলেন—ক্ষেন্তি আমার যার ঘরে যাবে, তাদের অনেক সুখ দেবে। এমন ভালমানুষ, কাজ-কর্ম্মে বকো, মারো, গাল দাও, টুঁ শব্দটি মুখে নেই। উঁচু কথা কখনো কেউ শোনেনি...

বৈশাখ মাসের প্রথমে সহায়হরির এক দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়ের ঘটকালিতে ক্ষেন্তির বিবাহ হইয়া গেল। দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিলেও পাত্রটির বয়স চল্লিশের খুব বেশী কোন মতেই হইবে না। তবুও প্রথমে এখানে অন্নপূর্ণা আদৌ ইচ্ছুক ছিলেন না, কিন্তু পাত্রটি সঙ্গতিপন্ন, সহর অঞ্চলে বাড়ী, সীলেট চুণ ও ইঁটের ব্যবসায়ে দু'পয়সা নাকি করিয়াছে—এরকম পাত্র হঠাৎ মেলাও বড় দুর্ঘট কিনা!

জামাইয়ের বয়স একটু বেশী, প্রথমে অন্নপূর্ণা জামাইয়ের সম্মুখে বাহির হইতে একটু সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলেন, পরে পাছে ক্ষেন্তির মনে কষ্ট হয় এই জন্য বরণের সময় তিনি ক্ষেন্তির সুপুষ্ট হস্তখানি ধরিয়া জামাইয়ের হাতে তুলিয়া দিলেন—চোখের জলে তাঁহার গলা বন্ধ হইয়া আসিল, কিছু বলিতে পারিলেন না।

বাড়ীর বাহির হইয়া আমলকীতলায় বেহারারা সুবিধা করিয়া লইবার জন্য বরের পাল্কী একবার নামাইল। অন্নপূর্ণা চাহিয়া দেখিলেন, বেড়ার ধারের নীল রং এর মেদিফুলের গুচ্ছগুলি যেখানে নত হইয়া আছে, ক্ষেন্তির কম দামের বালুচরের রাঙা চেলীর আঁচলখানা পাল্কীর বাহির হইয়া সেখানে লুটাইতেছে।...তাঁর এই অত্যন্ত অগোছালো, নিতান্ত নিরীহ একটু অধিক মাত্রায় ভোজনপটু মেয়েটিকে পরের ঘরে অপরিচিত মহলে পাঠাইতে তাঁর বুক উদ্বেল হইয়া উঠিতেছিল। ক্ষেন্তিকে কি অপরে ঠিক বুঝিবে?...

যাইবার সময় ক্ষেন্তি চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে সান্ত্বনার সুরে বলিয়াছিল—মা, আষাঢ় মাসেই আমাকে এনো...বাবাকে পাঠিয়ে দিও ...দু'টো মাস তো...

ওপাড়ার ঠানদিদি বলিলেন—তোর বাবা তোর বাড়ী যাবে কেন রে, আগে নাতি হোক—তবে তো...

ক্ষেন্তির মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। জলভরা ডাগর চোখের উপর একটুখানি লাজুক হাসির আভা মাখাইয়া সে একগুঁয়েমির সুরে বলিল—না, যাবে না বৈ কি?...দেখো তো কেমন না যান্!...

ফাল্গুন চৈত্র মাসের বৈকাল বেলা উঠানের মাচায় রৌদ্রে দেওয়া আমসত্ত্ব তুলিতে তুলিতে অন্নপূর্ণার মন হু হু করিত...তাঁর অনাচারী লোভী মেয়েটি আজ বাড়ীতে নাই যে, কোথা হইতে বেড়াইয়া আসিয়া লজ্জা-হীনার মতন হাতখানি পাতিয়া মিনতির সুরে অমনি বলিবে—মা, বল্‌ব একটা কথা, ঐ কোণটা ছিঁড়ে একটুখানি?...

এক বছরের উপর হইয়া গিয়াছে। পুনরায় আষাঢ় মাস। বর্ষা বেশ নামিয়াছে। ঘরের দাওয়ায় বসিয়া সহায়হরি প্রতিবেশী বিষ্ণু সরকারের সহিত কথা বলিতেছেন। সহায়হরি তামাক সাজিতে সাজিতে বলিলেন—ও তুমি ধ'রে রাখ, ও রকম হবেই দাদা। আমাদের অবস্থার লোকের ওর চেয়ে ভাল কি আর জুটবে?

বিষ্ণু সরকার তালপাতার চাটাইয়ের উপর উবু হইয়া বসিয়াছিলেন, দূর হইতে দেখিলে মনে হইবার কথা, তিনি রুটি করিবার জন্য ময়দা চট্‌কাইতেছেন। গলা পরিষ্কার করিয়া বলিলেন,—নাঃ, সব তো আর···তা ছাড়া আমি যা দেব নগদই দেব।···তোমার মেয়েটির হয়েছিল কি?

সহায়হরি হুঁকাটায় পাঁচ ছ'টি টান দিয়া কাশিতে কাশিতে বলিলেন—বসন্ত হয়েছিল শুনলাম। ব্যাপার কি দাঁড়াল বুঝলে? মেয়ে তো কিছুতে পাঠাতে চায় না। আড়াইশো আন্দাজ টাকা বাকী ছিল, বললে ও টাকা আগে দাও, তবে মেয়ে নিয়ে যাও।

—একেবারে চামার···

—তারপর বললাম, টাকাটা ভায়া ক্রমে ক্রমে দিচ্ছি। পূজোর তত্ত্ব কম ক'রেও ত্রিশটে টাকার কমে হবে না ভেবে দেখলাম কি না! মেয়ের নানা নিন্দে ওঠালে···ছোটলোকের মেয়ের মতন চাল, হাভাতে ঘরের মত খাই খাই···আরও কত কি! পৌষ মাসে দেখতে গেলাম—মেয়েটাকে ফেলে থাকতে পারতাম না, বুঝলে?···

সহায়হরি হঠাৎ কথা বন্ধ করিয়া জোরে জোরে মিনিট-কতক ধরিয়া হুঁকায় টান দিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ দু'জনের কোন কথা শোনা গেল না।

অল্পক্ষণ পরে বিষ্ণু সরকার বলিলেন—তারপর?

—আমার স্ত্রী অত্যন্ত কান্নাকাটি করাতে পৌষ মাসে দেখতে গেলাম। মেয়েটার যে অবস্থা করেছে! শাশুড়ীটা শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগল, না জেনে শুনে ছোটলোকের সঙ্গে কুটুম্বিতে করলেই এ রকম হয়, যেমনি মেয়ে তেমনি বাপ, পৌষ মাসের দিন মেয়ে দেখতে এলেন শুধু হাতে!···পরে

বিষ্ণু সরকারের দিকে চাহিয়া বলিলেন—বলি আমরা ছোট লোক কি বড় লোক, তোমার তো সরকার খুড়ো জানতে বাকী নেই, বলি পরমেশ্বর চাটুয্যের নামে নীলকুঠির আমলে এ অঞ্চলে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খেয়েছে—আজই না হয় আমি···প্রাচীন আভিজাত্যের গৌরবে সহায়হরি শুষ্কস্বরে হা-হা করিয়া খানিকটা শুষ্ক হাস্য করিলেন।

বিষ্ণু সরকার সমর্থন-সূচক একটা অস্পষ্ট শব্দ করিয়া বার কতক ঘাড় নাড়িলেন।

—তারপর ফাল্গুন মাসেই তার বসন্ত হ'ল। এমন চামার—বসন্ত গায়ে বেরুতেই টালায় আমার এক দূর-সম্পর্কের বোন আছে, একবার কালীঘাটে পূজো দিতে এসে তার খোঁজ পেয়েছিল—তারই ওখানে ফেলে রেখে গেল। আমায় না একটা সংবাদ, না কিছু। তারা আমায় সংবাদ দেয়। তা আমি গিয়ে ··

—দেখতে পাওনি ?

—নাঃ! এমনি চামার—গহনাগুলো অসুখ অবস্থাতেই গা থেকে খুলে নিয়ে তবে টালায় পাঠিয়ে দিয়েছে। · যাক, তা চল যাওয়া যাক, বেলা গেল।···চার কি ঠিক করলে?···পিপঁড়ের টোপে মুড়ির চার তো সুবিধা হবে না।···

তারপর কয়েক মাস কাটিয়া গিয়াছে। আজ আবার পৌষ-পার্ব্বণের দিন। এবার পৌষ মাসের শেষাশেষি এত শীত পড়িয়াছে যে, অত্যন্ত বৃদ্ধ লোকেরাও বলাবলি করিতেছেন যে, এরূপ শীত তাঁহারা কখনও জ্ঞানে দেখেন নাই।

সন্ধ্যার সময় রান্নাঘরের মধ্যে বসিয়া অন্নপূর্ণা সরুচাকলি পিঠার জন্য চালের গুঁড়ার গোলা তৈয়ারী করিতেছেন। পুঁটী ও রাধী উনুনের পাশে বসিয়া আগুন পোহাইতেছে।

রাধী বলিতেছে—আর একটু জল দিতে হবে মা, অত ঘন ক'রে ফেললে কেন ?

পুঁটী বলিল—আচ্ছা মা, ওতে একটু নুন দিলে হয় না?

—ওমা দেখ মা, রাধীর দোলাই কোথায় ঝুলছে, এখুনি ধ'রে উঠবে···

অন্নপূর্ণা বলিয়া উঠিলেন—স'রে এসে ব'সো না, আগুনের ঘাড়ে গিয়ে না বসলে কি আগুন পোহানো হয় না? এই দিকে আয়।

গোলা তৈয়ারী হইয়া গেল···খোলা আগুনে চড়াইয়া অন্নপূর্ণা গোলা ঢালিয়া মুচি দিয়া চাপিয়া ধরিলেন···দেখিতে দেখিতে মিঠে-আঁচে পিঠা টোপরের মতন ফুলিয়া উঠিল।···

পুঁটী বলিল—মা, দাও, প্রথম পিঠাখানা কানাচে ষাঁড়া-ষষ্ঠীকে ফেলে দিয়ে আসি।

অন্নপূর্ণা বলিলেন—একা যাস নে, রাধীকে নিয়ে যা।

খুব জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল, বাড়ীর পিছনে ষাঁড়া-গাছের ঝোপের মাথায় তেলাকুচা লতার থোলো থোলো সাদা ফুলের মধ্যে জ্যোৎস্না আটকিয়া রহিয়াছে।···

পুঁটী ও রাধী খিড়কী-দোর খুলিতেই একটা শিয়াল শুকনো পাতায় খস্ খস্ শব্দ করিতে করিতে ঘন ঝোপের মধ্যে ছুটিয়া পলাইল। পুঁটী পিঠাখানা জোর করিয়া ছুঁড়িয়া ঝোপের মাথায় ফেলিয়া দিল। তাহার পর চারিধারের নির্জ্জন বাঁশবনের নিস্তব্ধতায় ভয় পাইয়া ছেলেমানুষ পিছু হটিয়া আসিয়া খিড়কী-দরজার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া তাড়াতাড়ি দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।···

পুঁটী ও রাধী ফিরিয়া আসিলে অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন—দিলি?

পুঁটী বলিল—হ্যাঁ মা, তুমি আর বছর যেখান থেকে নেবুর চারা তুলে এনেছিলে সেখানে ফেলে দিলাম···

তারপর সে রাত্রে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। পিঠে গড়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে···রাতও তখন খুব বেশী।···জ্যোৎস্নার আলোয় বাড়ীর পিছনের বনে অনেকক্ষণ ধরিয়া একটা কাঠ্‌ঠোকরা পাখি ঠক্-র্-র্-র্ শব্দ করিতেছিল, তাহার স্বরটাও যেন ক্রমে তন্দ্রালু হইয়া পড়িতেছে···দুই

বোনের খাইবার জন্ত কলায় পাতা চিরিতে চিরিতে পুঁটি অন্তমনস্কভাবে হঠাৎ বলিয়া উঠিল—দিদি বড় ভালবাসত…

তিনজনেই খানিকক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর তাহাদের তিন জনেরই দৃষ্টি কেমন করিয়া আপনা-আপনি উঠানের এক কোণে আবদ্ধ হইয়া পড়িল…যেখানে বাড়ীর সেই লোভী মেয়েটির লোভের স্মৃতি পাতায়-পাতায় শিরায়-শিরায় জড়াইয়া তাহার কত সাধের নিজের হাতে পোঁতা পুঁইগাছটি মাচা জুড়িয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে…বর্ষার জল ও কার্ত্তিক মাসের শিশির লইয়া কচি-কচি সবুজ ডগাগুলি মাচাতে সব ধরে নাই, মাচা হইতে বাহির হইয়া ছুলিতেছে…সুস্পষ্ট, নধর, প্রবর্দ্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর !…

উপেক্ষিতা

পথে যেতে যেতেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়।

সে বোধহয় বাংলা দুই কি তিন সালের কথা। নতুন কলেজ থেকে বার হয়েছি, এমন সময় বাবা মারা গেলেন। সংসারের অবস্থা ভাল ছিল না, স্কুল-মাষ্টারী নিয়ে গেলুম হুগলী জেলার একটা পাড়াগাঁয়ে।...গ্রামটির অবস্থা এক সময়ে খুব ভাল থাকলেও আমি যখন গেলুম তখন তার অবস্থা খুব শোচনীয়। খুব বড় গ্রাম, অনেকগুলি পাড়া, গ্রামের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত বোধহয় এক ক্রোশেরও ওপর। প্রাচীন আম-কাঁটালের বনে সমস্ত গ্রামটি অন্ধকার।

আমি ও গ্রামে থাকতুম না। গ্রাম থেকে প্রায় এক মাইল দূরে সে গ্রামের রেলস্টেশন। স্টেশনমাষ্টারের একটি ছেলে পড়ানোর ভার নিয়ে সেই রেলের P.W.D-এর একটা পরিত্যক্ত বাংলোয় থাকতুম। চারিদিকে নির্জ্জন মাঠ, মাঝে মাঝে তাল-বাগান। স্কুলটি ছিল গ্রামের ও প্রান্তে। মাঠের মধ্যে নেমে হেঁটে যেতুম প্রায় এক ক্রোশ।

একদিন বর্ষাকাল, বেলা দশটা প্রায় বাজে, স্কুলে যাচ্ছি। সোজা রাস্তা দিয়ে না গিয়ে একটু শীঘ্র যাবার জন্য পাড়ার ভেতর দিয়ে একটা রাস্তা নেমে গিয়েছে সেইটে দিয়ে যাচ্ছি। সমস্ত পথটা বড় বড় আম-কাঁটালের ছায়ায় ভরা।...একটু আগে খুব এক পসলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল, আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন ছিল। গাছের ডাল থেকে টুপ্‌ টুপ্‌ ক'রে বৃষ্টির জল ঝ'রে পড়ছিল। একটা জীর্ণ ভাঙ্গা-ঘাটওয়ালা প্রাচীন পুকুরের ধার দিয়ে রাস্তা। সেই রাস্তা বেয়ে যাচ্ছি, সেই সময় কে একটি স্ত্রীলোক, খুব টকটকে রংটা, হাতে বালা অনন্ত, পরণে চওড়া লালপাড় শাড়ী, বয়স চব্বিশ পঁচিশ হবে, পাশের একটা সরু রাস্তা দিয়ে ঘড়া নিয়ে উঠলেন আমার সামনের রাস্তায়। বোধহয় পুকুরে যাচ্ছিলেন জল আনবার জন্যে। আমায় দেখে ঘোমটা টেনে পথের পাশে দাঁড়ালেন। আমি পাশ কাটিয়ে জোরে চ'লে গেলুম।...আমার এখন

স্বীকার করতে লজ্জা হয় কিন্তু তখন আমি ইউনিভার্সিটির সদ্যপ্রসূত গ্র্যাজুয়েট, বয়স সবে কুড়ি, অবিবাহিত। সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের পাতায় পাতায় যে সব তরলিকা, মঞ্জুলিকা, বাসন্তী—উজ্জয়িনীবাসিনী অগুরু-বাস-মোদিত-কেশা তরুণী অভিসারিকার দল, তারা—আর তাদের সঙ্গে ইংরেজি কাব্যের কত Althea কত Genevieve কত Theosebia তাঁদের নীল নয়ন আর তুষার-ধবল কোমল বাহুবল্লী নিয়ে আমার তরুণ মনের মধ্যে রাতদিন একটা সুমিষ্ট কল্পলোকের সৃষ্টি ক'রে রেখেছিল। তাই সেদিন সেই সুশ্রী তরুণী, তাঁর বালা-অনন্ত-পরা অনাবৃত হাতদুটির সুঠাম সৌন্দর্য্য আর সকলের ওপর তাঁর পরণের শাড়ী দ্বারা নির্দ্দিষ্ট তাঁর সমস্ত দেহের একটা মহিমান্বিত সীমারেখা আমাকে মুগ্ধ এবং অভিভূত ক'রে ফেললে। আমার মনের ভিতর এক প্রকারের নূতন অনুভূতি, আমার বুকের রক্তের তালে তালে সেদিন একটা নূতন স্পন্দন আমার কাছে বড় স্পষ্ট হয়ে উঠল।...

বিকালবেলা রেল-লাইনের ধারে মাঠে গিয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইলুম। তাল-বাগানের মাথার ওপর সূর্য্য অস্ত যাচ্ছিল। বেগুনী রংএর মেঘগুলো দেখতে দেখতে ক্রমে ধূসর, পরেই আবার কালো হয়ে উঠতে লাগল।... আকাশের অনেকটা জুড়ে মেঘগুলো দেখতে হয়েছিল যেন একটা আদিম যুগের জগতের উপরিভাগের বিস্তীর্ণ মহাসাগর।...বেশ কল্পনা ক'রে নেওয়া যাচ্ছিল সেই সমুদ্রের চারিপাশে একটা গূঢ় রহস্যভরা অজ্ঞাত মহাদেশ, যার অন্ধকারময় বিশাল অরণ্যানীর মধ্যে প্রাচীন যুগের লুপ্ত অতিকায় প্রাণীরা সব ঘুরে বেড়াচ্ছে।...

দিন কেটে গিয়ে রাত হ'ল। বাসায় এসে Keats পড়তে সুরু করলুম। পড়তে পড়তে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, মাটির প্রদীপের বুক পুড়ে উঠে প্রদীপ কখন নিভে গিয়েছে।...অনেক রাত্রে উঠে দেখলুম বাইরে টিপ্-টিপ্ বৃষ্টি পড়ছে...আকাশ মেঘে অন্ধকার।...

তার পরদিনও পাড়ার ভেতর দিয়ে নেমে গেলুম। সেদিন কিন্তু তাঁকে দেখলুম না। আসবার সময়ও সেখান দিয়েই এলুম, কাউকে দেখলুম না। পরদিন ছিল রবিবার। সোমবার দিন আবার সেই পথ দিয়েই গেলুম।

পুকুরটার কাছাকাছি গিয়েই দেখি যে তিনি জল নিয়ে ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে উঠছেন, আমায় দেখে ঘোমটা টেনে দিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন।... আমার বুকের রক্তটা যেন দুলে উঠল, খুব জোরে হেঁটে বেরিয়ে গেলুম।... রাস্তার বাঁকের কাছে গিয়ে ইচ্ছা আর দমন করতে না পেরে একবার পিছন ফিরে তাকালুম, দেখি তিনি ঘাটের ওপর উঠে ঘোমটা খুলে কৌতূহলী নেত্রে আমার দিকেই চেয়ে রয়েছেন, আমি চাইতেই ঘোমটা আবার টেনে দিলেন।

ওপরের পথটা ছেড়েই দিলুম একেবারে। পুকুরের পথ দিয়েই রোজ যাই। দু'একদিন পরে আবার একদিন তাঁকে দেখতে পেলুম। আমার মনে হ'ল সেদিনও তিনি আমায় একটু আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন। এইভাবে পনেরো-কুড়ি দিন কেটে গেল। কোনদিন তাঁকে দেখতে পাই, কোনদিন পাই না। আমার কিন্তু বেশ মনে হতে লাগল তিনি আমার প্রতি দিনদিন আগ্রহান্বিতা হয়ে উঠলেন। আজকাল ততটা ত্রস্ত ভাবে ঘোমটা দেন না। আমারও কি হ'ল—তাঁর গতি-ভঙ্গীর একটা মধুর শ্রী, তাঁর দেহের একটা শান্ত কমনীয়তা, আমায় দিন দিন যেন অক্টোপাসের মত জড়িয়ে ফেলতে লাগল।...

একদিন তখন আশ্বিন মাসের প্রথম, শরৎ পড়ে গিয়েছে · নীল আকাশে সাদা সাদা লঘু মেঘখণ্ড উড়ে যাচ্ছে···চারিদিকে খুব রৌদ্র ফুটে উঠেছে·· রাস্তার পাশের বন কচু ভাঁট শেওড়া কুঁচলতার ঝোপ থেকে একটা কটুতিক্ত গন্ধ উঠছে।··শনিবার সকাল সকাল স্কুল থেকে ফিরছি। রাস্তা নির্জ্জন, কেউ কোন দিকে নেই। পুকুরটার পথ ধরেছি, একদল ছাতারে পাখী পুকুরের ওপারের ঝোপের মাথায় কিচ্‌কিচ্‌ করছিল, পুকুরের জলের নাল ফুলের দলগুলো রৌদ্রতাপে মুড়ে ছিল। আমি আশা করিনি এমন সময় তিনি পুকুরের ঘাটে আসবেন। কিন্তু দেখলুম তিনি জল ভ'রে উঠে আসছেন। এর আগে চার পাঁচ দিন তাঁকে দেখিনি, হঠাৎ কি মনে হ'ল, একটা বড় দুঃসাহসের কাজ ক'রে বসলুম। তাঁর কাছে গিয়ে বললুম—দেখুন, কিছু

মনে করবেন না আপনি। আমি এখানকার স্কুলে কাজ করি, রোজ এই পথে যেতে যেতে আপনাকে দেখতে পাই, আমার বড় ইচ্ছা করে আপনি আমার বোন হন। আমি আপনাকে বৌদিদি বলব, আমি আপনার ছোট ভাই। কেমন তো?…তিনি আমার কথার প্রথম অংশটায় হঠাৎ চমকে উঠে কেমন জড়সড় হয়ে উঠেছিলেন, দ্বিতীয় অংশটায় তাঁর সে চমকানো ভাবটা একটু দূর হল। ঘড়া-কাঁখে নীচু চোখে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমি যুক্ত-করে প্রণাম ক'রে বললুম—বৌদিদি, আমার এ ইচ্ছা আপনাকে পূর্ণ করতে হবে। আমাকে ছোট ভাইয়ের অধিকার দিতেই হবে আপনাকে।…

তিনি ঘোমটা অর্দ্ধেকটা খুলে একটা স্থির শান্ত-দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলেন। সুশ্রী মুখ যে আমি কখনো দেখিনি তা নয়, তবুও মনে হ'ল তাঁর ডাগর কালো চোখদুটির শান্ত ভাব, আর তাঁর ঠোঁটের নীচের একটা বিশেষ ভাঁজ, এই দুটিতে মিলে তাঁর সুন্দর মুখের গড়নে এমন এক বৈচিত্র্য এনেছে, যা সচরাচর চোখে পড়ে না।

খানিকক্ষণ দুজনেই চুপ ক'রে রইলুম। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার বাড়ী কোথায়?

আনন্দে সারা গা কেমন শিউরে উঠল। বললুম—কলকাতার কাছে, চব্বিশ-পরগণা জেলায়। এখানে স্টেশনে থাকি।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার নাম কি?

নাম বললুম।

তিনি বললেন—তোমার বাড়ীতে কে কে আছেন?

বললুম—এখন বাড়ীতে শুধু মা আর দুটি ছোট ছোট ভাই আছে। বাবা এই দু'বৎসর মারা গিয়েছেন।

তিনি একটু যেন আগ্রহের সুরে বললেন—তোমার কোন বোন নেই?

আমি বললুম—না। আমার দু'জন বড় বোন ছিলেন, তাঁরা অনেকদিন মারা গিয়েছেন। বড়দি যখন মারা যান তখন আমি খুব ছোট, মেজদি আজ পাঁচ ছ'বৎসর মারা গিয়েছেন। আমি এই মেজদিকেই জানতুম,

তিনি আমায় বড় ভালবাসতেন। তিনি আমার চেয়েও ছয় বছরের বড় ছিলেন।

তাঁর দৃষ্টি একটু ব্যথা-কাতর হয়ে এল, জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার মেজদি থাকলে এখন তাঁর বয়স হ'ত কত ?

বললুম—এই ছাব্বিশ বছর।

তিনি একটু মৃদু হাসির সঙ্গে বললেন—তাই বুঝি ভাইটির আমার একজন বোন খুঁজে বেড়ানো হচ্ছে, না ?

কি মিষ্টি হাসি ! কি মধুর শান্ত ভাব ! মাথা নীচু ক'রে প্রণাম ক'রে তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে বললুম—তা হ'লে ভাইয়ের অধিকার দিলেন তো আপনি ?

তিনি শান্ত হাসি মাখা মুখে চুপ ক'রে রইলেন !

আমি বললুম—বৌদি, আমি জানতুম আমি পাবো। আগ্রহের সঙ্গে খুঁজলে ভগবানও নাকি ধরা দেন, আমি একজন বোন অনায়াসেই পাবো। আচ্ছা এখন আসি। আপনি কিন্তু ভুলে যাবেন না বৌদি, আপনার যেন দেখা পাই ! রবিবার বাদে আমি দু'বেলাই এ রাস্তা দিয়ে যাবো।

আমার মাঠের ধারের তালবাগানটার পাখিগুলো রোজই সকাল বিকাল ডাকে। একটা কি পাখি তার সুর খাদ থেকে ধাপে ধাপে তুলে একেবারে পঞ্চমে চড়িয়ে আনে। মন যেদিন ভারী থাকে সেদিন সে সুরের উদাস মাধুর্য্য প্রাণের মধ্যে কোন সাড়া দেয় না।·· আজ দেখলুম পাখিটার গানের সুরের স্তরে স্তরে হৃদয়টা কেমন লঘু থেকে লঘুতর হয়ে উঠছে।··· মনে হ'তে লাগল জীবনটা কেবল কতকগুলো স্নিগ্ধ ছায়াশীতল পাখির গানে ভরা অপরাহ্নের সমষ্টি, আর পৃথিবীটা শুধু নীল আকাশের তলায় ইতস্ততঃ বর্দ্ধিত অযত্ন-সম্ভূত তাল-নারিকেল গাছের বন দিয়ে তৈরী—যাদের ঈষৎ কম্পমান দীর্ঘ শ্যামল পত্রশীর্ষ অপরাহ্নের অবসন্ন রৌদ্রে চিক্‌চিক্ করছে।···

তার পরদিন বৌদিদির সঙ্গে দেখা হ'ল ছুটীর পর বিকাল বেলা। বৌদিদি যেন চাপাহাসির সুরে জিজ্ঞাসা করলেন—এই যে, বিমলের বুঝি আজ খুব সকাল সকাল স্কুলে যাওয়া হয়েছিল ?

আমি উত্তর দিলুম—বেশ বৌদি, আমি ওবেলা তো ঠিক সময়েই গেলুম—আপনিই ছিলেন না, এখন দোষটা বুঝি আমার ঘাড়ে চাপানো হচ্ছে না? আর বৌদি, ঘাটে ওবেলা আরও সব মেয়েরা ছিলেন।

বৌদিদি হেসে ফেললেন, বললেন—তাই তো! ভাইটির আমার ওবেলা তো বড় বিপদ গিয়েছে তা হ'লে?

আমার একটু লজ্জা হ'ল, ভাল ক'রে জবাব দিতে না পেরে বললুম—তা নয় বৌদি, আমি এখানে অপরিচিত, পাড়ার মধ্যে দিয়ে পথ—পাছে কেউ কিছু মনে করে।

বৌদিদির চোখের কৌতুক দৃষ্টি তখনও যায় নি, তিনি বললেন—আমি ওবেলা ঘাটের জলেই ছিলাম বিমল। তুমি ওই চট্‌কা গাছটার তলায় গিয়ে একবার ঘাটের দিকে চেয়ে দেখলে, আমায় তুমি দেখতে পাও নি।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—বৌদি, আপনার বাপের বাড়ী কোথায়?

বৌদিদি উত্তর দিলেন—খোলাপোতা চেন? সেই খোলাপোতায়।

আমি ইতস্ততঃ করছি দেখে আমায় আর একটু বিশদ সংবাদ দিয়ে বললেন ওই যে খোলাপোতায় রাস হয়?···বৌদিদির হাসিভরা দৃষ্টি যেন একটু গর্ব্বমিশ্রিত হয়ে উঠল। কিন্তু বলা আবশ্যক যে, খোলাপোতা ব'লে কোনো গ্রামের নাম এই আমি প্রথম শুনলুম। অথচ বৌদির বাপের বাড়ী, যেখানে এমন রাস হয়, সেই বিশ্ববিশ্রুত খোলাপোতার ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে আমার অজ্ঞতা পাছে তাঁর মনে ব্যথা দেয়, এই ভয়ে ব'লে ফেললুম—ও! সেই খোলাপোতায়? ওটা কোন্ জেলায় ভাল···

বৌদিদির কাছ থেকে সাহায্য পাবার প্রত্যাশা করেছিলুম কিন্তু দেখলুম তিনি সে বিষয়ে নির্ব্বিকার। তাঁর হাসি ভরা সরল মুখখানির দিকে চেয়ে আমার করুণা হল, এ-সমস্ত জটিল ভৌগোলিক তত্ত্বের মীমাংসা নিয়ে তাঁকে পীড়ন করতে আর আমার মন সরল না।

বললুম—আচ্ছা বৌদি, আসি তা হ'লে।

বৌদিদি তাড়াতাড়ি ঘড়ার মুখ থেকে কলার-পাতে মোড়া কি বার করলেন। সেইটে আমার হাতে দিয়ে বললেন—কাল চাপ্‌ড়া ষষ্ঠীর জন্যে

ক্ষীরের পুতুল তৈরী করেছিলাম, আর গোটাকতক কলার বড়া আছে, বাসায় গিয়ে খেও।

চার পাঁচ দিন জ্বর ভোগের পর একদিন পথ্য পেয়ে স্কুলে যাচ্ছি বৌদিদির সঙ্গে দেখা। আমায় আসতে দেখে বৌদিদি উৎসুক দৃষ্টিতে অনেকদূর থেকে আমার দিকে চেয়ে ছিলেন। নিকটে যেতে জিজ্ঞাসা করলেন—এ কি বিমল, এমন মুখ শুকনো কেন ?

বললুম—জ্বর হয়েছিল বৌদিদি।

বৌদিদি উদ্বেগের স্বরে বললেন—ও, তাই তুমি চার পাঁচ দিন আসনি বটে! আমি ভাবলাম বোধহয় কিসের ছুটি আছে। আহা, তাইতো, বড্ড রোগা হয়ে গিয়েছ যে বিমল।

তাঁর চোখের দৃষ্টিতে একটা সত্যিকারের ব্যথা-মিশ্রিত স্নেহের আত্ম-প্রকাশ বেশ বুঝতে পেরে মনের মধ্যে একটা নিবিড় আনন্দ পেলুম। হেসে বললুম—যে দেশ আপনাদের বৌদি, একবার অতিথি হলে আপ্যায়নের চোটে একেবারে অস্থির ক'রে তুলবে।

বৌদিদি জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা বিমল, ওখানে তোমায় রেঁধে দেয় কে ?

আমি বললুম—কে আর রাঁধবে, আমি নিজেই।

বৌদিদি একটু চুপ ক'রে রইলেন, তারপর বললেন—আচ্ছা বিমল এক কাজ করো না কেন ?

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—কি বৌদি ?

তিনি বললেন—মাকে এই পূজোর ছুটির পর নিয়ে এস। এ রকম ভাবে কি ক'রে বিদেশে কাটাবে বিমল ? লক্ষীটি, ছুটির পর মাকে অবিশ্যি ক'রে নিয়ে এস। এই গাঁয়ের ভেতর অনেক বাড়ী পাওয়া যাবে। আমাদের পাড়াতেই আছে। না হ'লে অসুখ হ'লে কে একটু জল দেয় ?...আচ্ছা হ্যাঁ বিমল, আজ যে পথ্য করলে, কে রেঁধে দিলে ?

আমায় হাসি পেল, বললুম—কে আবার দেবে বৌদি ? নিজেই করলুম।

তিনি আমার দিকে যেন কেমন ভাবে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন। তাঁর সেদিন সেই সহানুভূতি-বিগলিত স্নেহ-মাখানো মাতৃমুখের জলভরা কালো চোখদুটি পরবর্ত্তী জীবনে আমার অনেকদিন পর্য্যন্ত মনে ছিল।···

সেদিন স্কুল থেকে আসবার সময় দেখি, বৌদিদি যেন আমার জন্যেই অপেক্ষা করছেন। আমায় দেখে কলার পাতায় মোড়া কি একটা আমার হাতে দিয়ে বললেন—শরীরটা একটু না সারলে রাত্রে গিয়ে রান্না, সে পেরে উঠবে না বিমল। এই খাবার দিলাম, রাত্রে খেও।···বোধহয় একটু আগেই তৈরী ক'রে এনেছিলেন, আমি হাতে বেশ গরম পেলুম। বাসায় এসে কলার পাত খুলে দেখি, খানকতক রুটি, মোহনভোগ আর মাছের একটা ডালনা মতো।

তার পরদিন ছুটির পর আসবার সময়ও দেখি বৌদিদি খাবার হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, আমার হাতে দিয়ে বললেন—বিমল, তুমি তোমার ওখানে দুধ নাও?

আমি বললুম—কেন, তা হ'লে দুধও খানিকটা ক'রে দেন বুঝি? সত্যি বলছি বৌদি, আপনি আমার জন্য অনর্থক এ কষ্ট করবেন না, তা হ'লে এ রাস্তায় আমি আর আসছি না।

বৌদিদির গলা ভারী হয়ে এল, আমার ডান হাতটা আস্তে আস্তে এসে ধ'রে ফেললেন, বললেন—লক্ষ্মী ভাই, ছি, ও-কথা ব'লো না। আচ্ছা আমি যদি তোমার মেজদিই হতাম তা হ'লে এ কথা কি আজ আমায় বলতে পারতে? আমার মাথার দিব্যি রইল, এ পথে রোজ যেতেই হবে।

সেই দিন থেকে বৌদিদি রোজ রাত্রের খাবার দেওয়া সুরু করলেন, সাত আট দিন পরে রুটির বদলে কোনদিন লুচি কোনদিন পরোটা দেখা দিতে লাগল। তাঁর সে আগ্রহভরা মুখের দিকে চেয়ে আমি তাঁর সে সব স্নেহের দান ঠিক অস্বীকারও করতে পারতুম না, অথচ এই ভেবে অস্বস্তি বোধ করতুম যে আমার এই নিত্য খাবার জোগাতে না জানি বৌদিদিকে কত অসুবিধাই পোহাতে হচ্ছে। তার পরই আশ্বিন মাসের শেষে পূজোর ছুটি এসে পড়াতে আমি নিষ্কৃতি পেলুম।

সমস্ত পুজোর ছুটিটা কি নিবিড় আনন্দেই কাটল সেবার। আমার আকাশ বাতাস যেন রাতদিন আফিমের রঙিন-ধূমে আচ্ছন্ন থাকত। ভোর বেলা আমাদের উঠানের শিউলি গাছের সাদা-ফুল বিছানো তলাটা দেখলে —হেমন্ত রাত্রির শিশিরে ভেজা ঘাসগুলোর গা যেমন শিউরে আছে, ওই রকম আমার গা শিউরে উঠত···কার ওপর আমার জীবনের সমস্ত ভার অসীম নির্ভরতার সঙ্গে চাপিয়ে দিয়ে আমার মন যেন শরতের জলভার-নামানো হালকা মেঘের মত একটা সীমাহারা হাওয়ার রাজ্যে ভেসে বেড়াতে লাগল।···

ছুটি ফুরিয়ে গেল। প্রথম স্কুল খোলবার দিন পথে তাঁকে দেখলুম না। বিকালে যখন ফিরি, তখন শীতের হাওয়া একটু একটু দিচ্ছে।···পথের ধারের এক জায়গায় খানিকটা মাটি কারা বর্ষাকালে তুলে নিয়েছিল, সেখানটায় এখন বনকচু, কালকাসন্দা ধুতুরা কুঁচকাঁটা আর ঝুমকো লতার দল পরস্পর জড়াজড়ি ক'রে একটুখানি ছোট ছোট ঝোপ মতো তৈরী করেছে ···শীতল হেমন্ত-অপরাহ্ণের ছায়া সবুজ ঝোপটির ওপর নেমে এসেছে···এমন একটা মিষ্ট নির্ম্মল গন্ধ গাছগুলো থেকে উঠছে, এমন সুন্দর শ্রী হয়েছে ঝোপটির, সমস্ত ঝোপটি যেন বনলক্ষ্মীর শ্যামল শাড়ীর একটা অঞ্চল-প্রান্তের মত।

তার পরদিন তাঁকে দেখলুম।

তিনি আমায় লক্ষ্য করেন নি, আপন মনে ঘাটের চাতালে উঠতে যাচ্ছিলেন। আমি ডাকলুম—বৌদি?·· বৌদিদি কেমন হঠাৎ চমকে উঠে আমার দিকে ফিরলেন।

—এ কি বিমল! কবে এলে? আজ কি স্কুল খুলল? কি রকম আছ? ···সেই পরিচিত প্রিয় কণ্ঠস্বরটি! সেই স্নেহ-ঝরা শান্ত চোখ-দুটি! বৌদিদি আমার মনে ছুটির আগে যে স্থান অধিকার করেছিলেন ছুটির পরের স্থানটা তার চেয়ে আরও ওপরে।···আমি সমস্ত ছুটিটা তাঁকে ভেবেছি, নানা মূর্ত্তিতে নানা অবস্থায় তাঁকে কল্পনা করেছি, নানা গুণ তাঁতে আরোপ করেছি, তাঁকে নিয়ে আমার মুগ্ধ মনের মধ্যে অনেক ভাঙা-গড়া করেছি। আমার মনের

মন্দিরে আমারই শ্রদ্ধা ভালবাসায় গড়া তাঁর কল্পনা-মূর্ত্তিকে অনেক অর্ঘ্য-চন্দনে চর্চ্চিত করেছি। তাই সেদিন যে বৌদিদিকে দেখলুম তিনি পূজার ছুটির আগেকার সে বৌদিদি নন, তিনি আমার সেই নির্ম্মলা, পূতহৃদয়া পুণ্যময়ী মানসী প্রতিমা, আমার পার্থিব বৌদিদিকে তিনি তাঁর মহিমা-খচিত দিব্য বসনের আচ্ছাদনে আবৃত ক'রে রেখেছিলেন, তাঁর স্নেহ করুণার জ্যোতিবাষ্পে বৌদিদির রক্তমাংসের দেহটার একটা আড়াল সৃষ্টি করেছিলেন।

আমার মাথা শ্রদ্ধায় সম্ভ্রমে নত হয়ে পড়ল, আমি তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে প্রণাম করলুম। বৌদিদি বললেন—এস, এস ভাই, আর প্রণাম করতে হবে না, আশীর্ব্বাদ করছি এমনিই—রাজা হও। আচ্ছা বিমল, বাড়ী গিয়ে আমার কথা মনে ছিল?

মনে এলেও বাইরে আর বলতে পারলুম না · কে তবে আমার মগ্ন-চৈতন্যকে আশ্রয় ক'রে আমার নিত্য সুষুপ্তির মধ্যেও আমার সঙ্গিনী ছিল বৌদি?···শুধু একটু হেসে চুপ ক'রে রইলুম। বৌদিদি জিজ্ঞাসা করলেন—মা ভাল আছেন?

আমি উত্তর দিলুম—হ্যাঁ বৌদি, তিনি ভাল আছেন। তাঁকে আপনার কথা বললুম।

বৌদিদি আগ্রহের সুরে বললেন—তিনি কি বললেন?

আমি বললুম—শুনে মার দুই চোখ জল ভ'রে এল, বললেন—একবার দেখাবি তাকে বিমল? আমার নলিনীর শোক বোধহয় তাকে দেখলে অনেকটা নিবারণ হয়।

বৌদিদিরও দেখলুম দুই চোখ ছলছল ক'রে এল, আমায় বললেন, হ্যাঁ বিমল, তা মাকে এই মাসে নিয়ে এলে না কেন?

আমি বললুম—সে এখন হয় না বৌদি।

বৌদিদি একটু ক্ষুব্ধ হলেন, বললেন—বিমল, জানো তো সেবার কি রকম কষ্টটা পেয়েছ! এই বিদেশ বিভূঁই, মাকে আনলে এই মিথ্যে কষ্টটা তো আর ভোগ করতে হয় না?

আমি উত্তর দিলুম—বৌদি আমি তো আর ভাবি নি যে আমি বিদেশে আছি, যেখানে আমার বৌদি রয়েছেন সে দেশ আমার বিদেশ নয়। মা না থাকলেও আমার এখানে ভাবনা কিসের বৌদি?

বৌদিদিদির চোখে লজ্জা ঘনিয়ে এল, আমার দিকে ভাল ক'রে চাইতে পারলেন না বললেন—হ্যাঁ, আমি তো সবই করছি। আমার কি কিছু করবার জো আছে? কত পরাধীন আমরা তা জানো তো ভাই? ওসব নয়, তুমি এই মাসেই মাকে আনো।

আমি কথাটাকে কোন রকমে চাপা দিয়ে সেদিন চ'লে এলুম।

তার পরদিনও ছুটির পর বৌদিদির সঙ্গে দেখা। অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর আসবার সময় তিনি কলার পাতে মোড়া আবার কি একটা বার করলেন। তাঁর হাতে কলার পাত দেখলেই আমার ভয় হয়; আমি শঙ্কিতচিত্তে ব'লে উঠলুম—ও আবার কি বৌদি? আবার সেই···

বৌদিদি বাধা দিয়ে বললেন—আমার কি কোনো সাধ নেই বিমল? ভাই-ফোঁটাটা অমনি অমনি গেল, কিছু কি করতে পারলুম?···কলার পাত-মোড়া রহস্যটি আমার হাতে দিয়ে বললেন—এতে একটু মিষ্টিমুখ ক'রো, আর এইটে নাও—একখানা কাপড় কিনে নিও।

কথাটা ভাল ক'রে শেষ না ক'রেই বৌদি আমার হাতে একখানা দশ-টাকার নোট দিতে এলেন। আমি চমকে উঠলুম, বললুম—এ কি বৌদি, না না এ কিছুতে হবে না; খাবার আমি নিচ্ছি কিন্তু টাকা আমি নিতে পারব না।

আমার কথাটার স্বর বোধহয় একটু তীব্র হয়ে পড়েছিল, বৌদিদি হঠাৎ থতমত খেয়ে গেলেন, তাঁর প্রসারিত হাতখানা ভাল ক'রে যেন গুটিয়ে নিতেও সময় পেলেন না, যেন কেমন হয়ে গেলেন। তারপর একটুখানি অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে থাকবার পরই তাঁর টানা কালো চোখদুটি ছাপিয়ে বাঁধ-ভাঙা বন্যার স্রোতের মত জল গড়িয়ে পড়ল। আমার বুকে যেন কিসের খোঁচা বিঁধল। ·

এই নিতান্ত সরলা মেয়েটির আগ্রহ-ভরা স্নেহ-উপহার রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান

ক'রে তাঁর বুকে যে লজ্জা আর ব্যথার শূল বিদ্ধ করলুম, সে ব্যথার প্রতিঘাত অদৃশ্যভাবে আমার নিজের বুকে গিয়েও বাজল!

আমি তাড়াতাড়ি দুই হাতে তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে তাঁর হাত থেকে নোটখানা ও খাবার দুই নিয়ে বললুম—বৌদি, ভাই ব'লে এ অপরাধ এবারটা মাপ করুন আমার। আর কখনো আপনার কথার অবাধ্য হবো না।

বৌদিদির চোখের জল তখনও থামেনি।

দুই চোখ জলে ভরা সে তরুণী দেবী মূর্ত্তির দিকে ভাল ক'রে চাইতে না পেরে আমি মাথা নীচু ক'রে অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে রইলুম।....

বাড়ী এসে দেখলুম কলার পাতের মধ্যে কতকগুলো দুগ্ধশুভ্র চন্দ্রপুলি, সুন্দর ক'রে তৈরী। সমস্ত রাত ঘুমের ঘোরে বৌদিদির বিষণ্ণ মুখের কাতর দৃষ্টি বারবার চোখের সামনে ভাসতে লাগল।...

মাস খানেক কেটে গেল।

প্রায়ই বৌদিদির সঙ্গে দেখা হ'ত। এখন আমরা ভাই-বোনের মত হয়ে উঠেছিলুম, সেই রকমই পরস্পরকে ভাবতুম। একদিন আসছি, ফ্লানেল সার্টের একটা বোতাম আমার ছিল না। বৌদি জিজ্ঞাসা করলেন—এ কি, বোতাম কোথায় গেল?

আমি বললুম—সে কোথায় গিয়েছে বৌদি, বোতাম পরাতে জানিনে কাজেই ঐ অবস্থা।

তার পরদিন দেখলুম তিনি ছুঁচ সুতো বোতাম সমেতই এসেছেন। আমি বললুম—বৌদি, এটা ঘাটের পথ, আপনি বোতাম পরাতে পরাতে কেউ যদি দেখে তো কি মনে করবে। আপনি বরং ছুঁচটা আমায় দিন, আমি বাড়ী গিয়ে চেষ্টা করব এখন।

বৌদিদি হেসে বললেন—তুমি চেষ্টা ক'রে যা করবে তা আমি জানি, নাও স'রে এস এদিকে।

বাধ্য হয়ে স'রেই গেলুম, তিনি বেশ নিশ্চিন্ত ভাবেই বোতাম পরাতে লাগলেন। ভয়টা দেখলুম তাঁর চেয়ে আমারই হ'ল বেশী। ভাবলুম, বৌদির

তো সে কাণ্ডজ্ঞান নেই, কিন্তু যদি কেউ দেখে তো এর সমস্ত কষ্টটা ওঁকেই ভুগতে হবে।

একদিন বৌদিদি জিজ্ঞাসা করলেন—বিমল, গোকুল পিঠে খেয়েছ ?

আমার মা খুব ভাল গোকুল-পিঠে তৈরী করতেন, কাজেই ও জিনিষটা আমি খুব খেয়েছি। কিন্তু বৌদিদিকে একটু আনন্দ দেওয়ার জন্য বললুম —সে কিরকম বৌদি ?

আর রক্ষা নেই। তার পরদিনই বিকাল বেলা বৌদিদি কলার পাতে মোড়া পিঠে নিয়ে হাজির।

আমায় বললেন—তুমি এখানে আমার সামনেই খাও। ঘড়ার জলে হাত ধুয়ে ফেল এখন।

আমি বললুম—সর্ব্বনাশ বৌদি। এই এতগুলো পিটে খেতে খেতে এ পথে লোক এসে পড়বে, সে হয় না, আমি বাড়ী গিয়েই খাব।

বৌদি ছাড়বার পাত্রীই নন, বললেন—না কেউ আসবে না বিমল। তুমি এখানেই খাও।

খেলুম। পিঠে খুব ভাল হয় নি। আমার মায়ের নিপুণ হাতের তৈরী পিঠের মত নয়। বোধ হয় নতুন করতে শিখেছেন, ধারগুলো পুড়ে গিয়েছে, আস্বাদও ভাল নয়। বললুম—বাঃ বৌদি, বড় সুন্দর তো! এ কোথায় তৈরী করতে শিখলেন, আপনার বাপের বাড়ীর দেশে বুঝি ?

বৌদির মুখে আর হাসি ধরে না। হাসিমুখে বললেন—এ আমি আমাদের গুরুমা এসেছিলেন, তিনি সহরের মেয়ে, অনেক ভাল খাবার করতে জানেন তাঁর কাছে শিখে নিয়েছিলাম।

তারপর সারা শীতকাল অন্যান্য পিঠের সঙ্গে সেই গোকুল-পিঠের পুনরাবৃত্তি চলল। ঐ যে বলেছি আমার ভাল লেগেছে, আর রক্ষা নেই !

একটা কথা আছে।

কিছুদিন ধ'রে আমার মনের মধ্যে একটা আগ্রহ একটু একটু ক'রে জমছিল জীবনটাকে খুব বড় ক'রে অনুভব করবার জন্যে। আমার এ কুড়ি একুশ বছর বয়সে এই ক্ষুদ্র পাড়াগাঁয়ে খাঁচার পাখীর মত আবদ্ধ থাকা

ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠছিল। চ'লেও যেতাম এতদিন। এখানকার একমাত্র বন্ধন হয়েছিলেন বৌদিদি। তাঁরই আগ্রহে স্নেহ যত্নে সে অশান্ত ইচ্ছাটা কিছুদিন চাপা ছিল। এমন সময় মাঘ মাসের শেষের দিকে আমার এক আত্মীয় আমায় লিখলেন যে তাঁদের কারখানা থেকে কাচের কাজ শেখবার জন্যে ইউরোপ আমেরিকায় ছেলে পাঠানো হবে, অতএব আমি যদি জীবনে কিছু করতে চাই তবে শীঘ্র যেন মোরাদাবাদ গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করি। তিনি সেখানকার কাচের কারখানার ম্যানেজার।

পত্র পেয়ে সমস্ত রাত আমার ঘুম হ'ল না। ইউরোপ আমেরিকা! সে কত উর্ম্মি-সঙ্গীত-মুখরিত শ্যাম সমুদ্রতট···কত অকূল সাগরের নীল জলরাশি দূরে সবুজ বিন্দুর মত ছোট ছোট দ্বীপ, ঐ কর্সিকা, ঐ সিসিলি! নতুন আকাশ, নতুন অনুভূতি···ডোভারের সাদা খড়ির পাহাড়—প্রশস্ত রাজপথে জনতার দ্রুত পাদচারণ, লাড্‌গেট সার্কাস, টটেন্‌হাম্‌ কোর্ট রোড—বার্চ্‌-উইলো পপ্‌লার-মেক্‌ল্‌ গাছের সে কত শ্যামল পত্রসম্ভার, আমার কল্প-লোকের সঙ্গিনী কনক-কেশিনী কত ক্লারা, কত মেরী, কত ইউজিনী।···

পরদিন সকালে পত্র লিখলুম আমি খুব শীঘ্রই রওনা ব। স্কুলে সেই দিনই নোটিশ দিলুম, পনেরো দিন পরে কাজ ছেড়ে দেব।

মন বড় ভাল ছিল না, উপরের পথটা দিয়ে কয়েক দিন গেলুম। দশ বারো দিন পরে নীচের পথটা দিয়ে যেতে যেতে একদিন বৌদিদির সঙ্গে দেখা। বৌদিদি একটু অভিমান প্রকাশ করলেন—বিমল, বড় গুণের ভাই তো। আজ চার পাচ দিনের মধ্যে বোনটা বাঁচল কি ম'ল তা খোঁজ করলে না?

আমি বললাম—বৌদিদি, করলে সেটাই অস্বাভাবিক হত! বোনেরাই ভাইয়েদের জন্যে কেঁদে মরে, ভাইয়েদের দায় পড়েছে বোনদের ভাবনা ভাবতে। দুনিয়া সুদ্ধ ভাই-বোনেরই এই অবস্থা।

বৌদিদি খিল্‌খিল্‌ ক'রে হেসে উঠলেন। এই তরুণীর হাসিটি বালিকার মত এমন মিষ্ট নির্ম্মল যে এ শুধু লক্ষ্মীপূর্ণিমার রাতের জ্যোৎস্নার মত উপভোগ করবার জিনিষ, বর্ণনা কববার নয়। বললেন—তা জানি জানি,

নাও, আর গুমোর করতে হবে না সে গুণ যে তোমাদের আছে তা কি আমরা ভেতরে ভেতরে বুঝি না? কিন্তু বুঝে কি করব, উপায় নেই। হ্যাঁ, তা সত্যি সত্যি মাকে কবে আনছ?

আমার কাজ ছেড়ে দেওয়ার কথা আমি বৌদিদিকে কিছু বলিনি। সে কথা বললে যে তিনি মনে অত্যন্ত আঘাত পাবেন, এ আমি বুঝতে পেরেছিলুম। একবার ভাবলুম, সেই তো জানাতেই হবে একদিন ব'লে ফেলি। কিন্তু অমন সরল হাসিভরা মুখ, অমন নিশ্চিন্ত শান্তির ভাব—বলতে বড় বাধল। মনে মনে বললুম, তোমরা কেবল বুঝি স্নেহ ঢেলে দিতেই জান? তোমাদের স্নেহ-পাত্রদের বিদায়ের বাজনা যে বেজে উঠেছে এ সম্বন্ধে এ রকম অজ্ঞান কেন?…

জিজ্ঞাসা করলুম—বৌদি, একটা কথা বলি। আপনি আমায় এই অল্প-দিনে এত ভালবাসলেন কি ক'রে? আচ্ছা আপনারা কি ভালবাসার পাত্রাপাত্রও দেখেন না? আমি কে বৌদি, যে আমার জন্যে এত করেন?

বৌদিদির মুখ গম্ভীর হয়ে এল। তাঁর ওই এক বড় আশ্চর্য্য ছিল, মুখ গম্ভীর হ'লে প্রায়ই চোখে জল আনবে, জল কেটে গেল তো আবার হাসি ফুটবে। শরতের আকাশে রোদ বৃষ্টি খেলার মত। বললেন—এতদিন তোমায় বলিনি বিমল, আজ এই পাঁচ বছর হ'ল আমারও ছোট ভাই আমার মায়া কাটিয়ে চ'লে গিয়েছে, তারও নাম ছিল বিমল। থাকলে সে তোমারই মত হ'ত এতদিন। আর তোমারই মত দেখতে। তুমি যেদিন প্রথম এ রাস্তা দিয়ে যাও, তোমায় দেখেই আমার মনের মধ্যে সমুদ্র উথলে উঠল, সেদিন বাড়ী গিয়ে আপন মনে কত কেঁদেছিলাম। তুমি এখান দিয়ে যেতে, রোজ তোমাকে দেখতাম। সেদিন তুমি আপনা হতেই দিদি ব'লে ডাকলে, সেদিন থেকে আজ পর্য্যন্ত যে কি সুখে আছি তা বলতে পারি নে। তোমায় যত্ন ক'রে, তুমি যে বড় বোনের মত ভালবাসো, তাতে আমি বিমলের শোক অনেকটা ভুলেছি। ওই এক ভাই ছিল আমার। তুলসী-তলায় রোজ সন্ধ্যাবেলা কত প্রণাম করি, বলি ঠাকুর এক বিমলকে তো

পায়ে টেনে নিয়েছ, আর এক বিমলকে যদি দিলে তো এর মঙ্গল করো ; একে আমার কাছে রাখো।

চোখের জলে বৌদিদির গলা আড়ষ্ট হয়ে গেল। আমি কিছু বললুম না। বলব কি ?

একটু পরে বৌদিদি নিজেকে একটু সামলে নিয়ে জল-ভরা চোখ দুটি তুলে আমার মুখের দিকে চাইলেন। কি সুন্দর তাঁকে দেখাচ্ছিল। কালো চোখদুটি ছল ছল করছে, টানা ভুরু যেন আরও নেমে এসেছে, চিবুকের ভাঁজটী আরও পরিস্ফুট, যেন কোন্ নিপুণ প্রতিমা কারক সরু বাঁশের চেঁচাড়ী দিয়ে কেটে তৈরী করেছে।...পথের পাশেই প্রথম ফাল্গুনের মুগ্ধ আকাশের তলায় আঁকোড় ফুলের একটা ঝোপে কাঁটা-ওয়ালা ডালগুলিতে থোলো থোলো সাদা ফুল ফুটে ছিল...মনের ফাঁকে ফাঁকে নেশা জমিয়ে আনে, এমনি তার মিষ্টি গন্ধ !...

দুজনে অনেকক্ষণ কথা বলতে পারলুম না। খানিক পরে বৌদিদি বললেন —সেই জন্যেই বলছি ভাই, মাকে আনো। আমাদের পাড়ায় চৌধুরীদের বাড়ীটা প'ড়ে আছে। ওরা এখানে থাকে না। খুব ভাল বাড়ী, কোনো অসুবিধা হবে না, তুমি মাকে নিয়ে এস, ওখানেই থাক, সে তাঁদের পত্র লিখলেই তাঁরা রাজি হবেন, বাড়ী তো এমনি প'ড়ে আছে। তোমার বোন পরাধীন, কিছু করবার তো ক্ষমতা নেই। তোমার সঙ্গে এ সব দেখাশোনা, এসব লুকিয়ে, বাড়ীর কেউ জানে না। তুমি দু'বেলা ঘাটের পথ দিয়ে যেও, দেখেই আমি শান্তি পাবো ভাই। মাকে এ মাসেই আনো।

কেমন ক'রে তা হবে ?

একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলুম—বৌদি, আমি এখানে থাকলে কি আপনি খুব সুখী হন ?

বৌদিদি বললেন—কি বলব বিমল। মাকে আনলে তোমার কষ্টটাও কম হয়, তা বুঝেও আমার সুখ। আর বেশ দুটি ভাই-বোনে এক জায়গায় থাকব, বারো মাস দু'বেলা দেখা হবে, কি বল ?

আমি বললুম—ভাই যদি কোন গুরুতর অপরাধ ক'রে আপনার কাছে, তাকে ক্ষমা করতে পারবেন ?

বৌদিদি বললেন—শোন কথার ভঙ্গী ভাইটির আমার। আমার কাছে তোমার আবার অপরাধটা কিসের শুনি ?

আমি জোর ক'রে বললুম—না বৌদি, ধরুন যদি করি তা হ'লে ?...

বৌদিদি আবার হেসে বললেন—না না, তা হ'লেও না। ছোট ভাইটির কোন কিছুতেই অপরাধ নেই আমার কাছে, আমি যে বড় বোন।

চোখে জল এসে পড়ল। আড়ষ্ট গলায় বললুম ঠিক! বৌদি, ঠিক!

বৌদিদি অবাক হ'য়ে গেলেন বললেন—বিমল, কি হয়েছে ভাই! অমন করছ কেন ?

মুখ ফিরিয়ে আন্‌তে উদ্যত হলুম, বললুম—কিছু না বৌদি, এমনি বলছি।

বৌদিদি বললে—তবুও ভাল। ভাইটির আমার এখনও ছেলেমানুষি যায় নি। হ্যাঁ, ভাল কথা বিমল, তুমি ভালবাস ব'লে বাগানের কলার কাঁদি আজ কাটিয়ে রেখেছি, পাকলে একদিন ভাল ক'রে বড়া ক'রে দেব এখন...

তার পর দিনই আমার নোটিশ অনুসারে স্কুলের কাজের শেষ দিন। গিয়ে শুনলাম আমায় জায়গায় নতুন লোক নেওয়া ঠিক হয়ে গিয়েছে। স্কুলে সকলের কাছে বিদায় নিয়ে চ'লে এলুম।

শুধু একবার শেষ দেখা করবার জন্যেই তার পরদিন পুকুরের ঘাটে ঠিক সময়ে গেলুম। তাঁর দেখা পেলে যে কি বলব তা ঠিক ক'রে সেখানে যাই নি, সত্য কথা সব খুলে বলতে বোধ হয় পারতুম সেদিন—কিন্তু দেখা হ'ল না। সব দিন তো দেখা হ'ত না, প্রায়ই দু'তিন দিন অন্তর দেখা হ'ত, আবার কিছুদিন ধ'রে হয়ত রোজই দেখা হ'ত। সেদিন বিকালে গেলুম, তার পরদিন সকালেও গেলুম কিন্তু দেখা পেলুম না।

সেদিন চ'লে আসবার সময় সেখানকার মাটি একটু কাগজে মুড়ে পকেটে নিলুম, সেখানে তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয় হবার দিন তিনি দাঁড়িয়েছিলেন।...

সেদিনই বিকালে জিনিষ-পত্র গুছিয়ে নিয়ে চিরদিনের মত সে গ্রাম পরিত্যাগ করলুম।

মাঠের কোলে ছাতিম গাছের বনের মধ্যে কোথায় ঘুঘু ডাকছিল।—

সে সব আজ পঁচিশ ছাব্বিশ বছর আগেকারের কথা।

তারপর জীবনে কত ঘটনা ঘ'টে গেল ভগবানের কি অসীম করুণার দানই আমাদের এই জীবনটুকু! উপভোগ ক'রে দেখলুম, এ কি মধু!…কত নতুন দেশ, নতুন মুখ, কত জ্যোৎস্না-রাত্রি, নতুন নব-ঝোপের নতুন ফুল, কত যুঁই ফুলের মত শুভ্র নির্ম্মল হৃদয়, কান্না-জড়ান কত সে মধুর স্মৃতি!…

কাকার কাছে মোরদাবাদে কাচের কারখানায় গেলুম। বছরখানেক পরে তারা আমায় পাঠিয়ে দিলে জার্ম্মানীতে কাচের কাজ শিখতে। তারপর কোলোয়েঁ গেলুম, কাটা বেলোয়ারী কাচের কারখানায় কাজ শেখবার জন্যে। কোলোয়েঁ অনেক দিন রইলুম। সেখানে থাকতে একজন আমেরিকান্ যুবকের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব হল, তিনি ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট। "শিকাগো ইণ্টার-ওশ্যন্" কাগজের তিনি ফ্রান্স দেশস্থ সংবাদদাতা! কোলোয়েঁ সব সময় না থাকলেও তিনি প্রায়ই ওখানে আসতেন। তাঁরই পরামর্শে তাঁর সঙ্গে আমেরিকায় গেলুম। তাঁর সাহায্যে দু'তিনটা বড় বড় কাচের কারখানায় কাজ দেখবার সুযোগ পেলাম…পিট্সবার্গে কার্ণেগীর ওখানে প্রায় ছ'মাস রইলুম, নতুন ধরণের ব্লাষ্ট্-ফার্ণেসের কাজ ভাল ক'রে বোঝবার জন্যে।…মিড্‌ল ওয়েষ্টের একটা কাচের কারখানায় প্রভাত দে কি বসু ব'লে একজন বাঙালী যুবকের সঙ্গে দেখা হ'ল, তাঁরও বাড়ী চব্বিশ-পরগণা জেলায়। সে ভদ্রলোক নিঃসম্বলে জাপান থেকে আমেরিকায় গিয়ে মহা হাবুডুবু খাচ্ছিলেন তাঁরই মুখে শুনলুম, সেয়াটল্-এ একটা নূতন কাচের কারখানা খোলা হচ্ছে। আমি জাপান দিয়ে আসব স্থির করেছিলুম, কাজেই আসবার সময় সেয়াট্‌ল্-গেলুম। তারপর জাপান ঘুরে দেশে এলুম।…মা

ইতিমধ্যে মারা গিয়েছিলেন। ভাই-দুটিকে নিয়ে গেলুম মোরাদাবাদে। বেশীদিন ওখানে থাকতে হ'ল না। বম্বেতে বিয়ে করেছি, আমার শ্বশুর এখানে ডাক্তারি করতেন। সেই থেকে বম্বে অঞ্চলেরই অধিবাসী হয়ে পড়েছি।

বহুদিন বাংলা দেশে যাইনি, প্রায় ষোল সতের বছর হ'ল। বাংলা দেশের জল-মাটি গাছপালার জন্যে মনটা তৃষিত হয়ে আছে। তাই আজ সন্ধ্যার সময় সমুদ্রের ধারে ব'সে আমার সবুজ-শাড়ী পরা বাংলা মায়ের কথাই ভাবছিলুম।…রাজাবাই টাওয়ারের মাথার ওপর এখনও একটু একটু রোদ আছে। বন্দরের নীলজলে মেসাজেরী মারিতিম্‌দের একখানা জাহাজ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে, এখানা এখুনি ছেড়ে যাবে। বাঁ-ধারে খুব দূরে এলিফ্যাণ্টার নীল সীমারেখা।…ভাবতে ভাবতে প্রথম যৌবনের একটা বিস্মৃতপ্রায় ঝাপ্‌সা ছবি বড় স্পষ্ট হয়ে মনে এল। পঁচিশ বছর পূর্ব্বের এমনি এক সন্ধ্যায় দূর বাংলা দেশের এক নিভৃত পল্লীগ্রামের জীর্ণ শান-বাঁধানো পুকুরের ঘাট বেয়ে উঠছে, আর্দ্র-বসনা তরুণী এক পল্লীবধূ!…মাটির পথের বুকে বুকে লক্ষ্মীর চরণচিহ্নের মত তার জলসিক্ত পা-দুখানির রেখা আঁকা।…আঁধার সন্ধ্যায় তার পথের ধারের বেণু কুঞ্জে লক্ষ্মীপেঁচা ডাকছে। তার স্নেহ ভরা পবিত্র বুকখানি বাইরের জগৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত অনিশ্চয়তায় ভরা। আম কাঁটালের বনের মাথার ওপরকার নীলাকাশে দু'একটা নক্ষত্র উঠে সরলা স্নেহ-দুর্ব্বলা বধূটির ওপর সস্নেহ কৃপাদৃষ্টিতে চেয়ে আছে।…তারপর এক শান্ত আঙ্গিনায় তুলসী মঞ্চমূলে স্নেহাস্পদের মঙ্গলপ্রার্থিণী সে কোন্ প্রণাম নিরতা মাতৃমূর্ত্তি, করুণা মাখা অশ্রু-ছলছল।….

ওগো লক্ষ্মী, ওগো স্নেহময়ী পল্লীবধূ, তুমি আজও কি আছো? এই সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর পরে আজও তুমি কি সেই পুকুরের ভাঙ্গা ঘাটে সেই রকম জল আনতে যাও?…আজ সে কত কালের কথা হ'ল, তারপর জীবনে আবার কত কি দেখলুম, আবার কত কি পেলুম…আজ কতদিন পরে

আবার তোমার কথা মনে পড়ল···তোমায় আবার দেখতে বড় ইচ্ছে করছে দিদিমণি, তুমি আজও কি আছ? মনে আসছে অনেক দূরের যেন কোন খড়ের ঘর···মিট্‌মিটে মাটির প্রদীপের আলো···মৌন সন্ধ্যা···নীরব ব্যথার অশ্রু···শান্ত সৌন্দর্য্য···স্নেহ-মাখা রাঙ্গা শাড়ীর আঁচল······

আরব সমুদ্রের জলে এমন করুণ সূর্য্যাস্ত কখনও হয়নি!